বাংলা চরিত সাহিত্য

দেবীপদ ভট্টাচার্য

বেঙ্গল পাবলিশিং । কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

'A well-written 'Life' is almost as rare as a well-spent one.
—Carlyle

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা, গবেষণা চলেছে। কিন্তু চরিত সাহিত্য নিয়ে উল্লেখযোগ্য পূর্ণাঙ্গ রচনা আমার চোখে পড়েনি। অথচ বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটি দরিদ্র নয়। বাংলা দেশ ও বাঙালীর যথার্থ ইতিবৃত্ত লিখতে গেলে চরিত গ্রন্থগুলির সহায়তা গ্রহণ অপরিহার্য। এই গ্রন্থে বাংলা চরিত গ্রন্থগুলির একটি ধারাবাহিক বিবরণ ও বিশ্লেষণ প্রদানের বিনীত প্রয়াস করা হয়েছে।

'ইতিবৃত্ত' ও 'চরিত' প্রাচীন কাল থেকে সপ্তদশ শতক অবধি পাশ্চাত্যে সমার্থক ছিল বলা যায়। এই দুটি শাখার মধ্যে পার্থক্যের রেখা গভীর করে টানা কঠিন। কোনো ব্যক্তির জীবনের ইতিবৃত্ত চরিত গ্রন্থের উপজীব্য। তবে যে-'মানুষকে আজ অনতিদূরের বলে মনে হয়, দুই শতাব্দী পরে সে ইতিবৃত্তে'র বিষয় হয়ে ওঠে। ইতিবৃত্তের 'নায়ক' বা অন্যান্য নরনারীকে নিয়েও চরিত গ্রন্থ রচিত হতে পারে, যদি সেই সঙ্গে তাঁদের জীবনের 'ব্যক্তিগত' দিক' তাঁদের অন্তর্-জগত, তুচ্ছ ভুল-ত্রুটিগুলিও জানতে পারা যায়। তখন ইতিবৃত্তের 'নায়ক' রূপের সঙ্গে 'মানুষ', রূপের মিল ঘটে। চরিত সাহিত্যের আদি স্রষ্টা প্লুটার্ক প্রাচীনকালে একথা বলেছিলেন। এ যুগের কুশলী লেখক এমিল লুড্‌উইগ প্লুটার্কের উক্তির প্রতিধ্বনি করেছেন।

এই গ্রন্থে 'পৌরাণিক' চরিত্র নিয়ে রচিত জীবনীগুলিকে গুরুত্বদান করা হয়নি। তার কারণ পৌরাণিক চরিত্রগুলি অলৌকিক ও অতি-প্রাকৃত উপাদানে পুনর্গঠিত। তাদের জন্ম-মৃত্যুর সাল তারিখ নেই, কার্যাবলীর ঐতিহাসিক বা প্রামাণিক স্বীকৃতি কিছু নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' অলৌকিকতা মুক্ত, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে রচিত। সেজন্য 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা দেশের 'ঐতিহাসিক' চরিত্র অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাশিম, নন্দকুমার প্রভৃতি ব্যক্তিদের জীবনী সম্পর্কে এ গ্রন্থে বিশেষ আলোচনা করা হয়নি। তার কারণ ঐ চরিত্রগুলি জাতীয়তাবাদের পুষ্প-চন্দন-লিপ্ত, প্রকৃত ইতিবৃত্ত কতটুকু তার বিচার এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। তাছাড়া

উক্ত চরিত্রগুলির ব্যক্তি-জীবনের অধিকাংশ তথ্য প্রবাদ ও জনশ্রুতির অন্ধকারে ডুবে আছে। সেজন্য ঐ পর্যায়ের জীবনীগুলিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

যাঁরা সাধু-সন্ত, তাঁদের জীবনী Hagiographyর শাখাভুক্ত, Biography নয়। কেননা তাঁরা দেবকল্প, পুরো রক্তমাংসের মানুষ নন। অথচ 'The proper study of mankind is man'—এই দৃষ্টিভঙ্গি আলোচ্য গ্রন্থে অনুসৃত হওয়ায় আধুনিক কালের সাধু-সন্তদের নিয়ে রচিত জীবনীর আলোচনা এ-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

বাংলা চরিত সাহিত্যের একটি মূল্যবান অংশ 'আত্মচরিত'। এ-গ্রন্থে তার আলোচনা স্থগিত রাখা হয়েছে। প্রস্তূয়মান 'বাংলা আত্মচরিত সাহিত্য' গ্রন্থে ঐ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছি। কোনো ব্যক্তির জীবনী প্রণয়নে তাঁর আত্মচরিত গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ সহায়। নিজেকে নিরাসক্ত ভাবে দেখা, নিজের অতীতের মধ্যে 'ডুব দেওয়া' নিজেকে বিশ্লেষণ করা, কঠিন কাজ। কাজেই আত্মদর্শন, আত্মবিচার ও আত্মোপলব্ধি—'আত্মচরিত' রচনার সঙ্গে জড়িত। সেদিক থেকে 'আত্মচরিত' রচনার দৃষ্টি বহুলাংশে সাবজেক্টিভ। কিন্তু চরিত গ্রন্থ রচনার পদ্ধতি পৃথক। নিজেকে দেখা ও অপরকে দেখার মধ্যে যে পার্থক্য—তার দ্বারাই উভয় পর্যায়ের গ্রন্থের মধ্যেকার ভেদ নির্ণীত হয়। সেজন্য 'আত্মচরিত' গুলিকে নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা সংগত বলে আমার মনে হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে ছোট-বড়ো, ভালো-মন্দ চরিত গ্রন্থ প্রচুর রচিত হয়েছে। প্রত্যেকটি বই বা প্রত্যেক লেখক ধরে আলোচনা অর্থহীন। সেজন্য নির্বাচিত গ্রন্থ ও বিশিষ্ট লেখকদের নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। গ্রন্থের সর্বত্র ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষার প্রয়াস পেয়েছি।

'বাংলা চরিত সাহিত্য' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ সম্ভব হল দে'জ পাবলিশিং-এর শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর দে-র আন্তরিক আগ্রহে। বইটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল (১৯৬৪) অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'পরিচয়' পত্রিকায় একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলেন। এই সুযোগে তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞ-নমস্কার জ্ঞাপন করি। এখনকার পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসু মন নিয়ে বইটি যত্ন করে পড়বেন এই আশা রাখছি।

বিদ্যাসাগর ভবন
কলকাতা-৭০০ ০০৬
দোলযাত্রা ১৩৮৮

দেবীপদ ভট্টাচার্য

"গুরূণাঞ্চৈব সর্বেষাং মাতা পরমকোগুরুঃ"

স্বর্গতা মাতৃদেবী

সুভাষিণী দেবী

স্মরণে

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

১. উপন্যাসের কথা

২. রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান'

৩. রবীন্দ্র চর্চা

প্রসঙ্গ-সূচী

॥ প্রাচীন যুগ ॥

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫) তাঁর সম্পাদিত 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' গ্রন্থে লিখেছেন :

"এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাস পুস্তকে অনেক অনেক নরপতি ও বীরদিগের দেবপুত্ররূপে বর্ণনা আছে, ইহাতে বোধ হয় পুরাকালীন লোকদের সত্যাপেক্ষা অদ্ভুত বিবরণে অধিক আদর ছিল এবং পুরাণ লেখকেরা কবিতার ছন্দোলালিত্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া শব্দবিন্যাস করতঃ পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন-পুরঃসর বিবিধ বিষয়ে উপদেশ করিতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; সুতরাং অবিকল ইতিবৃত্ত লিখিয়া স্ব স্ব কল্পনাশক্তিকে খর্ব করেন নাই।"

ইতিহাস ও চরিতকথা প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে দীর্ঘকাল ধরে সমার্থবোধক ছিল। আধুনিক কালে দুয়ের মধ্যে অবশ্য ভেদ করা হয়েছে। কিন্তু তার ফলে দুয়ের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত মিল ক্ষুণ্ণ হয়নি। ইতিহাস-চর্চা না ঘটলে চরিতসাহিত্যের চর্চা ব্যাহত হতে বাধ্য। পাশ্চাত্যে রাষ্ট্র, রাজবংশ বা কোনো জাতির ইতিবৃত্ত যেমন রচিত হয়েছে, তেমনি একজন বিশেষ নৃপতি, ধর্মগুরু, বীর বা সাধারণ ব্যক্তিকে নিয়ে তাঁর চরিতকথাও লিপিবদ্ধ হয়েছে। অবশ্য ভারতবর্ষে নানা বরণীয় বিদ্যার সূক্ষ্ম চর্চা অব্যাহত থাকলেও এবং বহুমুখী শাস্ত্র ও তত্ত্বচিন্তার ব্যাপক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার প্রচলন সত্ত্বেও 'রাজতরঙ্গিণী'র কথা মনে রেখেও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার্য যে, ইতিহাস-চর্চার আপেক্ষিক দৈন্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে ঐকমত্য দেখা যায়। উইন্টারনিৎস বলেছেন :

"History and biography have in India never been treated other than by poets and as branch of epic poetry."[১]

অলবেরুনীও অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন :

"Unfortunately the Hindus do not pay much attention

to the historical order of things. They are very careless in relating the chronological succession of their kings and when they are pressed for information and are at a loss, not knowing, what to say, they invariably take to romancing."[২]

তবে ইতিহাস ও চরিত প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে নানাভাবে উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে (৮৫. ৬), অথর্ববেদে (১৫. ৬. ৩ ৪) 'গাথা-নারাশংসী'র অর্থাৎ রাজপ্রশস্তির উল্লেখ আছে। অথর্ববেদে ইতিহাস-পুরাণের সঙ্গে গাথা-নারাশংসীর কথাও বলা হয়েছে। অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে গায়ক-বাদক দল অশ্বমেধযজ্ঞকারী নৃপতির কীর্তি-কলাপ গান করবার সময় অতীত রাজাদের কীর্তিকথা এবং দেবতাদের বন্দনা, গীতের মধ্যে প্রকাশ করত। শতপথব্রাহ্মণে অশ্বমেধযজ্ঞকারী রাজগণের নাম আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সেই যজ্ঞকালে কীর্তিমান রাজাদের সম্পর্কে গীত 'গাথা'র যে উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে জনমেজয় পারীক্ষিত, মরুত্ত আবীক্ষিত, দুষ্মন্তপুত্র ভরত প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। শাঙ্খায়ণ শ্রৌতসূত্রে পুরুষমেধযজ্ঞের বিবরণ প্রসঙ্গে দশদিবস ব্যাপী গেয় দশটি নারাশংসী সংকলিত হয়েছে। এগুলি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক রাজানুগ্রহ ও দেবানুগ্রহ লাভের বর্ণন। ঋগ্বেদের 'দানস্তুতি'র সমপর্যায়ভুক্ত বলা চলে এগুলিকে।

এই গীতবাদ্যকারী দলের 'গাথা' বা যশোগানগুলি থেকে প্রমাণিত হয় প্রাচীনকালে এই ধরণের গায়কবাদকের বৃত্তিজীবী দল ছিল, যারা শুধু দেবতার নয়, নৃপতিবিশেষের গুণকীর্তন করত। এবং এই 'গাথা নারাশংসী'গুলির সমাহার কিয়দংশে 'মহাকাব্য' রচনাকে সম্ভব করে তুলেছিল।[৩]

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় 'ভরত' শব্দটিকে 'নর্তক' বা 'অভিনেতা' রূপে বোঝান হয়েছে। কাজেই এই ধরণের 'ভরত'-রচিত ও গীত, আখ্যান বা 'ইতিহাস' পরবর্তীকালে মহাভারত আখ্যানে পরিণত হয়েছে বলে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন।[৪]

'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'তে দ্বিজাতির পাঠ্যের তালিকায় দেখি ইতিহাস ও পুরাণের সঙ্গে গাথা-নারাশংসীর উল্লেখ করা হয়েছে

বাকোবাক্যং পুরাণং চ নারাশংসীশ্চ গাথিকাঃ।
ইতিহাসাংস্তথা বিদ্যাঃ শক্ত্যাধীতে হি যোঽন্বহম্॥[৫]

'মিলিণ্দ পঞ্‌হ' গ্রন্থেও দ্বিজাতির অর্জিতব্য বিদ্যা প্রসঙ্গে বেদের সঙ্গে ইতিহাস-পুরাণের কথা বলা হয়েছে।[৬]

কাজেই গাথা-নারাশংসীর বিশেষ মূল্য এই উল্লেখগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে। এই সূত্রে বলা যায় 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এ 'আখ্যানবিদ্' নামে এক বিশেষ গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে (৩. ২৫)। প্রাচীন ভারতে 'ঐতিহাসিক'-ও ছিলেন একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী[৭]। মহাভারতকে 'ইতিহাস'রূপে গণ্য করা হয়েছে প্রাচীন কালে। আমরা আধুনিক কালে History বা Historical writing বলতে ঠিক যা বুঝি 'মহাভারত' সে জাতীয় গ্রন্থ নয়। তবে কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে ঋক্ সাম, ও যজুর্বেদের পর অথর্ববেদ ও ইতিহাস অর্থাৎ মহাভারতকে বেদপর্যায়ভুক্ত করেছেন। কাজেই মহাভারত 'পঞ্চমবেদ'রূপে গৃহীত হয়েছে :

সামর্গ্যজুর্বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী।
অথর্ববেদেতিহাসবেদৌ চ বেদাঃ ॥[৮]

মহাভারতেও বলা হয়েছে :

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥[৯]

অর্থাৎ ইতিহাস পুরাণের জ্ঞান দ্বারা বেদজ্ঞান পুষ্ট হয়। বায়ুপুরাণেও একথা পুনরুক্ত হয়েছে[১০]

'মহাভারত' সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে :

জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা।

অর্থাৎ যুদ্ধে জয়েচ্ছু ব্যক্তি 'জয়' নামের এই ইতিহাস শুনবেন। সেকালে 'ইতিহাস' (ইতি-হ-আস) শব্দের দ্বারা মুখ্যতঃ অতীতের চিত্তাকর্ষক উপাখ্যানগুলিকে (Myths and Legends) বোঝানো হত যেমন উর্বশী-পুরুরবা সংবাদ। আমরা মহাভারতে দেখি মুনিরা সৌতিকে পরিবেষ্টন করে "চিত্রাঃ শ্রোতুম্ কথাস্তত্র" অর্থাৎ অদ্ভুত উপাখ্যানাদি শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

'কথা' শব্দের টীকায় বলা হয়েছে 'উপাখ্যানানি'। কাজেই আখ্যান, উপাখ্যান, ইতিহাস সবই প্রায় একার্থবোধক হয়েছে মহাভারত গ্রন্থে। তবু দেখা যায় মহাভারতের একই শ্লোকে পুরাণ, কথা, ইতিবৃত্ত—তিনেরই উল্লেখ রয়েছে :

পুরাণসংহিতাঃ পুণ্যাঃ কথা ধর্মার্থসংশ্রিতাঃ।
ইতিবৃত্তং নরেন্দ্রাণামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥[১১]

ধরণীর নরেন্দ্র ও মহান ঋষিদের 'ইতিবৃত্ত' বর্ণনার কথা এখানে সুস্পষ্ট। তার থেকে মনে হয় 'পুরাণ' 'কথা' প্রভৃতি থেকে 'ইতিবৃত্ত' শব্দটিকে তাঁরা যেন খানিকটা পৃথকরূপে দেখাতে চেয়েছিলেন।

সত্যবতীসুত ব্যাস এই ভারত-ইতিহাস রচনা করেন। সৌতি তার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি ॥[১২]

সে ইতিহাস পূর্বে আংশিক বিবৃত হয়েছে, অপরেরা বর্তমানে বলেছেন এবং ভবিষ্যতেও কবিরা বলবেন। মহাভারত যে বহুশতাব্দীর বহুব্যক্তির রচনা তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে এই উক্তি।

মহাভারতকে শুধু আখ্যান বা ইতিবৃত্তরূপে দেখা হয়েছে তা নয়, ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্ররূপেও এই গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হয়েছে। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে রাজগণের শিক্ষালাভ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি দিনের প্রথমভাগে হস্তিবিদ্যা, অশ্ববিদ্যা, রথবিদ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রবিদ্যাতে শিক্ষাগ্রহণ করবেন এবং শেষে ইতিহাস শ্রবণ করবেন।

এই সূত্রে কৌটিল্য বলেছেন ঃ 'পশ্চিমমিতিহাসশ্রবণে। পুরাণমিতিবৃত্ত-মাখ্যায়িকোদাহরণং ধর্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ'।[১৩] এই উক্তি থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে কৌটিল্য 'ইতিবৃত্ত' শব্দটিকে 'পুরাণ' বা আখ্যায়িকা থেকে ঈষৎ পৃথক করে দেখেছেন।

এই গ্রন্থেরই অন্যত্র বলা হয়েছে যে অমাত্য নিজে অর্থশাস্ত্রবিদ হয়ে রাজা যখন মুখ্যগণের স্বায়ত্তীকৃত হবেন, তখন তাঁর প্রিয়জনের সহায়তা নিয়ে তাঁকে ইতিহাস ও পুরাণকথা দ্বারা (অর্থশাস্ত্র) বুঝিয়ে দেবেন।[১৪]

কাজেই রাজাদের অর্জিতব্য বিদ্যার ক্ষেত্রে 'ইতিহাস-পুরাণ' যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মানব-ধর্মশাস্ত্র বা মনুস্মৃতিতেও ইতিহাসের উল্লেখ আছে শ্রাদ্ধবিধিতে। পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধকালে আখ্যান-পুরাণের সঙ্গে ইতিহাস শ্রবণ করাবার কথা আছে ঃ

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ ॥[১৫]

এই ইতিহাস মেধাতিথির মতে 'ইতিহাসা মহাভারতাদয়ঃ'।

তবু আমাদের স্বীকার করতে হবে, প্রাচীন ভারতে ইতিহাস সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষিত হলেও কার্যকালে 'পুরাণ', 'উপাখ্যান', 'কথা' বা তথাকথিত ইতিহাস মিলেছে অনেক বেশি, যথার্থ ইতিবৃত্ত মিলেছে খুব কম। মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাই আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, "India had never had her Xenophon or Thucydides and her heroes and reformers, like her other great men, have to look for immortality in the ballads of her bards or the legends of romancers."[১] এ ক্ষোভ সত্য।

'কথা' ও 'ইতিবৃত্ত' প্রসঙ্গে আচার্য আনন্দবর্ধন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের তৃতীয় উদ্দ্যোতে কাব্যে ঔচিত্যতত্ত্ব বিচারসূত্রে 'কল্পিত কথাশরীর' ও 'ইতিবৃত্ত এই দুটি বিষয়ের বর্ণনায় তাদের মধ্যেকার পার্থক্য উল্লেখ করতে বিস্মৃত হননি :

বিভাবভাবানুভাব সঞ্চার্যৌচিত্যচারুণঃ
বিধিঃ কথাশরীরস্য বৃত্তস্যোৎপ্রেক্ষিতস্য বা ॥ ১০
ইতিবৃত্ত বশায়াতাং ত্যক্তানন্থগুণাং স্থিতিম্।
উৎপ্রেক্ষ্যাহপ্যন্তরাভীষ্টরসোচিত কথোন্নয়ঃ ॥ ১১

এর অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারীভাবের ঔচিত্যের দ্বারা সৌন্দর্যপ্রাপ্ত কাহিনীর বিধান করণীয়, সে কল্পিত কথাশরীর হোক অথবা ইতিবৃত্ত হোক। ১০।

যে অংশ 'ইতিবৃত্তে'র বশে এসেছে অথচ যার মধ্যে রসের প্রতিকূলতা রয়েছে, তাকে ত্যাগ করে অপর কিছু কল্পনা করলেও তাকে অভীষ্ট রসের উপযোগী করে মধ্যে মধ্যে তার স্থাপনা দ্বারা 'কথা'র উন্নয়ন সাধন করতে হবে ॥ ১১।

তারপর তিনি বলেছেন—প্রবন্ধাত্মক অলক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ্যধ্বনি রামায়ণ-মহাভারতাদিতে প্রকাশিত হয়েছে। যে প্রকারে তার প্রকাশ ঘটেছে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। সেই সূত্রে পূর্বোদ্ধৃত শ্লোক দুটি তিনি বসিয়েছেন। 'কথা', 'আখ্যায়িকা' থেকে 'ইতিবৃত্ত' যে স্বতন্ত্রধর্মী, আনন্দ বর্ধনের বক্তব্যে তার স্বীকৃতি। ইতিবৃত্ত থেকে আহৃত 'কথাশরীর' এবং 'কল্পিত কথাশরীর' এই দুয়ের পার্থক্যের কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

তারপর 'কথাশরীর' ও রসের ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিচার প্রসঙ্গে তিনি 'বৃত্তি' অংশে ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

> অন্যথা যদি কেবল মানুষকে আশ্রয় করে দেবোচিত উৎসাহাদি অথবা যদি কেবল দেবতাকে আশ্রয় করে মানুষের উৎসাহাদিব বর্ণনা রচিত হয় তাহলে সেটি অনুচিত হয়।

তাই মর্ত্যের রাজাদের বর্ণনায় সপ্তার্ণব লঙ্ঘনযুক্ত ব্যাপাব রচিত হলে, সৌষ্ঠবযুক্ত হলেও সে রচনা নীরস হয়; অনৌচিত্যই সেই নীরসতার হেতু। প্রশ্ন হতে পারে, সাতবাহন প্রভৃতির নাগলোক গমনাদির কথা শোনা যায়; তবে সমগ্র ধবণীধারণক্ষম রাজাদের অলোকসামান্য প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনায় কি অনৌচিত্য আছে? না, অনৌচিত্য নেই। আমরা বলি না যে রাজাদের প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনা অনুচিত। কিন্তু কেবল মানুষকে আশ্রয় করে যে কথাবস্তু কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট হয় তার মধ্যে দেবোচিত ঔচিত্যের যোজনা করা সংগত নয়। দৈবশক্তিসম্পন্ন মানুষদের কথাতে উভয়ের উপযোগী ঔচিত্যের প্রয়োগে কোনই বিরোধিতা নেই, যেমন পাণ্ডবদের কথাতে [মহাভারতে]। কিন্তু সাতবাহন প্রভৃতির সম্পর্কে যে-সব কর্মবৃত্তান্ত শোনা যায়, সেগুলি শুধু বর্ণিত হলেই রসানুযায়ী বলে প্রতিভাত হবে। তাঁদের সম্পর্কে তদতিরিক্ত কিছু রচনা করলে অনুচিত হবে।

অনৌচিত্য ছাড়া রসভঙ্গের অন্য কোনো কারণ নেই। প্রসিদ্ধ ঔচিত্যানুযায়ী রচনা রসের শ্রেষ্ঠ গুপ্ত রহস্য স্বরূপ।[১৭]

রামায়ণ কাব্য, মহাভারতের মত 'ইতিহাস' নয়। আনন্দবর্ধন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে মহাকাব্য ও ইতিহাসেব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পার্থক্য নির্দেশ কবেছেন। মহাকবি বাল্মীকি রচিত বামায়ণ কাব্যে রামচরিত্র বর্ণিত হয়েছে। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কবিকে বলেছিলেন:

রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম—
ধর্মাত্মনো গুণবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ॥

ধর্মাত্মা, গুণবান্ রামচন্দ্রের চরিত আপনি রচনা করুন। বাল্মীকি প্রথমে রামচন্দ্রকে নরচন্দ্রমারূপেই বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ চরিতকাব্য হিসাবে নয়, পরবর্তীকালে ধর্মশাস্ত্ররূপেই পরিগণিত হয়েছে। কেননা রামচন্দ্র তখন হিন্দুসমাজে ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে পরিকল্পিত

ও পরিগৃহীত হয়েছেন। নারদ বলেছেন, রামচরিত পাঠে পাপমুক্ত হবে মানুষ :

ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
যঃ পঠেদ্ রামচরিতম্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

—এই শ্লোক যে পরবর্তী কালের যোজনা তাতে সন্দেহ নেই। তবু বাল্মীকির মহাকাব্য সীমিত অর্থে চরিতকাব্য রচনাব পথ তৈরি করে দিল। সেইপথে এসেছেন অশ্বঘোষ তাঁর বুদ্ধচরিত মহাকাব্য নিয়ে।

বুদ্ধচরিত কাব্যের চতুর্দশ সর্গ (অসম্পূর্ণ) অবধি মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়। কাওয়েল অবশ্য সপ্তদশ সর্গ পযন্ত প্রকাশ করেছেন। বাকি চৌদ্দটি সর্গ তিব্বতী ও চীনা ভাষার অনুবাদে রক্ষিত আছে। ঈৎ-সিং অষ্টাবিংশতি সর্গেব উল্লেখ কবেছেন।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের (খৃঃ পূঃ ৪৮৩) বহু শতাব্দী পরে, অর্থাৎ খৃষ্টপর প্রথম শতকে সম্রাট কণিষ্কেব সময়ের লোক বলে অশ্বঘোষকে অনেকেই মনে করেন। কাজেই অশ্বঘোষ যখন তাঁর কাব্য রচনা করেছেন তার পূর্বেই মানব-বুদ্ধদেব পূর্ণদেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সেজন্য এ কাব্যে অপরূপ কবিত্বেব সঙ্গে অলৌকিকতার অভাব নেই। তবুও তাঁর বর্ণনার কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

কুমাবের জন্ম, বিবাহ, পুত্রলাভ, কুমারকে বৈরাগ্য চিন্তা থেকে মুক্ত বাখবার জন্য বিচিত্র প্রলোভন সৃষ্টি, দেবতাদের ইচ্ছায় জরা-ব্যাধি-মরণ দৃশ্য দর্শন, ভোগে বিতৃষ্ণা, পত্নী ও পুত্রকে রেখে রাত্রে গৃহত্যাগ—সবই অশ্বঘোষ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। কুমারের জটাবল্কল ও চীরবাসযুত হয়ে তপোধনাশ্রিত বনভূমিতে প্রবেশ, মুনিদেব সঙ্গে মুক্তিপথ সম্পর্কে আলোচনা বিস্তৃতরূপে বিবৃত হয়েছে। শোকার্ত সারথি ছন্দকের রাজধামে প্রত্যাবর্তন, রাজা, মহিষী ও বধূ যশোধরার বিলাপ, মন্ত্রী ও পুরোহিতপ্রবরের কুমারের উদ্দেশ্যে বনভূমিতে যাত্রা, কুমারের সহিত সাক্ষাৎ, তাঁদের রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধে কুমারের প্রত্যুত্তর অপূর্ব নৈপুণ্যে অশ্বঘোষ লিপিবদ্ধ করেছেন। তারপর কবি বর্ণনা করেছেন কুমারের রাজা শ্রেণ্য, সাংখ্যপন্থী মুনি অরাঢ়, উদ্রকমুনির সঙ্গে তত্ত্বালোচনা। গয়ায় পবিত্র নিরঞ্জনাতীরে কুমার দেখলেন পঞ্চভিক্ষু তাপসকে। এখানেই দেবতাদের দ্বারা অনুপ্রেরিতা

গোপাধিপ-নন্দিনী 'নন্দবলা' তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অমৃতোপম পায়স বহন করে নিয়ে এলেন। তারপর তিনি ঘোষণা করলেন দৃপ্তকণ্ঠে—

ভিনদ্মি তাবদ্ভুবি নৈতদাসনং
ন যামি যাবৎ কৃতকৃত্যতামিতি ॥[১৮]

—যতদিন পর্যন্ত কৃতার্থ না হই ততদিন আমি আমার এই আসন ছেড়ে উঠব না।

ত্রয়োদশ সর্গে 'মার'-এর পরাজয়। চতুর্দশে সুগতের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হল—তিনি স্বর্গ ও নরক, জন্মান্তরের দুঃখ চিন্তা করলেন, সংকল্প করলেন জগতের কল্যাণ সাধন।

রামায়ণের মতই অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত সর্গবন্ধ মহাকাব্য। এ কাব্য যে কালজয়ী হয়েছে তার প্রধান কারণ তার কাব্যমূল্য। অশ্বঘোষ বৌদ্ধদর্শনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, এ কাব্যে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে। তারও ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছে তাঁর কবিকল্পনা ও বর্ণনানৈপুণ্য। অশ্বঘোষ বাল্মীকিকে 'আদিকবি' বলে সম্বোধন করেছেন (১. ৪৩)। রাজ্যভোগের পরিবর্তে কুমারের অরণ্যযাত্রা, জটাবল্কলধারণ, রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রী ও পুরোহিতের অনুরোধ ও কুমারের প্রত্যাখ্যান অযোধ্যা-কাণ্ডকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অথবা কুমারের প্রমোদগৃহে সুপ্তা নারীদের বর্ণনা মনে করিয়ে দেয়, রামায়ণে লঙ্কায় রাবণপুরীতে সুপ্তা কামিনীদের। কাওয়েল ও জনস্টন উভয়েই তাঁদের সম্পাদিত বুদ্ধচরিতের ভূমিকায় রামায়ণ কাহিনী থেকে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যে ঋণ গ্রহণের উল্লেখ করেছেন। কীথের গ্রন্থেও এ আলোচনা আছে। অশ্বঘোষের এই কাব্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন জনস্টন। তাঁর মতে অশ্বঘোষের সময়ে বহুপূর্ব থেকে প্রচলিত বুদ্ধ-উপাখ্যানগুলির (legend) বিস্তৃত বর্ণনা কবি করেননি, তার কারণ সম্ভবত "The innovations to be lacking in authority and therefore not for specific mention." অশ্বঘোষের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন। সিলভাঁ লেভির মতে অশ্বঘোষ 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থের আদর্শে তাঁর বুদ্ধচরিত লিখেছিলেন, কিন্তু উইনটারনিৎস এই মত মেনে নেননি।

অশ্বঘোষ 'সৌন্দরনন্দ' এবং 'শারিপুত্রপ্রকরণ' নামে অপর দুখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সৌন্দরনন্দ কাব্য এবং শারিপুত্রপ্রকরণ নাটক। সৌন্দরনন্দ

সম্পূর্ণ পাওয়া গেছে কিন্তু শারিপুত্রপ্রকরণের নয় অঙ্কের মধ্যে অতি সামান্য অংশই উদ্ধার করা গেছে মধ্য-এশিয়ায়। সৌন্দরনন্দ অষ্টাদশ সর্গে রচিত মহাকাব্য। বুদ্ধদেবের বৈমাত্র ভ্রাতা নন্দের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। শারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ণের বৌদ্ধধর্মগ্রহণ পূর্বোক্ত নাটকের প্রতিপাদ্য ছিল। বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ ও শারিপুত্রপ্রকরণ—তিনখানি গ্রন্থই যেন পরোক্ষভাবে চরিতকাব্যের অন্তর্ভুক্ত হবার কিছুটা দাবি রাখে, সকল জনশ্রুতি ও প্রবল অলৌকিকতা সত্ত্বেও।

অশ্বঘোষ তাঁর বুদ্ধচরিত রচনাকালে যেমন বাল্মীকির কাব্য থেকে ঋণগ্রহণ করেছিলেন, তেমনি কালিদাসের ঋণ রয়েছে অশ্বঘোষের কাছে। কাওয়েল তাঁর সম্পাদিত 'বুদ্ধচরিত' কাব্যের আলোচনায় বুদ্ধচরিতের সঙ্গে রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের অনেক মিল দেখিয়েছেন।[১৯] রামায়ণ-বুদ্ধচরিত-রঘুবংশ প্রকৃতপক্ষে একই কাব্যধারাকে বহন করেছে।

সৌন্দরনন্দ কাব্যে বুদ্ধচরিত কাব্যে বর্ণিত বুদ্ধকথা প্রথমে বিবৃত হয়েছে। তারপর বুদ্ধদেবের কপিলবাস্তুগমন, পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ, নন্দের সহিত আলাপ এবং তাকে স্বমতে আনয়ন প্রচেষ্টা, নন্দের পত্নী তথা সংসার ত্যাগে অনিচ্ছা অশ্বঘোষ লিপিবদ্ধ করেছেন। বুদ্ধদেব প্রদত্ত সকল উপদেশ ও অনুরোধ ব্যর্থ হয়েছে: নন্দকে ভিক্ষুবেশ পরিয়ে দিলেও তাঁর মনের সংসারস্পৃহাকে কোনো তত্ত্বকথাই নির্বাপিত করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত নন্দকে স্বর্গের অপ্সরা সঙ্গের লোভ দেখিয়ে পত্নী সুন্দরীর আকর্ষণ দূরীভূত করবার চেষ্টা করলেন বুদ্ধদেব এবং বললেন ঐ অপ্সরা সঙ্গের একমাত্র পথ তপশ্চর্যা। এমন সময় এলেন আনন্দ এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হলেন নন্দের মন থেকে সকল ভোগ-সুখের মোহ ও কামনা দূর করতে। তারপর বুদ্ধদেব তাঁকে ধর্মোপদেশ দিলেন এবং তাঁকে বললেন শুধু নিজের মুক্তি নয়, বহুজনের মুক্তি-সাধনের ব্রত গ্রহণ করতে।

বুদ্ধচরিতের তুলনায় সৌন্দরনন্দের রচনা সহজ ও অনলঙ্কৃত। বুদ্ধচরিতের ভাব ও রূপগত ঐশ্বর্য এ কাব্যের নেই। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য মনে রেখে অশ্বঘোষ তাঁর কাব্য ও নাট্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সে উদ্দেশ্য তাঁর সফল হয়েছে। কিন্তু অশ্বঘোষের রচনা কাব্যরূপে এবং কিয়দংশে ধর্ম-দর্শনরূপে বরণীয় হলেও ইতিবৃত্তের দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নয়।[২০]

বৌদ্ধদের রচিত 'অবদান শতক' বা 'দিব্যাবদানে'র মধ্যেও প্রকৃত ইতিবৃত্ত

কিছু নেই। 'অবদান' শব্দের অর্থ মহৎ বা প্রশংসনীয় কায। অবদানগুলিও 'জাতক'বর্গের রূপান্তর মাত্র। দিব্যাবদানের অন্তর্ভুক্ত 'পাংশুপ্রদানাবদানম্' (২৬), কুণালাবদানম্ (২৭), বীতশোকাবদানম্ (২৮) ও অশোকাবদানম্ (২৯) রচনাগুলিতে 'অশোক' প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু ঐতিহাসিকদের কাছে এগুলির বিশেষ কোনো মূল্য স্বীকৃত হয়নি। জনৈক প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের মতেঃ "এ কথা সত্য যে বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধ ও অশোকের জীবনচরিত জাতীয় বহু আখ্যান পাওয়া যায়। যেমন ললিতবিস্তরে ও অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে পাই বুদ্ধের আখ্যান, আর অশোকাবদানে আছে অশোকের আখ্যান। কিন্তু এগুলিকে কখনও যথার্থ জীবনচরিত বলা যায় না, এগুলিতে বুদ্ধ বা অশোকের ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়না। এগুলি হচ্ছে আসলে জনশ্রুতির সংকলন মাত্র"।[১১]

বৌদ্ধ সাহিত্যের মতো জৈন সাহিত্যেও অনুরূপভাবে ধর্মগুরুদের চরিতকাব্য রচিত হতে দেখা যায়। ধর্মগুরুদের যে দীর্ঘতালিকা জৈনসাহিত্যে উদাহৃত হয়েছে তার মধ্যে পার্শ্বনাথ ও মহাবীর ভিন্ন অপর কারো'র ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছু নেই, এবং তীর্থংকরদের তালিকায় তাঁরাই শেষ দুই ব্যক্তি। তবে এঁরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও এঁদের জীবন নিয়ে যে চরিতকাব্য (শ্বেতাম্বর জৈনদের ভাষায় 'চরিত্র' কাব্য) রচিত হয়েছে তার মধ্যে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য অপেক্ষাকৃত কম।

পার্শ্বনাথের জীবন-কাহিনী জিনসেন রচিত 'পার্শ্বাভ্যুদয়' খৃষ্টপর নবমশতকে রচিত হয়। কালিদাস রচিত 'মেঘদূতকাব্য'খানিকে প্রায় পুরোপুরি এই কাব্যে সুকৌশলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে ভবদেব সূরি 'পার্শ্বনাথ চরিত্র' কাব্য রচনা করেন। গৌতমবুদ্ধের পূর্ব পূর্ব জন্ম বর্ণনার মতো ভবদেবের কাব্যে পার্শ্বনাথের নয়টি পূর্বজন্মের বৃত্তান্তও বর্ণিত হয়েছে। অসংখ্য কাল্পনিক গল্পকথা এই কাব্যে ভিড় করেছে, ফলে ব্যক্তি-চরিত্র কোথায় হারিয়ে গেছে। অন্যান্য কবি যাঁরা পার্শ্বনাথের 'চরিত্রকাব্য' লিখেছেন তাঁদের মধ্যে বাদিরাজ (একাদশ শতক) ও মাণিক্যচন্দ্র (ত্রয়োদশ শতক) উল্লেখযোগ্য।

মহাবীরের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন 'কলিকাল-সর্বজ্ঞ' হেমচন্দ্র (দ্বাদশ শতক) তাঁর বিরাট 'ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত্র' গ্রন্থের দশম পর্বে। প্রাকৃত ভাষায় 'মহাবীর চরিঅম্' রচনা করেন গুণচন্দ্র (একাদশ শতক)। ষোড়শ

ও দ্বাবিংশ তীর্থংকব শান্তিনাথ ও নেমিনাথেব চবিত্রকাব্য বচনা কবেছেন যথাক্রমে অজিতপ্রভ এবং সুবাচার্য ও 'মলধাবী' হেমচন্দ্র। ধর্মগুরুদেব চিবাচবিত অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা ও ধর্মপ্রচাবই এই সব কাব্যবচনাব মূল কাবণ। একই সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্মগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্যমতেব প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাবই সাহিত্যিক প্রকাশ এই চবিত্রকাব্যগুলি। একদা যেমন 'খিল' হবিবংশ রচিত হয়েছিল তেমনি জৈন হেমচন্দ্র বচনা কবেছিলেন তাঁব 'ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচবিত্র' গ্রন্থেব পবিশিষ্টরূপে 'স্থবিবাবলী-চবিত্র'। লোকশ্রুতি-গল্পকথা-নির্ভব এই গ্রন্থেব মধ্য থেকে খাঁটি ইতিহাসেব সন্ধান কবা পণ্ডশ্রম মাত্র[২২]। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কবা অযৌক্তিক হবে না যে শলাকা পুরুষগণেব জীবনীবিষয়ক অনেক জৈনবচনা আছে। এগুলিকে শ্বেতাম্বরগণ বলেন 'চবিত্র' এবং দিগম্ববগণ বলেন 'পুবাণ'।

ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী 'পুরাণ'গুলিও ইতিবৃত্ত বা চবিত সাহিত্যেব দিক থেকে নির্ভবযোগ্য নয়। পুবাণ যদিচ নিজেকে 'বেদসংহিতা' বলে দাবি কবেছে এবং পুবাণ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্রাহ্মণকে জ্ঞানী বলতে অস্বীকাব কবেছে, তবু প্রকৃত যেটুকু বা ইতিবৃত্ত ছিল, অপ্রাকৃত ও অলৌকিক ঘটনাব মাত্রাধিক্যে তাও আচ্ছন্ন হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মমত জনসাধাবণেব মধ্যে বিশেষত স্ত্রীলোক ও শূদ্রদেব মধ্যে সহজভাষায় প্রচাব কবা এবং বেদবিবোধী বৌদ্ধ ও জৈনদেব বিরুদ্ধে অভিযান চালানো পুবাণকাব্য বচনাব মুখ্য কাবণ ছিল।

অনুরূপভাবে বৈষ্ণবধর্মেব প্রতিষ্ঠাব জন্য বচিত হয়েছিল শ্রীমদ্‌ভাগবত। ভাগবতও একখানি পুবাণ। জীবগোস্বামী তাঁব 'তত্ত্বসন্দর্ভ' গ্রন্থে, পুরাণই যে কলিযুগে বেদেব স্থানাধিকাবী একথা নানা যুক্তি দ্বাবা প্রমাণ কবেছেন।[২৩] পুবাণ ও বেদের মধ্যে ভেদ লুপ্ত হলে ভাগবতগ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে বেদেব স্থানে গিয়ে দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য ভাগবতগ্রন্থ বৈষ্ণবদেব সর্বপ্রধান ধর্মশাস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণেব জীবনকথা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাব মধ্যে স্বভাবতই 'পুবাণ' সুলভ অলৌকিকতা, ও অতিপ্রাকৃত উপাদানেব সমাবেশ বিপুলভাবে বিদ্যমান।

কাজেই শ্রীমদ্‌ভাগবতেব ধর্মশাস্ত্ররূপে এবং কাব্যগ্রন্থরূপে মূল্য থাকলেও ইতিবৃত্ত বা চবিতগ্রন্থ হিসাবে কোনো মূল্য নেই। 'পুবাণ'গুলি সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। কাজেই পুবাণগুলিব মধ্যে বহু বাজবংশেব বিববণ থাকলেও এবং বিষ্ণু পুবাণ ও বায়ু পুরাণে যথাক্রমে মৌর্য ও গুপ্ত বংশের উল্লেখ সত্ত্বেও 'ইতিবৃত্ত অথবা 'চবিত' হিসাবে তাদেব প্রামাণিকতা না থাকায় এবং

আরোপিত অলৌকিকতার প্রাধান্য ঘটায় এগুলি প্রকৃতপক্ষে অনৈতিহাসিক বস্তু, পার্জিটার ও পুসলকরের 'পুবাণ' সম্পর্কে গুণকীর্তন সত্ত্বেও। পুরাণগুলিতে বৌদ্ধ ও জৈন মতের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য মত প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা দেখা যায় তাব সঙ্গে 'শঙ্কবিজয়' কাব্যের মিল আছে। এ তথ্য সর্বজ্ঞাত যে আচার্য শঙ্কর বেদবিবোধী ধর্মমতগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত থেকে তাঁর অদ্বৈতপন্থী বেদান্তমতকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর জীবনকে নিয়ে চরিতকাব্য হলো 'শঙ্কর বিজয়'। কাব্যের মঙ্গলাচরণে বলা হয়েছে, স্বয়ং মহেশ্বব জগতের হিতসাধন ও বেদমত সংস্থাপনের জন্য স্বকীয় মায়াতে শঙ্করাচার্যরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হয়ে অসার মতবাদসমূহকে পরাজিত করে শ্রুতিসম্মত অদ্বৈতমত সংস্থাপন কবেন। কাজেই শঙ্করাচার্য মর্ত্যের মানুষ নন মহেশ্বরের নররূপ মাত্র। ষোড়শ সর্গযুক্ত শঙ্কবিজয় কাব্যে শঙ্কব-জীবনের প্রকৃত প্রামাণিক ইতিবৃত্ত অতি অল্পই আছে।[১৭]

ঋষি বা ধর্মগুরুদের চবিতকাব্যে অলৌকিকতার প্রাধান্য বা 'মিরাকলে'ব অস্তিত্ব থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যাঁরা নৃপতি, তাঁদের জীবন নিয়ে যে-সব কাব্য রচিত হয়েছে সেগুলিব মধ্যেও ঐতিহাসিকতার অভাব বেশি। অমবসিংহ খৃষ্টপর পঞ্চম শতকে 'পুরাণ' কাব্যের যে পঞ্চলক্ষণ নির্দেশ কবেন তার মধ্যে 'বংশ' ও 'বংশানুচবিত' পাশাপাশি বসেছে। 'বংশানুচরিত' বলতে বাজবংশগুলির কথাই নির্দেশ কবা হয়েছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে রচিত বাজচরিতগুলি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য দাবি করতে পাবে না। সেগুলি রাজ-পুবাণ হয়েছে।

রাজচরিত কাব্যগুলি আলোচনাব প্রথমেই 'হর্ষচরিত' গ্রন্থেব আমরা উল্লেখ কবি। কিন্তু বাণভট্টের রচনা প্রামাণিক ইতিহাস নয়। রাজ্যবর্ধন, হর্ষবর্ধন ও গৌড়নৃপতি শশাঙ্কেব মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষেব বিবরণ অস্পষ্ট। তবুও ইতিবৃত্তখ্যাত নৃপতিব চরিতগ্রন্থ হিসাবে 'হর্ষচবিত' গ্রন্থের কিছু মূল্য আছে। এইভাবে 'চবিত' অভিধাযুক্ত কয়েকখানি গ্রন্থের আলোচনা করলে পাওয়া যাবে বাক্‌পতিরাজের 'গৌড়বহো' (অষ্টম শতক), পদ্মগুপ্তের নবসাহসাঙ্কচরিত (একাদশ শতক) বিহ্লনের বিক্রমাঙ্কদেবচরিত (একাদশ শতক), হেমচন্দ্রেব 'কুমারপালচরিত' (দ্বাদশ শতক) এবং সন্ধ্যাকরনন্দীব 'বামচরিত' (দ্বাদশ শতক)। বাক্‌পতিরাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কনৌজেব বাজা যশোবর্মণ। মাহাবাষ্ট্রী প্রাকৃতভাষায় রচিত ঐতিহাসিক কাব্য বলে

একে মনে করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এখানি রাজপ্রশস্তিমূলক রচনা। কবির কল্পনায় রাজা বিষ্ণুপ্রতিম বা বিষ্ণুর অবতার। তাঁর দিগ্‌বিজয় বর্ণনা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হলেও যাঁর নামে কাব্যটির নাম, সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি অজ্ঞাত থেকে গেছে। কেন না, এই কাব্য থেকে জানা যাবে না কে সেই নিহত গৌড়রাজপুত্র, কোথায় তাঁর রাজধানী, যশোবর্মণের সঙ্গে শত্রুতার কারণই বা কি ছিল। গৌড়রাজপুত্রের মৃত্যু ঘোষণা একটি মাত্র শ্লোকে (শ্লোকসংখ্যা ১১৯৪) বর্ণিত হয়েছে।

পদ্মগুপ্তের 'নবসাহসাঙ্কচরিত' কাব্যখানির প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয় রাজকন্যা শশিপ্রভার কাহিনী, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নবসাহসাঙ্কের কথা। একে চরিত কাব্যরূপে গণ্য করা যায় না, কেননা এর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

বিহ্লণের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। তিনি বৈদর্ভী রীতিতে আঠারো সর্গে রচিত এই কাব্যের শেষে দীর্ঘ আত্মপরিচয় দিয়েছেন এবং তিনি কহ্লনের মতোই কাশ্মীরের অধিবাসী। তিনি চোলরাজ এবং কল্যাণের চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের মধ্যে যুদ্ধের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অলৌকিকতার প্রক্ষেপ ও কালগত সঙ্গতির অভাব সত্ত্বেও প্রাপ্ত লিপি ও অনুশাসনগুলি বিহ্লণের বিবরণকে মোটামুটিভাবে স্বীকৃতি জানায়।

'কুমারপালচরিত' স্বতন্ত্র কাব্য নয়। হেমচন্দ্র সূরি (১০৮৮-১১৭২) 'সিদ্ধ হেমচন্দ্র' নামে একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের প্রাকৃতাংশের দৃষ্টান্ত হিসাবে আট খণ্ডে কাব্যখানি রচিত হয়। প্রথম পঞ্চম ও ষষ্ঠসর্গের কিয়দংশে বর্ণিত হয়েছে অনহিলপুরের ঐশ্বর্য, জৈনমন্দিরের সমৃদ্ধি, রাজার এবং তাঁর প্রজাকুলের জৈনধর্মে অনুরাগ এবং বিলাসকলার কাহিনী। ষষ্ঠসর্গে কুমারপাল ও কোঙ্কনরাজ মল্লিকার্জুনের সৈন্যদের যুদ্ধ ও মল্লিকার্জুনের মৃত্যু বিবৃত হয়েছে। এই কাব্যখানি সংস্কৃত ভট্টিকাব্যের মত প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্রগুলির দৃষ্টান্ত হিসাবে লেখা। সেজন্যই কাব্যখানি চরিতকাব্যরূপে বিশেষত্বহীন।

'রামচরিত' কাব্যখানি 'কলিকালবাল্মীকিঃ' সন্ধ্যাকর নন্দীর রচনা। আর্যাছন্দে গ্রথিত ও 'শ্লেষ' অলঙ্কার মণ্ডিত দ্ব্যর্থবোধক এই কাব্যখানি গৌড়ের পালরাজবংশের রামপালদেবের কীর্তিকথাবাহক। মহীপালের রাজত্বকালে (৯৮৮-১০৩৮) দিব্যোক কর্তৃক বরেন্দ্রী ('সীতা') হরণ এবং পরবর্তীকালে

তৃতীয় বিগ্রহপালের কনিষ্ঠ পুত্র রামপালদেব কর্তৃক বরেন্দ্রী উদ্ধার এই কাব্যের মূল বক্তব্য। রামপালদেবের পর কুমারপালদেব ও তৃতীয় গোপাল সিংহাসনে বসেন। এই কাব্যে তাঁদের সম্পর্কে একটি করে শ্লোক আছে। কিন্তু মদনপালদেবের রাজত্বকাল সম্পর্কে (১১২০-৫৫) ছত্রিশটি শ্লোক লিপিবদ্ধ হয়েছে। কাব্যখানি রচিত হয়েছিল তাঁরই সময়ে। সন্ধ্যাকরের পিতা প্রজাপতি নন্দী রামপালদেবের অমাত্য ছিলেন, কাজেই তাঁর সমকালীন তথ্য সন্ধ্যাকর জ্ঞাত ছিলেন। রাজ-চরিত ও ইতিবৃত্তের যুগ্ম স্বাক্ষর ঘটেছে এই কাব্যে।

এই সূত্রে ইতিহাসাচার্য কহ্লণ রচিত কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থের আলোচনা করা কর্তব্য। কহ্লণের গ্রন্থ দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে (১১৫০ খৃঃ) সমাপ্ত হয়। কহ্লণ তাঁর গ্রন্থের শুরুতেই লিখেছেন পূর্বগামী লেখকদের কৃত "ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সর্বপ্রকার স্খলন সংশোধন মানসেই এই গ্রন্থে তিনি ধারাবাহিক বর্ণনা নিবদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছেন।" তিনি তাঁর পূর্বাচার্যদের মধ্যে সুব্রত, হেলারাজ ক্ষেমেন্দ্র প্রভৃতির নাম করেছেন। কহ্লণ জানিয়েছেন, তিনি রাজগণের মন্দির প্রতিষ্ঠার শাসনপত্র, দানপত্র, প্রশস্তিপত্র পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং নৃপতিদের শাসিত দেশ ও কালের সামঞ্জস্য সাধন করেছেন।

অবশ্য কহ্লণ তাঁর অতীত কালেব ইতিহাস রচনায় অলৌকিক জনশ্রুতি, পুৰাণবর্ণিত আখ্যান বা অনৈতিহাসিক তথ্যকে বর্জন করতে পারেন নি। তবু তিনিই প্রথম ভাবতীয় সাহিত্যে ইতিহাস-রচয়িতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ ঘোষণা করলেন:

শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান্ বাগদ্বেষবহিষ্কৃতা।
ভূতার্থকথনে যস্য স্থেয়স্যেব সবস্বতী ॥' (১।৭)

অর্থাৎ সেই গুণবানই শ্লাঘ্য, ভূতার্থকথনে যাঁর বাণী (সরস্বতী) স্থেয় অর্থাৎ বিচারকেরই মতো বাগদ্বেষ বর্জিত হয়।

কহ্লণরচিত 'রাজতরঙ্গিণী'র পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন কবি-ঐতিহাসিক কাশ্মীব রাজবংশের দীর্ঘ ইতিহাস রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি বহুলাংশে বজায় রাখতে পেরেছেন। না হলে তিনি কাশ্মীর নৃপতি ললিতাদিত্য মুক্তাপীড কর্তৃক গৌড়াধীশ বধের নিন্দা এবং গৌডবীরগণের উক্ত হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ প্রচেষ্টার প্রশংসা করলেন কি করে?

অথবা নৃপতি কলশদেবের নিন্দনীয় আচরণ সম্পর্কেই বা কী করে লেখেন ঃ

> "নির্লজ্জ নৃপতির দুঃশীলতার বৃত্তান্ত বর্ণনার অযোগ্য হলেও বর্ণনীয় আখ্যানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলে বর্ণিত হল।"

ঐকালের 'ইতিবৃত্ত' স্বাভাবিক নিয়মেই 'রাজবৃত্ত' বা রাজচরিত। কহ্লণ তাঁর রচনায় সমকালের যে তথ্যপূর্ণ, বিচিত্র, জটিল, রাষ্ট্রীয় ইতিহাস এবং রাজগণের যে ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার নয়। তিনি 'শাসনপত্র, দানপত্র, প্রশস্তিপত্র' পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং নৃপতিদের 'দেশ ও কালের সামঞ্জস্য' সাধন করেছেন, এই দুটিই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষ্যবহ। তাঁর ইতিহাস-চিন্তায় নিরপেক্ষ দৃষ্টির ঘোষণাও প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালেরই কথা।

সপ্তম তরঙ্গ বর্ণনাশেষে অষ্টম তরঙ্গে এই আদ্যন্ত বর্ণিত বিষয়ের সূচী সংকলন করেছেন। কোন্ রাজার মৃত্যু বা গুপ্তহত্যার পর কে রাজা হয়েছেন তাঁর রাজ্যকালের বিবরণ দানের রীতিতে এই ক্রণিকল বা রাজবৃত্ত রচিত। অষ্টম তরঙ্গের শেষে তিনি লিখেছেন ঃ

> "যেমন গোদাবরী নদী বহু তরঙ্গযুক্ত হয়ে বেগে সমুদ্রে পতিত হচ্ছে, এই রাজতরঙ্গিণী কাব্য সপ্ততরঙ্গে প্রবাহিত হয়ে শ্রীকান্তিরাজার বংশরূপ সমুদ্রে বিরামের জন্য প্রবেশ করল।"

কাজেই দেখা যায় কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী ব্যতীত আর কোন গ্রন্থকেই ইতিবৃত্ত আখ্যা দেওয়া যায় না। বৌদ্ধ, জৈন বা ব্রাহ্মণ্যমতে অবতারকল্প মহাপুরুষদের যে চরিতকাব্য লেখা হয়েছে সেগুলি মানবস্বীকৃতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিসম্মত নয়। সুতরাং 'ইতিহাস' শব্দের যত ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক, যত মূল্যায়নই করা হোক প্রাচীনকালের ভারতে উল্লেখযোগ্য ইতিবৃত্তচর্চা হয় নি বলেই চরিতগ্রন্থের অভাব। এ সম্পর্কে মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মন্তব্য উৎকলনযোগ্য ঃ

> "এতদ্দেশে কালনিয়ামক কোন ইতিহাস লেখনের প্রথা না থাকাতে এই মহাবিস্তৃত ভারতরাজ্যের প্রধান প্রধান রাজা ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের জীবনবৃত্তান্ত এককালে বিলুপ্তপ্রায় হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। মহামহিম পৃথ্বীরাও, শিবজী প্রভৃতি বিখ্যাত ভারতীয় রাজাদিগের জীবনচরিত অন্বেষিতে প্রবৃত্ত হইলে এ বিষয়ের কিছুমাত্র তত্ত্ব জানাও সাতিশয় দুর্ঘট হইয়া উঠে। যদি সাময়িক ইতিহাসাদি গ্রন্থ রচনার

দেশীয় রীতি থাকিত, তাহা হইলে আর এমন সকল মহামহিমগণের কীর্তির লোপাপত্তি সম্ভাবনা হইত না। ঈশ্বরেচ্ছায় এখনও যদি ইহা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয় তাহা হইলেও দেশের যথেষ্ট উপকার।"[২৫]

সাময়িক ইতিহাসাদি গ্রন্থ রচনার দেশীয় রীতি না থাকবার প্রকৃত কারণ বস্তুনিষ্ঠভাবে নির্ণয় করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর পূর্বে ভারতীয়দের ঐতিহাসিক চেতনার অভাবের প্রকৃত কারণানুসন্ধান দেখা যায় নি। বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ-শক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক। তিনি ইহলোক, ব্যক্তিমানুষ ও মানবসৃষ্ট প্রত্যক্ষ সমাজকে মুখ্য আলোচ্য বিষয় বলে গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিমানুষ ও সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে উভয়েরই কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতা লাভ তাঁর কাম্য ছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দৈবশক্তির বর্জন ও মানবশক্তি-নির্ভর। মানুষের নিজের অন্তর্নিহিত বৃত্তিগুলির সম্যক অনুশীলনে তার পরিপূর্ণতা—এই সত্যে বঙ্কিম বিশ্বাসী হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য এই তত্ত্ব বঙ্কিমের নিজস্ব সৃষ্টি নয়। ফরাসী দার্শনিক কঁতের (Comte) কাছ থেকেই তিনি অনুশীলনতত্ত্বের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন।

ভারতীয়দের ইতিহাসচর্চায় নিরুৎসাহের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

> "ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। জগতের যাবতীয় কর্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাহাদিগের বিশ্বাস। ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে, ইহাও তাহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শুভের নাম 'দৈব', অশুভের নাম 'দুর্দৈব'। [তাঁহারা] দেবতাই সর্বত্র সাক্ষাৎ কর্তা বিবেচনা করেন। এজন্য তাহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্তনে প্রবৃত্ত, পুরাণে ইতিহাসে কেবল দেবকীর্তিই বিবৃত করিয়াছেন। যেখানে মনুষ্যকীর্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মনুষ্যগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবানুগৃহীত, সেখানে দৈবের সংকীর্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্যেরই কর্তা নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত গুণ কীর্তনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিকভাব ও দেবভক্তি অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ।"[২৬]

বেভাবেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইতিহাস বা জীবনচরিত না থাকার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম খাঁটি সত্যসন্ধ

দৃষ্টি নিয়ে এই অনস্তিত্বের কারণ সুস্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করেছেন। 'মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্যেরই কর্তা নহে' এই মনোভাব রেণেসাঁসী-চেতনাদীপ্ত বঙ্কিম-মানস স্বীকার করেনি। রেণেসাঁস আন্দোলনের মুখ্য শক্তি মানবস্বীকৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র যে মানবস্বীকৃতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তার প্রকৃত উৎস ভারতীয় সাহিত্যে নয়, পাশ্চাত্যের চিন্তায়। গ্রীক ইতিহাসের যে মূল্যবান প্রতিষ্ঠা হেরোডোটাস ও থুকিডিডিস-এর হাতে ঘটেছে তার আলোচনা করলেই বোঝা যায় 'মনুষ্য কোন কার্যেরই কর্তা নহে' এই মানববিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁরা মানেননি।

কলিংউড এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> "Greek history is not legend, but research, It is not theocratic, it is humanistic. It is not mythical, they are events in dated past."[২৭]

হেরোডোটাস তাঁর গ্রন্থের[২৮] উপক্রমণিকা (preface) অংশে স্পষ্টই লিখেছেন: মানুষেরই কর্মের বিবরণ দান তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। থুকি-ডিডিসের অনুরূপ মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।[২৯]

গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাসচর্চার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানে রত হলে দেখা যায় তার মূলসূত্র মানবস্বীকৃতি (Humanism)। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ও থুকিডিডিস এবং রোমীয় ঐতিহাসিক পলিবিয়স, লিভি ও তাসিতাস প্রভৃতির ইতিহাস-চর্চা নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে কলিংউড একটি অধ্যায় রচনা করে তার নাম দিয়েছেন: 'Character of Greco-Roman Historiography: (i) Humanism' এবং ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> "It is a narrative of human history, the history of man's deeds, man's purposes, man's successes and failures. It admits, no doubt, a divine agency, but the function of this agency is strictly limited. The will of the gods as manifested in history only appears rarely, in the best historians hardly at all and then only as a will supporting and seconding the will of man and enabling him to succeed where otherwise he would have failed."[৩০]

পাশ্চাত্যের এই মর্ত্যমুখ্য মানবস্বীকৃতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশিত ভারতীয় মনের "বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি"র পার্থক্য সুস্পষ্ট। কেননা বঙ্কিমচন্দ্র সোজা ভাষায় বলেছেন:

> "যেখানে মনুষ্যকীর্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মনুষ্যগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবানুগৃহীত; সেখানে দৈবের সংকীর্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্যেরই কর্তা নহে অতএব মনুষ্যের প্রকৃত গুণকীর্তনে প্রয়োজন নাই।"

আর গ্রীক-রোমীয় দৃষ্টিভঙ্গিব তাৎপর্য, মানুষ সকল কাযেরই কর্তা অতএব মানুষের দোষগুণ বিচারের প্রয়োজন আছে: "The ultimate development of this tendency is to find the cause of all historical events in the personality, whether individual or corporate of human agents. This implies that whatever happens in history happens as a direct result of human will".[৩১]

এই মানবমুখ্য ঐহিক দৃষ্টিভঙ্গিব অভাবের জন্যই ইতিবৃত্ত বা চবিত-সাহিত্যেব চর্চা ভাবতীয় সাহিত্যে কম। গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাসচচার সঙ্গে চরিতসাহিত্য চচাব কথা স্বতঃই মনে আসে। পূর্বেই বলা হয়েছে অধুনাপূর্ব যুগ অবধি ইতিহাস ও চবিত সমার্থক ছিল।[৩২] যেমন হেরোডোটাসকে বলা বয়েছে 'father of history'। তেমনি প্লুটার্ককে বলা উচিত 'father of biography'। প্লুটার্কের (আঃ ৪৬—১২০) 'Lives'-গ্রন্থে ছেচল্লিশজন খ্যাতনামা গ্রীক ও রোমক সমানধর্মা পুরুষেব তুলনামূলক আলোচনা কবা হয়েছে। প্রথমে একজন গ্রীক পরে তাব সমধর্মা একজন বোমকের জীবনকাহিনী বর্ণনা কবেছেন পৃথক পৃথক ভাবে। শেষে দুজনেব মধ্যে একটি তুলনামূলক বিচার লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—থিসিয়ুসেব সঙ্গে বোম্যুলাসের, লাইকাবগাসের সঙ্গে নুমা পম্পিলিয়াসেব, আলেকজাণ্ডাবের সঙ্গে সীজারের, ডিমোস্থেনিসেব সঙ্গে কিকেরোর, এই ধরনেব আলোচনা। অবশ্য সবগুলির তুলনামূলক বিচার পাওয়া যায়নি, হয় সেগুলি লিখিত হয়নি অথবা লুপ্ত হয়ে গেছে।

প্লুটার্ক স্বভাবতই অতীতকালের বিভিন্ন বীব বা রাষ্ট্রনেতাদের চরিত বর্ণনায় জনশ্রুতিকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। সেজন্য ইতিবৃত্ত ও ইতিকথা বহুক্ষেত্রে তাঁর বচনায় সংমিশ্রিত হয়েছে একথা স্বীকার্য। তবু দেখা যায়

তিনি সর্বত্র জনশ্রুতিমাত্রকেই নির্বিচারে গ্রহণ করেননি। থিসিয়ুস ও রোম্যুলাসকে বলা উচিত 'পৌরাণিক' চরিত্র কিন্তু পরবর্তীকালের লাইকারগাসকে তো তাঁদের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। তাই প্লুটার্ক ঐ চরিত বর্ণনায় খাঁটি ঐতিহাসিকের মতো সোজা ভাষায় জানিয়েছেন :

"There is so much uncertainty in the accounts which historians have left us of Lycurgus, the law-giver of Sparta, that scarcely anything is asserted by one of them which is not called into question or contradicted by the rest."

অথবা তিনি যেখানে সোলোনের চরিত বর্ণনা করেছেন, সেখানেও কোন অলৌকিকতা বা অতিপ্রাকৃত তথ্য নেই; চমৎকার তথ্যসম্মত চরিত তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এমন কি অ্যারিস্টটলের প্রদত্ত তথ্যও তাঁর কাছে বিচারসহ বলে মনে হয়নি :

"The story that ashes were scattered about the island Salamis is too strange to be easily believed or be thought anything but a mere fable, and yet it is given, amongst other good authors by Aristotle, the philosopher."

অথবা কেটো তাঁর পুনর্বিবাহের জন্য তাঁর পূর্বপত্নীর গর্ভজাত সন্তানকে যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন প্লুটার্ক তাকে মিথ্যা বলেছেন—"For the reason he pretended to his son was false." ভ্রান্তির নিরসন ও সত্যপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস প্লুটার্ক বহুক্ষেত্রে করেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য হেরোডোটাস, থুকিডিডিস, অ্যারিস্টটল, ইস্কিলাস প্রভৃতির রচনা থেকে সমর্থন খুঁজেছেন। তিনি তাঁর 'Lives' গ্রন্থ রচনায় সমকালীন শিক্ষিত গোষ্ঠীর মতো অ্যারিস্টটলীয় নীতিবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মানুষের নৈতিক জীবন এই গ্রন্থ পাঠের দ্বারা উন্নীত হবে, এ উদ্দেশ্য তাঁর ছিল। টিমোলিয়ন চরিত বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে প্রথমে, শুধু পাঠকদের চিত্তের উন্নতি হবার কথা ভেবে এই গ্রন্থ রচনায় তিনি ব্রতী হয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা তিনি নিজেই উপকৃত হয়েছেন সবচেয়ে বেশি।

স্বীকার করতে হবে চরিতসাহিত্যে চিরদিনই প্লুটার্ক কথিত নৈতিক

মূল্যবোধের দিকটি রক্ষিত হয়েছে। প্লুটার্ক চরিতসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে আরেকটি মূল্যবান কথা বলেছেন আপাততুচ্ছ ঘটনার গুরুত্ব সম্পর্কে। আলেকজাণ্ডারের চরিত বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> "In writing the 'Lives of Illustrious men' I am not tied to the laws of history : nor does it follow that because an action is great, it therefore manifests the greatness and virtue of him who did it : but on the other side sometimes a word or a casual jest betrays a man more to our knowledge of it than a battle fought."

স্যামুয়েল জনসন্ এই ক্ষেত্রে (১৭০৯—৮৪) প্লুটার্কের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন—কেননা জনসন্ও বিশ্বাস করতেন, একটি উক্তি বা সামান্য ঘটনা একটি ব্যক্তিত্বকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে। তিনিও বিশ্বাস করতেন নৈতিক শিক্ষার দিক থেকে যে-কোন মানুষেব জীবনই আলোচনার যোগ্য।[৩৩]

প্লুটার্কের রচনাগুণে অধিকাংশ চরিতবর্ণনা জীবন্ত বলে মনে হয়। আমাদের সাহিত্যে কোনো 'প্লুটার্কের' অভ্যুদয় হয়নি, না হবার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাখ্যা করেছেন, তার চেয়ে সঙ্গততর কোনো ব্যাখ্যাদান সম্ভব নয়। সেজন্য আমাদের সাহিত্যে বুদ্ধচরিত থেকে রামচরিত পর্যন্ত কাব্যধারা রচিত হলেও পাশ্চাত্যের ইতিবৃত্ত বা চরিতচর্চার কাছে তারা দাঁড়াতে পারে না।

পাদটীকা

১। A History of Indian Literature vol. I Intro. p. 3.

২। Alberuni's India, p. 10.

৩। "probably soon developed into Epic poems of considerable lengths i.e. heroic songs and into entire cycles of epic songs, centring around one hero or one great event." (Indian. Lit. vol. I p. 314) এবং "the origin of the epic lay in the priestly hymns accompanying the annual cycle and in the songs in praise of the liberality of princes the narasamsi-gatha." (Hopkins).

৪। 'Mahabharata'—Sukumar Sen, Our Heritage vol. V. Pt. I

৫। ব্রহ্মচারিপ্রকরণম্ দ্বিতীয়, আচার, ৪৫।

৬। Milinda-panha, I. 10.

৭। তৎ কাবশ্বিনৌ স্থাবাপৃথিব্যাবিত্যেকে। অহোরাত্রাবিত্যেকে। সূর্যাচন্দ্রমসাবিত্যেকে। বাজানৌ পুণ্যকৃতা বিতৈ্যতিহাসিকাঃ।

(নিরুক্ত ১২।২।৫-৮)

যাস্ক তাঁর নিরুক্ত ভাষ্যে বেদব্যাখ্যার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন, 'ঐতিহাসিক' এমনি একটি সম্প্রদায়। 'who interpreted the Veda with reference to traditional history' (Vedic Index, I, p. 122). পতঞ্জলি 'যযাতিক' নামে এক গায়ক-গোষ্ঠীর নাম করেছেন, যারা 'যযাতি'-উপাখ্যান গান করত।

৮। অর্থশাস্ত্র, ৩য় অধ্যায়, ১ম প্রকরণ।

৯। মহাভারত, আদি পর্ব, ১ম অধ্যায়।

১০। বায়ুপুরাণ ১. ২০১।

১১। মহাভারত, আদি পর্ব, ১৬।

১২। মহাভাবত, আদি পর্ব, ২৬।

১৩। অর্থশাস্ত্র—৫ম অধ্যায়, ২য় প্রকরণ।

১৪। তদেব—ষষ্ঠ অধ্যায়, ৯৫ প্রকরণ।

১৫। মানবধর্মশাস্ত্র, ৩।২।৩২।

১৬। Introduction, Lalitavistara, Ed. by R.L.Mittra (1877).

১৭। ধ্বন্যালোক, তৃতীয় উদ্দ্যোত। শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত।

১৮। বুদ্ধচরিত, ১২শ সর্গ, ১২০। কাওয়েল সম্পাদিত বুদ্ধচরিত (১৮৯৩)।

১৯। এই সূত্রে দ্রষ্টব্য 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংবর্ধন লেখমালা'এবং Journal of Asiatic Society of Bengal-এ (1930)শ্রীসুকুমার সেনের প্রবন্ধ।

২০। সৌন্দরনন্দ কাব্যম্—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত (১৯১০)

২১। রবীন্দ্রসাহিত্যে অশোক,শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, 'ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সংকলিত।

২২। A History of Indian Literature, vol. II, p. 519.

২৩। বায়ুপুরাণের সূতবাক্য উদ্ধৃত করে জীবগোস্বামী লিখেছেন—'তদেব ইতিহাস-পুরাণয়োর্বেদত্বং সিদ্ধম্। বেদ শব্দেনাত্র পুরাণাদি দ্বয়মপি গৃহ্যতে। তদেবমিতিহাস-পুরাণ বিচার এব শ্রেয়ানিতি সিদ্ধম্।' ভাগবতকে বলা হয়েছে 'পুরাণানাম্ সামরূপ ইতি। বেদেষু সামবৎ পুরাণেষু শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ'।

২৪। শঙ্করবিজয়। শ্রীবিদ্যারণ্যবিরচিত। আনন্দাশ্রম গ্রন্থাবলী।

২৫। বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৭৭৬ শক, ফাল্গুন সংখ্যা।

২৬। বঙ্গদর্শন, ১২৮১, 'বাঙ্গালার ইতিহাস'।

২৭। Idea of History, Collingwood, Part I p. 18

২৮। হেরোডোটাস (খৃঃ পূঃ ৪৯০-৪৩০)। গ্রীক ও পারসীয়দের যুদ্ধের ইতিহাস তিনি নয়খণ্ডে রচনা করেন। তাঁকে বলা হয় 'father of history'.

২৯। থুকিডিডিস লিখেছিলেন পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস। তিনি জানিয়েছেন: "আমার বিবরণে গল্প ও কল্পনার মিশাল নেই। সেজন্য হয়তো তেমন সুখপাঠ্য নয়। তবে যাঁরা অতীত ঘটনার অবিকৃত বিবরণ ভালোবাসেন তাঁরা এই বিবরণ পাঠ করে তৃপ্তি পাবেন।"

৩০। Idea of History. p. 41.

৩১। Ibid.

৩২। গ্রীক Historia শব্দের অর্থ Inquiry বা অনুসন্ধান। Bio শব্দের অর্থ course of life বা জীবনপ্রবাহ। Graphos শব্দের অর্থ written. Historia শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন হেরোডোটাস তাঁর গ্রন্থের Title বা পরিচিতিরূপে। ইংরেজি সাহিত্যে ড্রাইডেন 'Biographia' শব্দের ব্যাখ্যা করেন—'Lives of Particular Men' প্লুটার্কের গ্রন্থের অনুবাদ কালে (১৬৮৩)।

৩৩। Johnson, Rambler, No. 60. দ্রঃ বসওয়েলের Life of S. Johnson.

॥ সূচনা ॥

[বৈষ্ণব চরিত কাব্য]

ত্রয়োদশ শতকের জন্মমুহূর্তে (১২০৩) তুর্কিদের হাতে গৌড়বিজয় ঘটল। সাধারণ-ভাবে তখন থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বৃটিশবিজয় (১৭৫৭) পর্যন্ত কাল-পর্বকে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাসে সাধারণত 'মধ্যযুগ' বলে থাকি। ব্রিটিশ আমল শুরু হওয়া থেকে বলি 'আধুনিক' যুগ।

তুর্কিদের বা পাঠান-মোগলের আমলে ক্রনিকল, ইতিবৃত্ত, চরিতের বহুল চর্চা হয়েছিল। তবকাৎ-ই-নাসিরী, বাহারিস্তান, তারিখ-ই-ফিরুজ-শাহী, তারিখ-ই-মোবারকশাহী, তুজুক-ই-জাহানগীরী অথবা বাবরের আত্মচরিত, আকবরনামা, জাহানগীরের আত্মচরিত প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থের নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু সমকালীন হিন্দুদের মধ্যে বাংলাদেশে এই ধরনের রচনার প্রচলন দেখা যায় না। বরঞ্চ উত্তর-ভারতে 'রাসউ' কাব্যে রাজগাথার সন্ধান মেলে, চন্দবরদাইয়ের 'পৃথ্বীরাজ রাসউ' (এই কাব্য পরে তাঁর পুত্র সমাপ্ত করেন) অথবা 'বিশালদেব রাসউ' প্রভৃতি কাব্য তার প্রমাণ। মারাঠীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল 'বখর', ইতিহাস-চর্চার নিদর্শনরূপে।

মধ্যযুগে বাঙালী হিন্দুর কোনোরূপ রাষ্ট্রচিন্তা ছিল না। সে তুর্কিবিজয়কে বা পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাকে 'ভাগ্য' 'নিয়তি' বা দৈবনির্দিষ্ট কর্ম বলেই মেনে নিয়েছিল। পরবর্তী কালের পাঠান, মোগল বা ব্রিটিশ শক্তির বিজয়ও তার কাছে অনুরূপভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। এ ইতিহাস অগৌরবের হলেও সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই লিখেছিলেন যে ভারতীয়দের বিশ্বাস ছিল:

> "ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে, ইহাও তাঁহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শুভের নাম 'দৈব' অশুভের নাম 'দুর্দৈব'। [তাঁহারা] দেবতাই সর্বত্র সাক্ষাৎ কর্তা বিবেচনা করেন।"

রাজপুত, মারাঠা, শিখের চেয়ে বাঙালীর এই 'বিশ্বাস' অনেক বেশি ছিল।

বাংলাদেশে মধ্যযুগে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ব্যক্তি চৈতন্যদেব (১৪৮৬—১৫৩৩)। হুসেন শাহের রাজ্যকালে (১৪৯৩—১৫১৯) চৈতন্যদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত

হয়ে 'জ্ঞান' অথবা 'কর্ম' পথের চেয়ে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ সাধন-পন্থা বলে ঘোষণা করেন। তিনি রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না, ধর্ম-সাধক রূপেই তাঁর পরিচয়। হিন্দুসমাজে যারা সনাতনী রক্ষণশীল সম্প্রদায় কর্তৃক উপেক্ষিত অথবা সমাজচ্যুত হয়েছিল তাদের 'হরি হরি বোলাইয়া আচণ্ডালে ধরি' তিনি কোল দিলেন। তিনি উচ্চকুলজাত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়েও সনাতনী সমাজের প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। সমাজচ্যুত ব্যক্তিদের বৈষ্ণব সমাজভুক্ত করে নিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে যবন কাজী নত হয়েছেন, রূপ-সনাতন সুলতান হুসেন শাহের কর্মত্যাগ করে বৈষ্ণব সেবাব্রত গ্রহণ করেছেন। অদ্বৈতবাদী বাসুদেব সার্বভৌম তাঁর চারিত্র ও পাণ্ডিত্যের কাছে পরাজয় বরণ করেছেন, উৎকলরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁর প্রসাদলাভে নিজেকে ধন্য মনে গণেছেন। এ ধরনের বহু ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

কাজেই দেখা যায় সেদিনকার সমগ্র বাংলাদেশের বিরাট এক অংশকে চৈতন্যদেব নতুন আবেগে আনন্দে নবোন্মাদনায় মাতিয়ে তুলেছিলেন। যে মানুষের মধ্যে বড়ো জীবনের প্রকাশ ঘটে, সেই মানুষের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সমগ্র জাতির চেতনাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দেয়। সেই বড়ো-জীবনের মানুষ তখন পূজার যোগ্য হয়ে ওঠেন, বন্দিত হন দেবকল্প মহিমায়। চৈতন্যদেব তাঁর সমকালে নিজ জীবনের আলোকে বহু জীবনকে আলোকিত, শুদ্ধ করে তুলতে পেরেছিলেন। তখন তাঁকে অবলম্বন করে স্বতঃই রচিত হয়েছে নতুন ভাবের কাব্য, পদ ও সঙ্গীত। চৈতন্যদেব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই সূত্রে প্রণিধানযোগ্য :

"আমাদের বাঙালির মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘা-কাঠার মধ্যে বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আসল কথা, বাংলায় সেই একদিন সমস্ত একাকার হইবার জো হইয়াছিল। তাই কতকগুলা লোক খেপিয়া চৈতন্যকে কলসীর কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। কলসীর কানা ভাঙিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু মুসলমানেও প্রভেদ রহিল না। বৃহৎ ভাব যখন অগ্রসর হইতে থাকে তখন তর্কবিতর্ক খুঁটিনাটি সমস্তই অচিরাৎ আপন আপন গর্তের মধ্যে সুড়সুড় করিয়া

প্রবেশ করে। চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলা দেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এককণ্ঠবিহারী বৈঠকি সুরগুলা কোথায় ভাসিয়া গেল? তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ হিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল।"[১]

তাই বলতে পারি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব যথার্থই বাঙালি জাতির চৈতন্য-চন্দ্রোদয়। চৈতন্যদেব সাধারণের বহু উর্ধ্বে একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন একথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু সেকালের চরিতকারেরা তাঁকে যেরূপ 'পৌরাণিক' অলৌকিকতায় মণ্ডিত করে দেখিয়েছেন, সেটা মেনে নিতে একালে অনেকেই অপারগ। চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বনে সহচর মুরারি গুপ্ত ও চৈতন্য-পার্ষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেন সংস্কৃতে মহাকাব্য ও নাটক রচনা করেছেন।

বৃন্দাবনদাস, লোচন, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চূড়ামণি দাস বাঙলা ভাষায় চৈতন্যচরিত লিপিবদ্ধ করেন। বহু পদকর্তা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদও রচনা করেন। সকলেই চৈতন্যদেবকে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বা স্বয়ং ঈশ্বররূপে বর্ণনা করেছেন। মুরারি গুপ্ত ও কবিকর্ণপূর উভয়েই তাঁদের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' রচনাকালে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কথিত 'যদা যদা হি ধর্মস্য' শ্লোকটি ও 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' বর্ণিত কৃষ্ণলীলাকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। ভাগবতে যেমন শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদ অথবা পুরাণগুলিতে যেমন শিব-পার্বতী প্রশ্নোত্তর গ্রন্থারম্ভে দেওয়া হয়েছে, তেমনি দামোদর-মুরারির প্রশ্নোত্তর রীতিতে কাব্য রচনা করেছেন মুরারি গুপ্ত। মুরারি গুপ্ত তাঁর কাব্যে চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা অর্থাৎ কৃষ্ণান্বেষণ, প্রলাপ, গোপীভাব, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতির বিশদ বিবরণ না দিলেও প্রসঙ্গগুলির উল্লেখ করেছেন।[২]

মুরারি গুপ্তের কাব্যে চৈতন্যদেবের তিরোধানের উল্লেখ আছে।[৩] তিনি চৈতন্যদেবের জীবনের যে ঘটনাগুলি বিবৃত করেছেন তাঁর পরবর্তীকালে সকলেই সেগুলির ব্যবহার করেছেন। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের জন্ম থেকেই তাঁর উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছেন। কাজেই মুরারি গুপ্তের গৃহে চৈতন্যদেবের মহাবরাহ রূপ ধারণ, (২/১৩—১৮) চৈতন্যদেবের ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে দেবগণ কর্তৃক শচীর গর্ভ বন্দনা (১/৫), হরিনামে কুষ্ঠরোগীর ব্যাধি আরোগ্য (২/১৩), নিত্যানন্দকে প্রথমে 'ষড়ভুজ' তারপর "ক্ষণাচ্চতুর্ভুজম্ রূপম্ দ্বিভুজশ্চ ততঃ

ক্ষণাং।" (২/২৭) গজপতি প্রতাপরুদ্রকে 'শ্রীবিগ্রহং ষড়্ভুজমদ্ভুতং" রূপপ্রদর্শন (৪/১৩; ৪/২০) প্রভৃতি ঘটনা স্বাভাবিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যখানিতে চৈতন্যদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সবই প্রায় বিবৃত হয়েছে। অলৌকিক অংশগুলিকে বর্জন করলে ঐ কাব্য থেকে আমাদের পক্ষে তৎকালীন একজন শ্রেষ্ঠ মানব তথা সাধকের ব্যক্তি-পরিচয় লাভ বহুলাংশে সম্ভব হয়।

তাঁর দুরন্তপনা, মাতাকে প্রহার, শিক্ষা, দুইবার বিবাহ, বঙ্গজদের ভাষার প্রতি কৌতুক-কটাক্ষ, সন্ন্যাস, দেশভ্রমণ, সাধকজীবন যাপন, নীলাচল-লীলা প্রতাপরুদ্রসাক্ষাৎ সবই বিশ্বাস্য তথ্য। বরঞ্চ মনে হয় মুরারির কাব্যেই অলৌকিকতা অপেক্ষাকৃত কম। পরবর্তী সকলেই ঐ তথ্য ব্যবহার করেছেন ও তার উপর প্রচুর রং চড়িয়েছেন।

চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস ঐ কালে খুবই স্বাভাবিক। তার মুখ্য কারণ রচয়িতারা সকলেই চৈতন্যভক্ত। তাঁকে কোনো চরিতকারই 'নর'রূপে দেখেন নি, সকলেই ষড়ৈশ্বর্যময় নারায়ণরূপে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। অবশ্য কোথাও তাঁর মানবরূপ প্রকাশিত হয়নি, এমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

চৈতন্যদেব বা অদ্বৈতাচার্য বা নরোত্তমের জীবন নিয়ে যে চরিত কাব্যগুলি রচিত হয়েছে সেগুলি কিয়দ্ পরিমাণে 'গোষ্ঠীকেন্দ্রিক' বা 'সাম্প্রদায়িক' সাহিত্য হতে বাধ্য। চৈতন্য অনুরাগী বৈষ্ণব সমাজ বৈষ্ণব ধর্মগুরুদের যে বিনম্র শ্রদ্ধায় দেখেছেন, অন্যেরা সকলেই তাঁদের অনুরূপ চোখে দেখবেন আশা করা যায় না। বৈষ্ণবেরা বাংলা সাহিত্যে ষোড়শ শতকে একটি নতুন ধারা 'চরিত সাহিত্য' এনেছেন একথা অবশ্যস্বীকার্য। চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই তাঁর মহিমাজ্ঞাপক চরিতকাব্য রচনা শুরু হয়েছে। ভক্ত বৈষ্ণবেরা চরিতকাব্য রচনায় মেনে নিয়েছিলেন 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর' দৃষ্টিভঙ্গি। অবশ্য পাশ্চাত্যেও ধর্মগুরুদের চরিত্রমহিমাবর্ণিত রচনায় অর্থাৎ Hagio-graphyগুলিতে অলৌকিকতা, মহিমা প্রতিষ্ঠাসূচক অবিশ্বাস্য ঘটনার উপস্থাপনা যথেষ্ট বিদ্যমান।[৪] য়ুরোপেও মধ্যযুগে জনসাধারণের মনে ধর্মগুরুদের সম্পর্কে অন্ধ ভক্তি ও প্রশ্নলুপ্ত শ্রদ্ধা ছিল। থুকিডিডিসের ইতিহাসের আদর্শ তখন আর বেঁচে ছিল না। 'Biography'র বিশিষ্ট লক্ষণ হল ব্যষ্টি মানুষের ইতিবৃত্ত রচনা। সেখানে প্রতিটি মানুষ স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হবে। কিন্তু Hagio-graphy

বা Legends of the Saintsতে দেখা যায় মোটামুটিভাবে ধর্মবীর বা ধর্মগুরুদের চরিতকাহিনীগুলি সবই এক ধাঁচের, প্রায় একই ছকের।[৫]

বৈষ্ণবজীবনী সম্পর্কে একই কথা বলা অবশ্য ঠিক হবে না, যদিচ সকল বৈষ্ণব চরিতকাব্যেই অলৌকিক ঘটনা বা অতিপ্রাকৃত উপাদান বহুল পরিমাণে সন্নিবেশিত হয়েছে। মর্ত্যের মানুষকে 'অবতার' বা ভগবানরূপে গড়তে গেলে অলৌকিক মহিমা আরোপ ছাড়া সম্ভব হবে কি করে?

চৈতন্যচরিত ও অন্যান্য বৈষ্ণব জীবনীতে অলৌকিকতা আরোপ প্রসঙ্গে একটি কথা স্বভাবতই মনে হয়। মুরারি গুপ্ত ও কবি কর্ণপূর তাঁদের কাব্য ও নাটক লিখেছেন সংস্কৃত মহাকাব্য, পুরাণ ও নাটকের আদর্শে। পুরাণে অলৌকিক কাহিনীর প্রাচুর্য লক্ষণীয়। চৈতন্যদেবের ভগবত্তা বা ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মুরারি ও কর্ণপূর বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ আয়াস করেছেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় বৃন্দাবনদাস, লোচন ও জয়ানন্দ যে চৈতন্য জীবনী লিখেছেন বা তাঁদের পরবর্তীকালে অদ্বৈত, নরোত্তম প্রভৃতির যে চরিতকাব্য রচিত হয়েছে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন বৈষ্ণবদের হাতের 'মঙ্গলকাব্য'। বিভিন্ন লৌকিক বা অর্ধ-পৌরাণিক দেবদেবীর যেমন, মনসা, চণ্ডী বা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার মৌল আকাঙ্ক্ষায় একদা মঙ্গলকাব্যগুলির জন্ম। ছলে বলে প্রতিপক্ষের পরাজয় বা পূজা ঘটিয়ে নিজেদের পূজা প্রবর্তন ও ভক্তকে কৃপা বিতরণ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণের মুখ্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। বৈষ্ণব কবিদের অনেকে তাঁদের কাব্যকে মঙ্গলকাব্যের ছাঁচেই গড়তে চেয়েছিলেন, চৈতন্যমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল প্রভৃতি নাম তারই সাক্ষ্যবহ। শুধু গঠনে নয় এই পর্যায়ের কাব্যে দেখা যায় মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের অনুরূপ বৈষ্ণবধর্মগুরুদেরও অসীম দৈবশক্তি, অলৌকিক বল-প্রয়োগে বিরোধী পক্ষকে দমন বা তাদের সংশয় প্রশমন করবার অসংখ্য বৃত্তান্ত। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন:

দেখিয়া গর্জয়ে প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
'মুঞি সেই মুঞি সেই' বোলে বার বার॥
এই মতে ধ্যায়া গেলা শ্রীবাসের ঘরে
'কি করিস শ্রীবাসিয়া।' বোলে অহঙ্কারে॥
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার দুয়ারে॥

"কাহারে বা পূজিস করিস কার ধ্যান।
যাহারে পূজিস তারে দেখ বিদ্যমান ॥"

শ্রীবাস সবিস্ময়ে দেখলেন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী রূপ। চৈতন্যদেব তখন আদেশ করলেন:

'সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই পঢ় মোর স্তব ॥[৬]

শেষ শ্লোকটিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতিধ্বনি থাকলেও মঙ্গলকাব্যের spirit ও অলক্ষিত নয়। চরিতকাব্যগুলিতে চৈতন্যদেবের মুখে বহুবার এই উক্তি বসানো হয়েছে যে তিনিই বিষ্ণু, কংসারি কৃষ্ণ, রাবণারি রাম, বলিদর্পহারী বামন ইত্যাদি। (বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কৃষ্ণও অনেকটা এই ধরনের 'ঐশ্বর্য' দম্ভ বারংবার প্রকাশ করেছে)। অথবা বরাহ ভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্যের নিজের মুখে যখন বসানো হয়:

বলিতে প্রভুর হৈল ঈশ্বর আবেশ।
দন্ত কডমডি করি বোলয়ে বিশেষ ॥
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে ॥
পঢ়ায়ে বেদান্ত মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তভু নাহি জানে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে ॥[৭]

এগুলির সঙ্গে বাংলা মঙ্গলকাব্যের 'সাম্প্রদায়িক' দেবদেবীর উক্তির পার্থক্য কোথায়?

কিম্বা— মুঞি মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে
যার ভেদ আছে তারে নাশ ভালমতে ॥[৮]

এই ধরনের দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। এর চেয়েও আশ্চর্যের কথা ষোড়শ শতকের শেষভাগে রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে জয়ানন্দ, নবদ্বীপে যবন অত্যাচার প্রসঙ্গে গৌড়রাজার স্বপ্ন বর্ণনায় শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণবদের পক্ষে শাক্তদেবী মহাকালীকে খাড়া করেছেন:

কালী খড়্গ খর্পরধারিণী দিগম্বরী।
মুণ্ডমালা গলে কাট্ কাট্ শব্দ করি ॥

আজি তোর গঙ্গায় পেলিমু রাজ্যপাট।
সবংশে কাটিমু তোর হস্তী ঘোড়া ঠাট॥

এখানে স্বপ্নপ্রদর্শন বা শাস্তিদানের হুমকি মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীরই উপযুক্ত। জয়ানন্দ লিখেছেন :

নাকে খত দিল রাজা তবে কালী ছাড়ে॥[৯]

নরহরি চক্রবর্তীর 'নরোত্তম বিলাস' কাব্যেও অনুরূপ ভাবে বৈষ্ণবধর্ম বিরোধী অধ্যাপকের শাস্তিপ্রদানে বাধ্য হয়ে 'ভগবতী' দ্বারা স্বপ্ন দেখিয়েছেন :

দেখয়ে স্বপন দেবী হাতে খড়্গ লৈয়া।
সম্মুখে কহয়ে মহা ক্রোধযুক্তা হৈয়া॥
বৃথা অধ্যয়ন কৈলি ওরে দুষ্টমতি।
বৈষ্ণব নিন্দিলি তোর হবে অধোগতি॥
তোর মুণ্ড কাটি যদি করি খান্ খান্।
তবে সে মনের দুঃখ হয় সমাধান॥
ওরে দুষ্ট অসুর কি দিব তোরে শিক্ষা।
নরোত্তম অনুগ্রহে হৈল তোর রক্ষা॥[১০]

নরোত্তম বিলাসে বর্ণিত 'ভগবতী'র ক্রোধের সঙ্গে 'প্রেমবিলাস' বর্ণিত চণ্ডিকার ক্রোধের মিল আছে। 'পাষণ্ডী'দের নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবীর প্রতি নিন্দাবাক্য শুনে চণ্ডিকা বললেন :

জাহ্নবী দেবীরে তোরা করিলি বিদ্রূপ।
সেই অপরাধে তোদের হবে মহাদুঃখ॥[১১]

সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত (১৬১৫) গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সবচেয়ে শ্রদ্ধার বস্তু। দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমৃদ্ধ এই মহাগ্রন্থেও পূর্বোক্ত লক্ষণগুলি বহুস্থলে সুস্পষ্ট। জনৈক বিপ্র কর্তৃক শ্রীবাস গৃহে ভবানীপূজার দ্রব্যাদি স্থাপন ও রক্তচন্দন লেপনের অপরাধে তিন দিন পরে সেই বিপ্র কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। চৈতন্যদেবের করুণা প্রার্থনা করলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন :

আরে পাপি ভক্তদ্বেষি তোরে উদ্ধারিমু।
কোটি জন্ম ঐছে তোরে কীড়ায় খাওয়াইমু॥
শ্রীবাসেরে করাইলি ভবানীপূজন।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন॥

পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ॥[১২]

এই ক্ষেত্রে মুরারি গুপ্তের বর্ণনাকে অবলম্বন করলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুরারি-প্রদত্ত বর্ণনাকে ছাড়িয়ে স্বকপোল কল্পনাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থান দিয়েছেন।

মঙ্গলকাব্যের ধরনে ভক্তদের কল্পনা কতদূর গিয়েছিল তার আরো একটি দৃষ্টান্ত পাই, নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে মুসলমান শাসনকর্তা শের খাঁর দর্পনাশ হেতু চৈতন্যদেবকে 'আল্লা' পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়েছে স্বপ্নে চৈতন্যদেব বলেছেন:

'আমি তোর আল্লা হই আহ্লাদ স্বরূপ'।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি থেকে স্বতঃই প্রতীয়মান হবে যে, চৈতন্যকাব্যগুলিতে চৈতন্যদেবের 'মানব'রূপ অপেক্ষা শক্তিমান 'ভগবান' রূপ অথবা 'অবতার'রূপ প্রতিষ্ঠা ভক্ত চরিতকারদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

দেখা গেল বৈষ্ণব জীবনী-কাব্যগুলিতে গীতা, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের উল্লেখ ও অনুসরণ থাকলেও মঙ্গলকাব্যের spirit এবং formও অলক্ষিত নয়। কাজেই চৈতন্যচরিত বা অন্যান্য বৈষ্ণব জীবনীগ্রন্থকে প্রামাণিক রূপে স্বীকার করা আধুনিক কালের পক্ষে কঠিন। কেন না অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনার বাহুল্য মধ্যযুগের এই পর্যায়ের কাব্যে স্বাভাবিক।

কিন্তু যে 'চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মহামান্য গ্রন্থ, সেখানে বাসুদেব সার্বভৌম ও চৈতন্যদেবের বিচারের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ কর কর্তব্য। কেননা ঐ বর্ণনা মূলতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিয়েছেন কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের (১৫৪২) দ্বাদশ সর্গ থেকে। অদ্বৈতবাদ খণ্ডন ও সার্বভৌমের পরাজয়ের কথা কর্ণপূর লিখেছেন। কিন্তু সেখানে উভয়পক্ষের যুক্তিতর্কের সমস্ত কথা জানা যায় না। তাছাড়া বাসুদেব সর্বভৌম প্রদত্ত যুক্তিগুলি এখানে চৈতন্যদেবের মুখে বসানো হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণিত অপর বিশিষ্ট অধ্যায়, মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে সাধ্য সাধনতত্ত্ব বা রায় রামানন্দ সংবাদ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঐ অংশ মূলসূত্ররূপে কবি কর্ণপূরের রচিত মহাকাব্য ও নাটক থেকে গ্রহণ করেছেন এবং রামানন্দের মুখ দিয়ে রূপ গোস্বামী কৃত হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বল-নীলমণির অবিকল বঙ্গানুবাদ বলিয়েছেন।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর রচিত হয়েছে এমন বহু দার্শনিক নিবন্ধ

পদ ও কাব্যের উৎকলিত অংশ চৈতন্যদেবের কার্যধারায় প্রযুক্ত হয়েছে, এমন কি স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের মুখেও বসানো হয়েছে।[১৩] কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের মুখে অর্বাচীন পুরাণ 'ব্রহ্মবৈবর্তের' শ্লোক উদ্ধার করে কাজীর পরাজয় ঘটিয়েছেন। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! এই প্রসঙ্গে বলা দরকার বাংলা ভাষায় চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যে বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনায় পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বৃন্দাবন-দাসের গুরু ছিলেন নিত্যানন্দ, তাঁরই নির্দেশে বৃন্দাবনদাস অগ্রসর হয়েছিলেন 'চৈতন্যচরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে'। বৃন্দাবনদাসের কাব্য পড়লে মনে হয় যে এই কাব্য রচনাকালে বাংলাদেশে বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দ-বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল। তা না হলে সমগ্র কাব্য জুড়ে চৈতন্যদেবের সঙ্গে এমন ভাবে নিত্যানন্দ বন্দনা করা হত না। নিত্যানন্দ-বিরোধী গোষ্ঠীর উদ্দেশে তিনি অবৈষ্ণবের মতো বলেন:

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥

তেমনি লোচনদাস ছিলেন শ্রীখণ্ডের 'গৌরনাগর' মতের প্রবক্তা নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। তিনি তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে গুরু নরহরিকে কৌশলে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। বৃন্দাবনদাস চেষ্টা করেছেন নিত্যানন্দ মহিমা প্রতিষ্ঠার। লোচনদাস অগ্রসর হন নরহরি-মাহাত্ম্য স্থাপনে— 'নরহরি-চৈতন্য বলিয়া প্রভুর খ্যাতি।' কাজেই দুজনেই চৈতন্য-চরিত রচনার মাধ্যমে নিজ নিজ গুরুর মহিমা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছেন। অর্থাৎ চৈতন্যচরিত কাব্য রচনাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না।

অনুরূপভাবে জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে তার গুরু গদাধরের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী। তিনি 'গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞির আজ্ঞা শিরে ধরি' চৈতন্যমঙ্গল রচনায় অগ্রসর হন। তাই লেখেন:

চিন্তিয়া চৈতন্য-গদাধর পদ দ্বন্দ্ব
আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ॥

অবশ্য গদাধর সম্পর্কে চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব সমাজে এই তত্ত্ব প্রচলিত ছিল যে, গদাধর শ্রীরাধার অবতার।[১৪] জয়ানন্দ তাই চৈতন্যদেবের মুখে বলিয়েছেন:

আমি গৃহস্থ গদাধর সে গৃহিণী।
আমি উদাসীন গদাধর উদাসিনী॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'রূপ-রঘুনাথ' গোস্বামীদ্বয়ের পদবন্দনা ভণিতায় করেছেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বৃন্দাবন-কেন্দ্রের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ হতজ্যোতি, নানা উপদলে খণ্ডিত। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দৃষ্টিভঙ্গি বৃন্দাবন, লোচন, জয়ানন্দ সকলের থেকেই পৃথক। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীদের কাছে শিক্ষিত ও দীক্ষিত, তিনি তাঁদেরই ব্যাখ্যাত দার্শনিক মত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে রূপায়িত করেছেন। বৃন্দাবনদাসকে তিনি 'চৈতন্য-লীলার ব্যাস' বললেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষণীয়।

বৃন্দাবনদাস তাঁর কাব্যে চৈতন্যাবতারের কারণ স্বরূপ গীতার 'সম্ভবামি যুগে যুগে' তত্ত্বকে মুখ্যস্থান দিয়েছেন এবং হরিসংকীর্তনকে কলিযুগের ধর্মরূপে আখ্যাত করেছেন। তিনি মুখ্যতঃ ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে চৈতন্যলীলা রচনার প্রয়াস পেয়েছেন কাব্যের আদিখণ্ডে। নরহরি প্রচাবিত ও লোচনদাস গৃহীত 'গৌরনাগর তত্ত্বের' বিরোধী ছিলেন বৃন্দাবনদাস।

লোচনদাস রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে গৌরনাগর তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে। তিনি বহুক্ষেত্রে মুরারি গুপ্তের কাব্যের অনুবাদ ও অনুসরণ করেছেন সত্য কিন্তু গুরু নরহরি ব্যাখ্যাত তত্ত্বকে স্থান দিয়েছেন। তাই বৃন্দাবন, যমুনা, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজগোপীর সমান্তরাল করে তিনি নবদ্বীপ, ভাগীরথী, গৌরাঙ্গ ও নদীয়া নাগরীদের এঁকেছেন। গৌরাঙ্গের বিবাহকালে নদীয়া-নাগরীদের কামমোহিত বর্ণনা গৌরনাগর তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

জয়ানন্দও পুরাণের ঢঙে বসুমতীসহ দেবগণের ক্ষীরোদ সাগরে গমন, দেবগণের বিভিন্ন নামে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন, কাব্যের শেষের দিকে পুরাণের মতই কলিযুগবর্ণন ও বহু পৌরাণিক আখ্যান (ধ্রুবচরিত্র, অজামিল উপাখ্যান) সন্নিবেশ করেছেন। আবার মঙ্গলকাব্যের মত দেবদেবী বন্দনা, স্বপ্নাধ্যায়, নারীগণের পতিনিন্দা, লক্ষ্মীর রন্ধন, নৌকাযাত্রা বর্ণনা, বারমাস্যা, সবই জয়ানন্দ ব্যবহার করেছেন। জয়ানন্দ বিশেষ কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাব্য রচনা করেন নি। চৈতন্যদেবকে তিনি ভগবান বা ঐশ্বর্যসম্পন্ন অবতার-রূপেই বর্ণনা করলেও তিনি চৈতন্যদেবের 'বাস্তব' মৃত্যু বর্ণনা করেছেন।[১৫] আসলে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান ঘটে ব্যাধনিক্ষিপ্ত শর বাম পদে লেগে। জয়ানন্দ তার প্রতিরূপ দেখতে চেয়েছেন মাত্র।

কিন্তু জয়ানন্দ তাঁর কাব্যে চৈতন্যদেবের জীবনের যে পরিচয় দিয়েছেন

তার তথ্যগত প্রামাণিকতা কম। মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস যে সব তথ্য দিয়েছেন সেগুলির সঙ্গে জয়ানন্দ প্রদত্ত তথ্যের গুরুতর গরমিল বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে। তথ্যগত ত্রুটির জন্য জয়ানন্দের কাব্য সমাদৃত হয় না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে একখানি চরিতকাব্য রচনার উদ্দেশ্য অপেক্ষা বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ কর্তৃক প্রচারিত ও ব্যাখ্যাত চৈতন্যদেবের নব অবতারতত্ত্ব, অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব, সাধ্য-সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি সিদ্ধান্তকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রচলনের আকাঙ্ক্ষাই যেন প্রধান ছিল।

চৈতন্যদেবের নব-অবতারত্ব নবদ্বীপের বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেননি। মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস, লোচন, জয়ানন্দ স্বরূপ-দামোদরের নামে প্রচলিত "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো" ইত্যাদি তত্ত্বকে ঠিক স্বীকার করেননি। 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়নাটক' চৈতন্যদেবের দেহত্যাগের বহুবর্ষ পরে ১৫৭ সালে পুরীধামে রচিত হয়। কিন্তু কবিকর্ণপূর স্পষ্টই লিখেছেন যে অদ্বৈতের আহ্বান, নাম-সংকীর্তন প্রচার প্রভৃতির জন্যই চৈতন্যাবির্ভাব। অন্যদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যুগধর্ম, নামপ্রেম প্রভৃতিকে 'বহিরঙ্গ' এবং শ্রীরাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি ধারণ করে প্রেমাস্বাদনকেই 'অন্তরঙ্গ' কার্য বলে নির্দেশ করেছেন। কৃষ্ণদাসের দৃষ্টিভঙ্গি নিজস্ব কিছু নয়, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ব্যাখ্যাত তত্ত্ব ও দার্শনিক সিদ্ধান্তকে তিনি 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনায় প্রয়োগ করেছেন। চৈতন্যদেবের জীবনের অন্ত্যলীলা রচনায় তাঁর মুখ্য কাম ছিল। তাঁর সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলা চলে। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের গোপীভাবে কৃষ্ণান্বেষণ, প্রলাপ-উক্তি প্রভৃতির যে ইঙ্গিত রেখে গিয়েছিলেন, কৃষ্ণদাস তার সম্পূর্ণ-সুন্দর বর্ণনা করেছেন।

খুঁটিয়ে বিচার করে দেখলে চৈতন্যচরিতামৃতে তথ্যগত অসামঞ্জস্য বহু মিলবে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ পূর্বপ্রচলিত তথ্যকে নির্বিচারে গ্রহণ করলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু তিনি নিজের কল্পিত অনেক ঘটনা বসিয়েছেন এবং পূর্ব প্রচলিত তথ্যকে নিজের বিশ্বাসবহ দৃষ্টির অনুকূল করে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। চৈতন্যদেব-সার্বভৌমসংবাদ তার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, চৈতন্যদেব সার্বভৌমকে বললেন :

"জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাঙ আমি।
উদ্দেশ্য আমার মূল এথা আছ তুমি॥

তোমাতে যে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
তুমি যে দিবারে পার কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি ॥[১৭]

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে পাই সার্বভৌম চৈতন্যদেবের কাছে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা বা বিচার কোনোটিই করেননি। তিনি শুধু 'আত্মারামাশ্চ মুনয়োঃ' শ্লোকটির ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করেন। তারপরও চৈতন্যদেব নতুন-ব্যাখ্যা দিতে চান ঃ

শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্মভাবে হইলা ষড়ভুজ অবতার ॥[১৮]

উদ্ধৃত অংশের অলৌকিকতা বর্জন করা গেলে জানা যায় সার্বভৌমের "আত্মারামাশ্চ" ব্যাখ্যার পর চৈতন্যদেব নিজস্ব মতানুযায়ী স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, এই মাত্র। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেব কর্তৃক সার্বভৌম-অনুগ্রহ বর্ণনা করেছেন। তবে ঐশ্বর্য দেখিয়ে সার্বভৌমকে বশ করার কথা সেখানে নেই। অবশ্য ঐ অংশে সার্বভৌম চৈতন্য-স্তব পাঠ করেছেন দেখতে পাই।

কবিকর্ণপূর তাঁর মহাকাব্যের দ্বাদশ সর্গে ও নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে চৈতন্যদেব ও সার্বভৌমের বিচার ও সার্বভৌমের পরাজয় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের বিস্তৃত কোনো বিবরণ নেই। কবিকর্ণপূর "আত্মারামাশ্চ মুনয়োঃ" শ্লোক ব্যাখ্যার উল্লেখ করেননি। পরন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে মধ্যলীলায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের মুখে বেদান্ত-বিচার প্রসঙ্গে যে যুক্তিগুলি বসিয়েছেন সেগুলি কবিকর্ণপূরের নাটকে প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমের নিজেরই উক্তি। কেননা নাটকে দেখি সার্বভৌম নিজেই শেষে চৈতন্যদেবের কাছে এসে তাঁর পূর্বপোষিত অদ্বৈতবাদ মতের খণ্ডন করেছেন। এ ধরণের বহু তথ্য উপস্থাপিত করা যেতে পারে। কাজেই বলা যায় 'চৈতন্যচরিতামৃত' দার্শনিক তত্ত্বে "অমৃতের পুর" হতে পারে কিন্তু উৎকৃষ্ট চরিতকাব্য হয়নি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্যগত প্রামাণিকতার অভাবে।

চৈতন্যচরিতগুলি ছাড়া অন্যান্য যে বৈষ্ণবজীবনী গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলিতে তথ্যগত প্রামাণিকতার অভাব আরো বেশি। উল্লেখযোগ্য কাব্য হিসাবে ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ' বা নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তম বিলাস' অথবা নিত্যানন্দদাসের 'প্রেমবিলাস' আলোচনা করলেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে। ঈশান নাগরের গ্রন্থে প্রদত্ত রচনাকাল (১৪৯০ শক)

থেকে শুরু করে অধিকাংশ বর্ণিত তথ্যেরই ঐতিহাসিক প্রামাণ্য নেই। যেমন ভাবে বৃন্দাবনদাস তাঁর দীক্ষাগুরু নিত্যানন্দকে এবং লোচনদাস তাঁর দীক্ষাগুরু নরহরি সরকার ঠাকুরকে শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় আত্মারূপে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন, অনুরূপ চেষ্টা দেখি 'অদ্বৈতপ্রকাশ' কাব্যে। শিবের তপে মহাবিষ্ণুর আগমন এবং ঘোষণা 'তোর মোর এক আত্মা', তার ফলে 'দুই দেহ এক হৈল'—এই বর্ণনায় অদ্বৈতাচার্যকে শিব-বিষ্ণুর যুগ্মরূপ দেখানো হয়েছে। সেজন্য চৈতন্য-চরিতামৃতের অনুকরণে বিবৃত হয়েছে, যে শান্তিপুরের কুলীন ব্রাহ্মণগণের দর্পনাশের জন্য অদ্বৈত :

দয়া করি প্রভু তবে দেখায় স্বরূপ
মহাবিষ্ণু সদাশিব দুই এক রূপ ॥
রূপ দেখি দ্বিজগণের হৈল ভাবোদ্‌গম।
অশ্রুকম্প পুলক ধরে কদম্বের সম ॥

অদ্বৈতের জীবনী-রচনা ঈশানের কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কেননা শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস বর্ণনার পর থেকে চৈতন্যদেবের জীবনের ঘটনাই প্রধানতঃ বর্ণিত হয়েছে। অসংখ্য তথ্যগত প্রমাদের জন্য জীবনীকাব্য হিসাবে 'অদ্বৈত-প্রকাশ' একেবারেই ব্যর্থ।

নরহরির 'ভক্তিরত্নাকর' বহু 'তরঙ্গ' সমৃদ্ধ বৃহৎ গ্রন্থ, কিন্তু একে সর্বার্থসাধক বৈষ্ণবকোষ-গ্রন্থ বললেই ঠিক হয়। 'শ্রীনিবাস আচার্য চরণ চিন্তা করি' তিনি 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে চৈতন্য-চরিত্র বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-নরহরি, শ্রীনিবাস-নরোত্তম-বীরহাম্বীর প্রভৃতির বর্ণনায় কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। তবে ছন্দ ও সংগীত সম্পর্কে বহু তথ্য আছে। নরহরি চক্রবর্তীর নিজস্ব বহু পদ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। জীবনীকাব্য এ নয়, তবে বৈষ্ণব-ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান গ্রন্থ। কিন্তু পরবর্তী রচনা 'নরোত্তম-বিলাস' মোটামুটি নরোত্তমের চরিতকাব্য, প্রচুর অলৌকিক ঘটনার স্থাপনা সত্ত্বেও। এর একটি উল্লেখযোগ্য দিক বৃন্দাবনের লোকনাথ গোস্বামীর বিবরণ। লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তমের দীক্ষাগুরু ছিলেন। খেতুরীর মহোৎসব (১৫৮১-৮২), ষড়বিগ্রহ স্থাপন, রস-কীর্তনের সৃষ্টি প্রভৃতির বর্ণনা প্রামাণিক বলে গ্রাহ্য হতে পারে।

নিত্যানন্দের কনিষ্ঠাপত্নী জাহ্নবীদেবীর শিষ্য নিত্যানন্দদাস রচিত 'প্রেমবিলাস' সপ্তদশ শতকের কাব্য। গ্রন্থখানি প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব-

জীবনীসংগ্রহ। এর সামাজিক মূল্য যথেষ্ট। লেখক জানিয়েছেন এ সময় রাঢ়-বঙ্গে অনেকেই নিজের নিজের ঈশ্বরত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত, শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ, বৃন্দাবনের গোস্বামীবৃন্দ ও গৌড়ীয় মহান্তদের জীবনের বহু বৃত্তান্ত এ-কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাদের সত্যতা সর্বথা স্বীকার্য নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বীর হাম্বীরের সৈন্যদল কর্তৃক শাস্ত্র-গ্রন্থাদি ও চৈতন্য-চরিতামৃত লুণ্ঠনবার্তা শুনে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মৃত্যুর তথ্যটি বিচারের অপেক্ষা রাখে। অসংখ্য অতি-প্রাকৃত, অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাহার ঘটলেও 'প্রেমবিলাস' বৈষ্ণব-গুরুদের জীবনীর উপাদান-গ্রন্থরূপে গৃহীত হতে পারে।

বহু জীবনীকাব্য রচনা করেছিলেন বৈষ্ণবেরা। পূর্বেই বলা হয়েছে এই কাব্যগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি ধর্মগুরুদেব ঈশ্বরত্ব বা অবতারত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদন আর তারই সঙ্গে শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ বা অন্যান্য গোস্বামীবৃন্দের কল্পিত বা আরোপিত স্বরূপ নির্ধারণ। তাই নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র প্রভু শ্রীনিবাস আচার্যকে বলেন :

> আমি নিত্যানন্দের শক্তি তুমি চৈতন্যের।
> তুমি আমি এক বস্তু অগম্য অন্যের ॥[১৯]

এই ঈশ্বরত্ব বা অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে তাঁরা অবিচল ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যমত শাসিত হিন্দুসমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবে নূতন ধর্মগোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের মহিমা ও ঈশ্বরত্ব আরোপ অনিবার্য। যেহেতু সে-যুগে 'শাস্ত্র-প্রামাণ্য' ভিন্ন অন্য কিছু স্বীকৃত হয় না সেজন্য বিভিন্ন শাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি-গ্রন্থ থেকে উক্ত উদ্দেশ্যের অনুকূল শ্লোকগুলিকে নিপুণভাবে চয়ন করবার চেষ্টা চলেছে। শুধু 'শাস্ত্র-প্রামাণ্য' দ্বারা ঈশ্বরত্ব বা অবতারত্ব বুঝি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন করে না দেখাতে পারলে কারো চরিত্রই ভয়, বিস্ময় বা শ্রদ্ধা উদ্রেকক্ষম হয় না। কাজেই পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী চরিত্রের মতো বৈষ্ণবচরিত কাব্যে বর্ণিত ধর্মগুরুদের কখনো বা অসীম অলৌকিক শক্তি বর্ণিত হয়েছে। সেদিন বৈষ্ণব সমাজের সাধক ও ধর্মসংস্কারক গোষ্ঠীর নেতাদের অতি-মানব-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তবু অলৌকিক, অবিশ্বাস্য ঘটনাস্থাপন এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপ্রকৃত তথ্যবর্ণন বা হাস্যকর যুক্তিজাল প্রদর্শন সত্ত্বেও এগুলির মূল্য অস্বীকৃত হয় না।[২০] চৈতন্যদেব এবং অন্যান্য বৈষ্ণব-ধর্মগুরু ও

সাধকদের জীবনের মোটামুটি পরিচয় এগুলি থেকে লাভ করা অসম্ভব হয় না এবং বৈষ্ণবসমাজের ইতিহাসও অপরিজ্ঞাত থাকে না। এই সূত্রে মধ্যযুগীয় 'Saint'দের চরিতগ্রন্থগুলি সম্পর্কে সমালোচক ক্রশের মন্তব্য স্মরণীয়

> Though the lives of the Saints are fitted with miracles and incredible stories, they form a rich mine of information concerning the life and customs of the people Some of them are memorials of the best men of the times

একথা অবশ্যস্বীকার্য, যে প্রদীপ্ত, মানব-পন্থী (Humanistic) দৃষ্টি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রণয়ন করেছিলেন সে-দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগের ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে আশা করা দুরাশামাত্র। তাঁদের পক্ষে ফরাসী পজিটিভিষ্ট কোঁৎ (Comte) ও তাঁর অনুগামী জন স্টুয়ার্ট মিলের শিষ্য[২১] বঙ্কিমচন্দ্রের মতো 'লোকাচার ও দেশাচারের' ঊর্ধ্বে উঠে বলা কি সম্ভব ছিল:

> "বুদ্ধিমান পাঠককে ইহা বলা বাহুল্য যে, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়ীভূত পশুগণের ঈশ্বরাবতারত্বের যথার্থ দাবি দাওয়া কিছুই নাই। গ্রন্থান্তরে দেখাইব যে, বিষ্ণুর দশ অবতারের কথাটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং সম্পূর্ণরূপে উপন্যাসমূলক। সত্য বটে, এই সকল অবতার পুরাণে কীর্তিত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক উপন্যাস স্থান পাইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় না।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিচারের নিয়ম সম্পর্কে তিনটি সূত্র উল্লেখ করেছেন,

> "১। যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিব তাহা পরিত্যাগ করিব।
>
> ২। যাহা অতিপ্রকৃত তাহা পরিত্যাগ করিব।
>
> ৩। যাহা প্রক্ষিপ্ত নয় বা অতিপ্রকৃত নয়, তাহা যদি অন্যপ্রকারে মিথ্যার লক্ষণযুক্ত দেখি, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব।"[২২]

বাংলাদেশের ঊনবিংশ শতকের রেণেসাঁস-যুগের 'শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ' বঙ্কিমচন্দ্র পজিটিভিজম্ প্রভাবিত যুক্তিধর্মী মনের যে-পরিচয় দিয়েছেন তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র'

গ্রন্থ রচনায়, সেই দৃষ্টিভঙ্গি কী করে আশা করব মধ্যযুগের বাংলাদেশে ভক্তিনির্ভর 'চৈতন্য-চরিত্র' কাব্যসৃষ্টিতে ?

পাদটীকা

১। চিঠিপত্র (১২৯৪) রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (বিশ্বভারতী সং)। আবও লিখেছেন: "তেমনি যাহাদের বড় প্রাণ তাহারা বেশিদিন নিজের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেনা, জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। চৈতন্যদেব ইহার প্রমাণ"।—তদেব।

২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত। ৪র্থ প্রক্রম, ২৪শ সর্গ, ১-১১।

৩। তদেব। ১ম প্রক্রম, ২য় সর্গ, ১৩-১৫।

৪। 'Hagio' শব্দের অর্থ Saint, ধর্মের জন্য যিনি প্রাণত্যাগ করেছেন। কাজেই Hagio-graphy বলতে আমরা 'সন্ত্‌চরিত' বুঝতে পারি। এগুলির মুখ্য বৈশিষ্ট্য 'writings inspired by devotion and intended to promote it.'

৫। 'Every martyr as a rule is animated by the same sentiments, expresses the same opinions and is subject to the same trials' (Legends of the Saints. An Introduction to Hagio-graphy. Pere H Dele-haya S. J. Bollandist. Translated by Mrs. V. M. Crawford, 1907)

৬। চৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২য় অধ্যায়।

৭। তদেব। মধ্য, ২০শ অধ্যায়।

৮। তদেব। মধ্য, ২১শ অধ্যায়।

৯। চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দ, আদিখণ্ড। জয়ানন্দ শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক পাষাণী অহল্যা-উদ্ধারের অনুকরণে শ্রীচৈতন্য কর্তৃক পাষাণী-তিলোত্তমা-উদ্ধার বর্ণনা করেছেন।

১০। নরোত্তম-বিলাস, ১০ম বিলাস।

১১। প্রেমবিলাস, ১৯শ বিলাস।

১২। চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১৭শ অধ্যায়। দ্রঃ মুরারি গুপ্ত ২য় প্রক্রম ১৩।১১

১৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, বিদগ্ধমাধব

প্রভৃতি গ্রন্থগুলি চৈতন্যদেবেব তিবোধানেব পব বচিত। এমনকি কৃষ্ণদাস কবিবাজ স্ববচিত 'গোবিন্দলীলামৃত' কাব্যেব শ্লোকও চৈতন্যদেবেব উক্তি বলে চালিযেছেন।

১৪। শিবানন্দ সেনেব পদ, গদাধব গৌবাঙ্গ গৌরাঙ্গেব গদাধব।
শ্রীবামজানকী যেন এক কলেবব॥
যেন এক প্রাণ বাধা বৃন্দাবনচন্দ্র।
যেন গৌর গদাধব প্রেমেব তবঙ্গ॥

১৫। আষাঢ বঞ্চিত বথ বিজযা নাচিতে।
ইঁদাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥
*   *   *
চবণ বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শবণ অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশদণ্ড বাত্রে চলিব সর্বথা॥

১৬ 'শ্রীবাধাযাঃ প্রণযমহিমা কীদৃশো' শ্লোকটি যে স্বরূপদামোদবেবই বচনা, এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

১৭। চৈতন্যচবিতামৃত, অন্ত্যলীলা, তৃতীয অধ্যায।

১৮। প্রেমবিলাস—১৭। বৃন্দাবনলীলায শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ, বামচন্দ্র কবিবাজেব নাম ছিল যথাক্রমে মণিমঞ্জবী, কনকমঞ্জবী ও করুণামঞ্জবী।

২০। বেনা তাঁব যুগান্তকাবী গ্রন্থ 'Life of Jesus' (১৮৬৩) গ্রন্থে লিখেছেন
(ক) 'No one doubts the principal features of the life of Francis d' Assisi although we meet the super-natural at every step' (Introduction).
(খ) Cross, C. The Sources of Literature of English History. P. 34

২১ জন স্টুয়ার্ট মিল, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, ১২৮০। দ্রঃ মিলেব বচিত 'Auguste Comte and Positivism' (1865)

২২ কৃষ্ণচবিত্র, প্রথমখণ্ড, ১৩শ পবিচ্ছেদ (১৮৮৬)।

॥ চরিত সাহিত্যে নব-সম্ভাবনা ॥

'ব্যক্তি'র (Individual) আবির্ভাব

বাংলাদেশের মধ্যযুগে লেখা বৈষ্ণবভক্তদের 'চৈতন্যচরিত' আর আধুনিক যুগে অর্থাৎ উনবিংশ শতকে লেখা বংকিমের 'কৃষ্ণচরিত্র'—এই দুয়ের মধ্যকার আসল পার্থক্য হল দুই যুগের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য। মধ্যযুগে মানুষকে আচ্ছন্ন করে অলৌকিক দৈবীমহিমা প্রধান হয়ে উঠেছিল, তার পিছনে ছিল প্রশ্ন-লুপ্ত ভক্তি। আর উনবিংশ শতকে অলৌকিকতাকে সরিয়ে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে মানবরূপ আবিষ্কারই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য, তার বাহন ছিল সপ্রশ্ন যুক্তি। রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্পর্কে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন

> "যখন আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্ধভাবে শাস্ত্রের জয় ঘোষণা করিতেছিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বীরদর্প সহকারে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রকে ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা তন্নতন্নরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং চিরপ্রচলিত বিশ্বাসগুলিকেও বিচারের অধীনে আনয়নপূর্বক অপমানিত বুদ্ধিবৃত্তিকে পুনশ্চ তাহার গৌরবের সিংহাসনে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন।'

এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের উনবিংশ শতকে এসেছে, অষ্টাদশ শতকে আসেনি। উনবিংশ শতককে আমরা বাংলাদেশের রেণেসাঁস বা নব জাগরণের যুগ বলি, মানব-স্বীকৃতির যুগ বলি।[১] পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে এই শতকে বাঙালীর মনে ও দৃষ্টিভক্তিতে যুক্তিবাদ, বিশ্লেষণী দৃষ্টি মানব-স্বীকৃতি ও বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের অধিকার-দাবি দেখা দিয়েছে। পাশ্চাত্য রেণেসাঁসের বড়ো কথা 'the proper study of mankind is man' উনবিংশ শতকের বাংলাদেশে সত্য হয়েছে। এ দৃষ্টি অষ্টাদশ শতকে এদেশে সম্ভব ছিল না।

অবশ্য অষ্টাদশ শতকেই বাংলাদেশের ইতিহাস বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে (১৭১৫-২৭) তাঁর কঠোর শাসনে সুবা বাংলার রাজস্ব ও শাসন ব্যবস্থা শিথিল হতে পারেনি।[২] তাই ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) কুড়ি বছর পরেও বাংলার শাসন-ব্যবস্থা দৃঢ়ই ছিল। তবু মনে রাখতে হবে

মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর ত্রিশ বছর পরে পলাশীর পরাজয় (১৭৫৭) ঘটল। এ পরাজয় বাংলাদেশকে নতুন পথে নিয়ে গেল। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মতে 'on 23rd June 1757, the middle ages of India ended and her modern age began', বাংলাদেশ মধ্যযুগীয়তা থেকে আধুনিকতায় পদার্পণ করল।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব থেকেই দেখতে পাই ভাগীরথী তীরভূমি অঞ্চলে বিশেষতঃ মুর্শিদাবাদ, চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী, শ্রীরামপুর, কলিকাতা, প্রভৃতি স্থানগুলি বিদেশী বণিকদের ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তখনো কিন্তু আমাদের দেশীয় পণ্য, দেশীয় বণিক, দেশীয় মুদ্রা সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে তার ভিত্তিতে ফাটল ধরাচ্ছে বিদেশী পণ্য, পাশ্চাত্য বণিক ও ভিন্নদেশীয় মুদ্রা। আর্মানী, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ, প্রাশিয়ান পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বণিক গোষ্ঠী বাংলাদেশে বাণিজ্য চালিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলার রাজদণ্ড লাভ করেছে চতুর ইংরেজ। ফরাসীরা চন্দননগরে এবং ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায়, ইংরেজরা হুগলীতে ও কলিকাতায়, সপ্তদশ শতকের শেষভাগেই খুঁটি পুঁতে বসেছিল। সারা বাংলাদেশ জুড়েই তাদের কুঠি, কারখানা স্থাপনের চেষ্টা চলেছিল। সম্পদশালী এই দেশ থেকে রপ্তানী-বাণিজ্য দ্বারা পাশ্চাত্য বণিকগোষ্ঠী অকল্পনীয় অর্থলাভ করেছিল।[৩] এইসব বণিকগোষ্ঠীর রাজকর্ম চালাবার জন্য প্রয়োজন হত নিজস্ব দেশীয় 'গোমস্তা' ও 'দেওয়ান'দের।

চন্দননগরে ফরাসী বণিকগোষ্ঠীর 'দেওয়ান' ছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে। তাঁর কাছে নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নাকি 'দুই চারি লক্ষ টাকা কর্জ করিবার নিমিত্ত' যেতেন। চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদের 'দেওয়ান' রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় একই সময়ের লোক।[৭] তিনিও খুব অর্থশালী ছিলেন। প্রাশিয়ান কোম্পানীর 'বেনিয়ান' হিসেবে দুর্গাচরণ মিত্র পলাশীযুদ্ধের পূর্বেই (১৭৫৫-৫৬) আর্থিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এই দুর্গাচরণ মিত্রই হলেন পরে 'নববঙ্গকুলপতি'। ইন্দ্রনারায়ণ, রামেশ্বর বা দুর্গাচরণ মিত্র সকলেই হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণ সম্ভূত। কিন্তু সকলেই নিজেদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় পাশ্চাত্য বণিকদের সঙ্গে অর্থ নৈতিক যোগাযোগের ফলে বড়োলোক হয়েছেন। বাংলাদেশে নতুন পর্যায়ের 'ধনী' ও 'মধ্যবিত্ত' সমাজের সূচনা এই সময়ে এই ভাবেই হয়।

পলাশী-যুদ্ধের পূর্বে শেঠ ও বসাকেরাই বাঙালীদের মধ্যে ব্যবসা-ক্ষেত্রে মুখ্যস্থান অধিকার করেছিল। পলাশী যুদ্ধের পর কোম্পানীর,

তার কর্মচারী, গভর্ণর বা 'স্বতন্ত্র' ইংরেজ ব্যবসায়ীর ('Free merchant') 'বেনিয়ান' বা 'দেওয়ান' হিসাবে দয়ারাম দত্ত, কেবলরাম ঘোষ, রামপ্রসাদ মিত্র ছাড়াও গোকুল ঘোষাল, বারাণসী ঘোষ, হৃদয়রাম ব্যানার্জী, অক্রুর দত্ত, মনোহর মুখার্জি, মদন দত্ত, দর্পনারায়ণ ঠাকুর প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫] শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ ক্লাইভের মুন্শী, কান্দী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রধান মুৎসুদ্দী এবং কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দী হেস্টিংসের 'বেনিয়ান' রূপে সরকারী কাগজপত্রে আখ্যাত হয়েছেন। রাণীভবানীর জমিদারীর অংশ কেড়ে নিয়ে কোম্পানী 'কান্তবাবু'কে জমিদার করে দিলেন। নবকৃষ্ণ ও গঙ্গাগোবিন্দের ইতিহাস একই। দুরাত্মা কোম্পানী যদি দেশের 'রাজা', তাহলে কোম্পানীর কর্মচারীরা বিশেষতঃ যারা নিষ্ঠুরভাবে ও অন্যায় ছলে কোম্পানীকে বহু অর্থ আয় করিয়ে দিয়েছে তারা কেন 'জমিদার' হবে না? ১৭৮১ থেকে ওয়ারেন হেস্টিংসের চক্রান্তে বঙ্গের তিনটি বিশিষ্ট পুরাতন জমিদার বংশ ধ্বংস হয়েছিল—বর্ধমানরাজ, দিনাজপুররাজ ও রাজশাহী-নাটোরের রাণীভবানীর মূল্যবান সম্পত্তি। তাদের স্থলে কোম্পানী-সহযোগী দেওয়ান-বেনিয়ান-মুছুদ্দীরা 'জমিদার' রূপে দেখা দিল। এই রূপান্তর সম্পর্কে 'হুতোম' তাঁর নকশায় চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন :

> "পাঠক! নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠ্‌লো। বড় বড় বাঁশ ঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুনসি, ছিরে বেনে ও পুঁটে তেলি রাজা হলো।[৬] সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও 'রাজা' খেতাব, ইণ্ডিয়া রবারের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনির মত, রাস্তায় পাঁদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।"

খিদিরপুরের [ভূকৈলাসের প্রতিষ্ঠাতা] গোকুল ঘোষাল গভর্ণর ভেরলেষ্টের দেওয়ান ছিলেন। মহারাজা সুখময় রায়ের মাতামহ জোড়াসাঁকো রাজবাটীর প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত ধর (নকু ধর) ক্লাইভ ও অন্যান্য গভর্ণরদের বেনিয়ান ছিলেন। তিনি নাকি প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় (১৭৭৫) ইংরেজদের নয় লক্ষ টাকা সাহায্য করেছিলেন।[৭] আন্দুলের 'রাজা' রাজনারায়ণ রায় প্রথমে ছিলেন ভ্যান্সিটার্টের দেওয়ান। কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষ

জোড়াসাঁকোর শান্তিরাম সিংহ পাটনার চীফ মিডলটন ও স্যর টমাস রামবোল্‌ডের দেওয়ান হিসাবে কাজ করতেন। এই রামবোল্‌ড ১৭৬৯ সালে অন্যান্যদের সঙ্গে অংশীদার রূপে গ্রহণ করেছিলেন ভেরলেষ্ট, গোকুল ঘোষাল ও মদন দত্তকে প্রাচ্য-অঞ্চলে বিশেষত চীনে, আফিম চালানী কারবারে। গোকুল ঘোষাল ও মদন দত্ত মিলে নিজেরাও আফিমের রপ্তানী-কারবার চালাতেন।[৪] এই মদন দত্তের অন্নে বাল্য-কৈশোরে প্রতিপালিত হয়েছিলেন পরবর্তীকালের ধনকুবের রামদুলাল দে।

হৃদয়রাম ব্যানার্জী [হিদারাম ব্যানার্জি] কলিকাতার শেরিফের বেনিয়ান ছিলেন, ইংরেজদের ব্যবসার অংশীদাররূপে (১৭৬০-৭০) নিজেও প্রভূত ধনোপার্জন করেছিলেন। রামলোচন ঘোষ হেস্‌টিংসের 'সরকার' ছিলেন, গোকুলমিত্র বড়োলোক হয়েছিলেন কোম্পানীর রসদের ঠিকাদারি করে। অক্রূর দত্ত ছিলেন কোম্পানীর Second Brigade-এর পে-মাস্টার রবার্ট বুর্গের 'হেড বেনিয়ান'। বেনিয়ানরা কোম্পানীর কর্মচারীদের, গভর্ণর থেকে সামান্য কর্মচারীকে পর্যন্ত প্রচুর টাকা ধার দিত। কর্মচারীরা বহুক্ষেত্রে ঐ সব বেনিয়ানদের 'বেনামে' কাজ-কারবার চালাত। রামমোহন রায় কোম্পানীর দেওয়ান হয়েছিলেন অল্পকালের জন্য। তিনি বেনিয়ানের কাজও করেছিলেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে প্রাচীন ভূস্বামীরা বেশির ভাগ বিধ্বস্ত হলেন। দেশের শিল্পী ও কারিগর শ্রেণী, যাদের তৈরী জিনিস দেখে য়ুরোপের নবনারী লুব্ধ হত, তাদেরও সর্বনাশ সাধন করা হল। ১৭৬৫ থেকে কোম্পানীর কর্তৃত্ব অর্থাৎ 'দেওয়ানী' লাভ থেকে এই সর্বনাশ পাকা হল। ক্রমে কোম্পানীর কুঠি ছাড়া অন্যত্র কাজ করা অসাধ্য হল তাদের পক্ষে। বহু শিল্পীর জীবিকা বন্ধ হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এদেশীয় পুরোনো ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক বনিয়াদ ধ্বসে গেল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'একচেটিয়া' কারবারের চাপে। নবাব মীরকাশিম দেশীয় বণিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্তর্দেশীয় 'শুল্ক'-প্রথা তুলে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৭৬৪ সালে বক্‌সারের যুদ্ধে তাঁর পতনের পর ইংরেজ বণিকদের কে আর ঠেকাবে? ১৭৬৫ সালে ক্লাইভের এদেশে আগমন ও দেওয়ানী গ্রহণের পর "he executed an indenture jointly with other servants of the company to carry on the trade regardless of the orders of the company"[৮] বিলেতের ডাইরেকটরদের নিষেধবাক্য এদেশের অর্থলোলুপ ইংরেজ কর্মচারীরা অগ্রাহ্য করেছিল।

এমন সময় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (১৭৬৯-৭০) দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক মারা গেল। কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও রাজস্ব আদায় করা হয়েছিল অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি।

১৭৭৩ সালে নর্থের 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' পাশ হয়। তার ফলে কোম্পানীর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণে পার্লামেণ্টকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। কিন্তু ১৭৭৩ সাল থেকেই জমির বার্ষিক নীলাম ডাকের মধ্য দিয়ে কোম্পানী প্রতিবছর অজস্র টাকা আয় করতে থাকে। এই নীলাম-ডাক দেশের জনসাধারণের ভীষণ ক্ষতি-সাধন করেছিল। কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) পক্ষে প্রদত্ত যুক্তিতে তার প্রমাণ রয়েছে। তবে ইতিহাসের অন্য দিকের কথাটা ভাবতে হবে। কর্ণওয়ালিশের সময় একদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও পরে 'সূর্যাস্ত আইন' প্রবর্তিত হলে তারই ফলে জমিতে টাকা ফেলা শুরু হল, (investment-in-land) ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল।

অন্যদিকে কর্ণওয়ালিশের আদেশবলে কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত-ব্যাবসা (private trade) ১৭৮৭ থেকে একরূপ নিষিদ্ধ করা হল। ফলে 'এজেন্সি হাউস'গুলির প্রতিষ্ঠা পাকা হলো এবং ১৭৯০ সালে কলিকাতায় ১৫টি এজেন্সি হাউসের নাম পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে ফার্গুসন ফেয়াবলি এ্যাণ্ড কোং, প্যাক্সটন ককরেল অ্যাণ্ড ডেলআইল, ল্যামবার্ট অ্যাণ্ড রস, কলভিনস্‌ অ্যাণ্ড ব্যাজেট, এবং জোসেফ ব্যারেটো কোম্পানীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এরা শুধু ব্রিটিশ বাণিজ্যের স্বার্থ দেখত না, ফরাসী, পোর্তুগীজ ওলন্দাজ কোম্পানীর কাজও করত।[৯]

তারাই নীল ও চিনির ব্যাবসা চালাবার অর্থ যোগাত। ব্যাঙ্ক ও ইনস্যুরেন্স তারাই প্রথম এদেশে পরিচালনা করে। যে 'বেঙ্গল ব্যাঙ্কে'র দেওয়ান (১৮৩২-৪৪) হয়েছিলেন রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪) তার প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৮৪ সালে। রামকমল সেনের পূর্বে উক্ত ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন মদনমোহন সেন (—মৃত্যু ১৮৩২)। এবার ঘটল একচেটিয়া ব্যাবসার (Monopoly trade) সঙ্গে অ্যাডাম স্মিথ ব্যাখ্যাত অবাধ-বাণিজ্য (Free trade) নীতির দ্বন্দ্ব ও শেষোক্ত নীতির জয়। স্মরণীয় যে Free merchant-দের মুখ্য প্রবক্তা হলেন অ্যাডামস্মিথ। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফলে যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতি সম্ভব হল এবং বলা চলে বস্ত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে গেল ১৭৭৯-৮৬ কাল পর্বে, কার্টরাইটের 'পাওয়ার লুম' (১৭৮৫), ক্রম্পটনের 'মিউল' (১৭৭৯),

বার্থলেটের ক্লোরিন-ধোলাই পদ্ধতি (১৭৮৫) এবং বেলের 'সিলিণ্ডার প্রিন্টি যে'র (১৭৮০) উদ্ভাবনের ফলে।[১০] বণিকী পুঁজির উপর (Mercantile capital) এবার এল ধনিক-পুঁজির (Industrial capital) আঘাত। তার প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশে অনিবার্যভাবে দেখা দিল। বাংলাদেশেও এই শিল্প-বিপ্লবের আঘাত অনুভূত হলো। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ এঁরা সকলেই শিক্ষিত বাঙালী সমাজে 'জাতীয-বুর্জোয়া' শ্রেণীর প্রতিনিধি রূপে উনবিংশ শতকে দেখা দিলেন। দ্বারকানাথ (১৭৯৪-১৮৪৬) 'Free merchant'-দের প্রশংসা করেছেন কেন না তিনি নিজেও সেই শ্রেণীভুক্ত। তার পৈতৃক জমিদারির অন্তর্ভুক্ত বিরাহিমপুরের প্রধান মৌজা কুমারখালিতে কোম্পানির রেশম তৈরির বড়ো কুঠী ছিল। রেশমের একচেটিয়া ব্যাবসানীতি পরিত্যক্ত হলে দ্বারকানাথ নিজেই সেটি কিনে নেন এবং 'কার টেগোর কোম্পানীর পক্ষ থেকে রেশমের ব্যবসা শুরু করেন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, রাণীগঞ্জের কয়লাখনি এবং রামনগরের চিনির কল, দ্বারকানাথ কর্তৃক নবযুগের শক্তিবন্দনার ও চালনার নিদর্শন। বেন্থাম ও রিকার্ডো ইংলণ্ডে যে কাজ করেছেন, রামমোহন ও দ্বারকানাথ এদেশে অনেকটা তারই সমকর্মা।[১১]

কাজেই দেখা যাচ্ছে ১৭৯৩ সালের পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থাবরত্ব বহুলাংশে নাড়া খেলো এবং তার থেকে নতুন আর এক বাংলার যাত্রাপথ তৈরী হলো। ঐতিহাসিক পোলার্ড তাঁর 'Factors in Modern History' গ্রন্থে লিখেছেন

> "Without commerce and industry there can be no middle class, where you had no middle class you had no Renaissance and no Reformation"[১২]

বাংলার অষ্টাদশ শতকের শেষপ্রহর এবং উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের তিহাস উক্ত মন্তব্যের পোষকতা করছে

ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৬১ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্' নির্দেশনামা পাঠান যে এখন থেকে তাঁরা যেন ব্যাবসা-বাণিজ্য চালাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভুত্ব বজায় রাখবার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি করেন।[১৩] সামরিক দিক থেকে বিচার করে দেখা গিয়েছিল ভাগীরথী তীরে কলিকাতা রাজধানী হবার

উপযুক্ত স্থান। নৌবল না থাকলে ক্লাইভ, হেস্টিংস ও ওয়েলেসলির সাম্রাজ্য বিস্তার সম্ভব হত না, ইংরেজের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষাও কঠিন হতো।

এই কলিকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বাংলাদেশের নতুন যুগের যাত্রী। ইতোমধ্যে এই যুগের দৃষ্টিতে এসেছে 'This-worldliness' বা ইহ-চেতনা, সে যত স্থূল অর্থেই হোক। মধ্যযুগের মানুষের দৃষ্টিতে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল 'Other-worldliness' বা পরলোক-চেতনা। চোখের সামনে সেদিনকার মানুষ দেখছিল সামান্য অবস্থা থেকে স্ব-বলে কত লোক সহসা ধনী হল, সমাজে গণ্যমান্য হল। দেখছিল বৈষয়িক উন্নতি, ধনতন্ত্রের উন্মেষ, মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্রম-বর্ধমান রূপ, সামান্য ইংরেজি-জানার কী অসামান্য ফল। দেখছিল কী অসহায় ভাবে গ্রামীণ কাঠামো ভেঙে গিয়ে নাগরিক চেহারা ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হচ্ছে। এই যুগেই ইহ-চেতনা প্রবল হবার যোগ্য সময়।

তুলনা করলে দেখা যাবে শিল্পবিপ্লবের ফলে ও নেপোলিয়নের পতনের পর (১৮১৫) ইংলণ্ডে পুঁজিপতি ও উৎপাদকদের পকেটে টাকা উথলে পড়ছিল। তার ফলে জাঁকজমক, বিলাস-ব্যসন অসম্ভব হারে বেড়ে গিয়েছিল। আহারে-বিহারে তার পরিচয় অতিশয় উগ্র হয়ে উঠেছিল। নতুন-ধনী, কাজেই সেদিনকার অভিজাতদের বাগান-বাড়ির পার্টিতে ওয়ালজ্ নাচের হুল্লোড় আর হে-মার্কেটের নৈশ-অপেরায় বিখ্যাত গায়িকা 'কাটালিনি'-র (Catalini) তীক্ষ্ণ সুরেলা কণ্ঠ —উনবিংশ শতকের সূচনায় বিলেতে 'unquestioning snobbery of the rich' ঘোষণা করছিল।[১৪]

অনুরূপভাবে বলা যায় ১৮১৫ সালে যখন রামমোহন রায় পাকাপাকি ভাবে কলিকাতায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন তাঁর স্বোপার্জিত বিত্তের প্রাচুর্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তিনি প্রায়ই এদেশীয় ধনী ও বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত নর-নারীদের বিজাতীয় পানাহারে তৃপ্ত করতেন। প্রত্যক্ষদর্শিনী ফ্যানি পার্কসের লিখিত বিবরণ থেকে জানতে পারি রামমোহনের প্রদত্ত এই সব পার্টিতে দেশী বাইজী ও নর্তকীদের সঙ্গে বিদেশিনী 'নিকি' যাকে প্রাচ্যের 'কাটালিনি' ('Catalini of the East') বলা হত, তাকেও দেখা যেত।

দ্বারকানাথ ঠাকুরও তাঁর বাগান বাড়িতে 'বেলগাছিয়া ভিলা'য় এ ধরনের বহু ব্যয়-ও বিলাস বহুল পার্টি দিতেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র দ্বারকানাথ সম্পর্কিত স্মৃতিকথায় (১৮৭০) লিখেছেন যে লাটভগ্নী মিস্ ইডেনের সম্মানার্থে যে ভোজ ও

নৃত্যের ব্যবস্থা দ্বারকানাথ করেছিলেন তেমন জাঁকজমকের ভোজসভা কলিকাতায় পূর্বে কখনো দেখা যায়নি।[১৫] এ যুগ ইহ-লোককেই বড়ো বলে মনে করেছে, 'This-worldliness' এই যুগের মূলমন্ত্র। মধ্যযুগ থেকে রেণেসাঁস যুগের পার্থক্য নির্দিষ্ট হয়েছে এই 'ইহ-চেতনার' প্রাধান্যে। ইতালীয় রেণেসাঁস তার দৃষ্টান্ত স্থল, ঐতিহাসিকের ভাষায় 'Renaissance culture was truly the culture of the bourgeoisie'.

রামমোহন বা দ্বারকানাথের মতো বুর্জোয়া-ধনী এবং উন্নত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষেরাই উনবিংশ শতকের বাংলায় নবজাগরণকে বহুলাংশে সম্ভব ও সার্থক করে তুলতে সহায়তা করেছিলেন। তাঁদের জীবন-চরিত যে কিশোরীচাঁদ মিত্রের (১৮২২-৭৩) ন্যায় 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের সভ্য রচনা করবেন এটা আশা করতে পারি। তবে রামমোহন ও দ্বারকানাথ যদি বিত্তসম্পদে উচ্চ না হতেন তাহলে তাঁরা রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের শাসনকে বা বিধি-নিষেধকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন না, শুধু উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা মান্যগণ্য হওয়া বোধ করি চলত না। বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, রামদুলাল দে ও মতিলাল শীল বাংলাদেশের এই দুই ধনকুবের যাঁরা অতি দীন-অবস্থা থেকে নিজেদের ব্যাবসা-বুদ্ধি ('individual enterprise') বলে ক্রোরপতি হয়েছিলেন, তাঁরা লেখাপড়া অতি সামান্যই জানতেন। প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছেন :

> রামদুলাল দে-র মতো লোকেরা কিছু বাংলা, কিছু হিসাব পত্র, কিছু ইংরেজি শব্দ ও কিছু ইংরেজিতে কথা বলার কৌশল শিখে নিয়ে আরমানি জাহাজের ও বণিকদের অধীনে জাহাজ-সরকার ও বেনিয়ানের কাজ যোগাড় করে নিতেন।[১৬]

এই ক্রোরপতি ব্যবসায়ী রামদুলাল দে-র জীবনী প্রথম রচনা করেন 'বেঙ্গলী' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-পত্রিকার সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮২৯-৬৯), Life of Ramdulal De (১৮৬৮) নামে। আর মতিলাল শীলের জীবনী-প্রবন্ধ Life of Mutty Lal Seal (১৮৬৯) কিশোরী চাঁদ মিত্রের রচনা। এ ছাড়া কলিকাতায় স্বল্প-শিক্ষিত হয়েও জাহাজী ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত ধনী, পার্শী সম্প্রদায়ের রুস্তমজী কাওয়াসজীর জীবনী লেখেন প্যারীচাঁদ মিত্র[১৭]। কেননা যাঁরা স্বচেষ্টায় ধনকুবের হয়েছেন তাঁরাই এ-যুগের 'Hero'। রামদুলাল টাকার জোর জানতেন। তাঁর পূর্ব মনিবের বংশজ কালীপ্রসাদ দত্ত বিবি অনার নামের মুসলমানী উপপত্নী রাখার অপরাধে

সমাজচ্যুত হন। রামদুলাল সদম্ভে বলেছিলেন 'জাত আমার বাক্সের ভিতরে', সে বাক্স অবশ্য কাঁচা টাকার।[১৮] গিরিশচন্দ্র ঘোষের (যিনি তাঁর জীবনী লেখক) পিতামহ কাশীনাথ ঘোষ রামদুলালের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাঁকে জাতে তোলেন। দু লক্ষ টাকার জোরে এই 'সমন্বয়' ঘটানো হয় এবং কালীপ্রসাদ দত্ত পুনরায় সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেন। রামদুলাল প্রথমে যে 'ফার্গুসন ফেয়ারলি অ্যাণ্ড কোং'-এর বেনিয়ান ছিলেন, কাশীনাথ ঘোষ ছিলেন তারই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বেনিয়ান। কাজেই তাঁর রামদুলালের পক্ষাবলম্বন স্বাভাবিক। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে কলম্বাসের উক্তি :

> Gold constitutes treasure, and he who possesses it has all the needs in this world, as also the means of rescuing souls from Purgatory and restoring them to the enjoyment of Paradise"—অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সবই স্বর্ণ-সৃষ্ট।[১৯]

তাই ইংলণ্ডে দেখা গেছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে সুরাটে কুঠি করবার পর থেকে (১৬১২) বহির্বাণিজ্যের প্রতি, নতুন নতুন কোম্পানীর প্রতি জন-সমাজের মনোযোগ বিপুলবেগে আকৃষ্ট হয় এবং ঐ পর্যায়ের বণিকরাই সেকালের 'হিরো'র (Hero) মর্যাদা পেতে থাকে :

> The news of this ship's arrival, of that one lost, of rich cargoes just landed at Plymouth and of new privileges conferred on the English at Constantinople or at Surat was relayed over London as fast as the disgrace of a courtier. The merchants took on a new importance in the minds of members of Parliament and Privy councilors and the King. *To the public they were becoming almost heroes.*[২০] (ইটালিকস্ লেখকের)

সেজন্য বেকন সেদিন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন "Treasure doth then advance greatness"। বলা ভালো যে রামদুলালের মৃত্যুর পর 'লণ্ডন টাইমস্' পত্রিকা তাঁর ছেলেদের 'রথচাইল্ডদের' সঙ্গে উপমিত করেছিল।

পাদটীকা

১। রবীন্দ্রনাথ, কালান্তর, পৃঃ ১৭, রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি গ্রন্থমালা।

২। Karim, A. Murshid Quli Khan and his times, p. 54.

৩। The invoice value of raw silk, piece goods and sugar imported to Surat from Bengal was ten lakhs in 1740. —Furber, John Company at work, p. 163.

এবং

'even in the year before Plassey 21 English ships arrived safe from India to England with cargoes valued in the English market at 2 millions sterling'.—Macpherson, Annals of Commerce, Vol.III, শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের Economic History of Bengal Vol. I (2nd Ed.) গ্রন্থের দশম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৪। কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১২২৬।

৫। Sinha, N. K.—Economic History of Bengal Vol. I (2nd Ed.) p. 104.

৬। নবকৃষ্ণ দেব, লক্ষ্মীকান্ত ধর ও কৃষ্ণকান্ত নন্দীর কথাই বলতে চেয়েছেন হুতোম।

৭। A Short Sketch of Maharaja Sukhmoy Roy Bahadur and his friends—by Benimadhab Chatterji, 1910.

৮। Sinha, N. K.—Economic History of Bengal Vol. I., p. 106.

৯। Dutt Romesh, C.—The Economic History of India under the early British rule. Ch. III pp. 40-41 (1901).

১০। Tripathy, A.—Trade and Finance in the Bengal Presidency, (1793-1833), p. 11.

১১। ibid, p. 24.

ibid, p. 251.

১২। Factors in Modern History, p. 43.

১৩। Robinson—The Trade of the East India Company, p. 67.

১৪। Bryant A.—The Age of Elegance (1812-22), p. 341.

১৫। Mittra Kissory Chand—Memoir of Dwarkanath Tagoure 1870.

১৬। Mittra Peary Chund—Life of Ramcomul Sen (1880)।

১৭। Life of Rustomjee Cowsjee (1908)—প্রবন্ধটি প্যারীচাঁদের মৃত্যুর পর The National Magazine পত্রিকায় এপ্রিল ও মে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৮। রাজনারায়ণ বসু—সেকাল আর একাল।

১৯। Tawney R. H.—Religion and The rise of Capitalism Ch. II, p. 98.

২০। Notestein Wallace—The English people on the eve of Colonization (1603-1630), p. 254.

পদ্যবন্ধ চরিত্রের হ্রাস ও গদ্য চরিত্রের পদক্ষেপ

মুদ্রাযন্ত্র : ইতিহাস চর্চা ফোর্ট উইলিয়ম

একটু পিছনে আসা যাক।

অষ্টাদশ শতকে আমাদের দেশের ধর্মজীবনে বা নৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চ আদর্শ প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। বৈষ্ণবসাধনা কালক্রমে তন্ত্রসাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌন-তান্ত্রিক সহজিয়া সাধনায় রূপান্তরিত হয়। নর ও নারীর মধ্যে যথাক্রমে কৃষ্ণ ও রাধা-শক্তির অস্তিত্ব আবিষ্কার এবং পরকীয়া সাধনাই একমাত্র সাধনা, এই ধরনের ঘোষণা বিকৃত ধর্মাচারের ইঙ্গিত দেয়। শাক্ত-সাধকদের মধ্যে বরণীয় কবি রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-৮১) বীরাচারী তান্ত্রিক ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের ভূস্বামীরা অনেকেই, যেমন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজ নন্দকুমার, মহারাজ রামকৃষ্ণ (নাটোর), দেওয়ান রঘুনাথ (বর্ধমান) শাক্ত-সাধক ছিলেন। শাক্ত সাধনা থেকে তন্ত্রসাধনাকে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন। তখন দেশব্যাপী 'কুলাচার' প্রচলিত ছিল।[১] ফলে শাক্ত-সাধনা অবিকৃত থাকেনি। রামমোহন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন

> Debauchery, however, universally forms the principal part of the worship of her (Kali) followers.[২]

রাজনৈতিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য দুটি ঘটনা অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঘটেছে—বর্গীর হাঙ্গামা ও পলাশীর যুদ্ধ। বর্গীর হাঙ্গামার (১৭৪৩) আট বছর পরে কবি গঙ্গারাম দত্ত লেখেন 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ' (১৭৫১)[৩]। কবিদের দৃষ্টিভঙ্গিও যে অষ্টাদশ শতকে ক্রমে পালটে যাচ্ছে তার একটি নিদর্শন এর বিষয়বস্তুর নতুনত্ব। 'পুরাণ' কিন্তু 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ', যার পিছনে আছে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতালব্ধ বর্গীর হাঙ্গামা। পুরাণের ছাঁচে কাব্যটি রচিত, 'প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভব' বর্ণনাতেই অসম্পূর্ণ সমাপ্তি। পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার[৪] বা সলিমুল্লা অথবা হলওয়েল বর্গীদের অত্যাচারের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে গঙ্গারাম-প্রদত্ত বর্ণনার মিল রয়েছে এবং আলিবর্দি-ভাস্কর পণ্ডিতের বর্ণিত বিবরণ অনৈতিহাসিক নয়। 'মঙ্গল'-পুরাণের পথে থেকেও এইকাব্য সমকালীন ইতিহাসের সঙ্গে যোগ রেখেছে। কিন্তু 'ঐতিহাসিক-চেতনা' থেকে এ কাব্যের জন্ম হয়নি।

ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-৬০) অন্নদামঙ্গল কাব্যের (সমাপ্তিকাল ১৭৫২) তৃতীয় ভাগে 'মানসিংহ পালা' অংশে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের 'কীর্তি' বর্ণনা করতে হলে অনিবার্যভাবে প্রতাপাদিত্য-বৃত্তান্ত এসে পড়ে। কাজেই মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ ও প্রতাপাদিত্যের বন্দীদশা প্রভৃতি ঘটনা তাঁকে বর্ণনা করতে হয়েছে। সেগুলির মধ্যে স্বতঃই ইতিবৃত্তের সঙ্গে জনশ্রুতির আধিক্য মিলেছে। বরং আলিবর্দি ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সম্পর্কিত যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তার ঐতিহাসিক মূল্য বেশি। মহারাষ্ট্র-পুরাণ ও অন্নদামঙ্গল দুখানি কাব্যেই আলিবর্দির কথা পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গলে কৃষ্ণচন্দ্রের সভার পাত্রমিত্রদের পরিচয় লভ্য, কিন্তু এ রীতি কৃত্তিবাসের যুগেও ছিল, নতুন কিছু নয়।

পলাশীর যুদ্ধের পরে লেখা 'তীর্থমঙ্গল' (সমাপ্তিকাল ১৭৭০) কাব্যখানি এই প্রসঙ্গে আলোচিত হবার যোগ্য[৫]। বিজয়রাম সেন এই কাব্যের রচয়িতা। খিদিরপুরের ধনী গোকুল ঘোষালের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ১৭৬৮-৬৯ সালে নৌকাযোগে তীর্থযাত্রা করেন, তাঁর সঙ্গী ছিলেন বিজয়রাম। এই কাব্যে গোকুল ঘোষাল, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতির প্রশস্তির সঙ্গে তাঁদের জীবনের কার্যাবলীর দৃষ্টান্তও মেলে। বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্বের দাবি 'তীর্থমঙ্গল' করতে পারে।

নবদ্বীপের কৃষ্ণচন্দ্র রায়, শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব, কাশিমবাজারের কৃষ্ণকান্ত নন্দী নতুন কালের রাজা-মহারাজা। কাজেই তাঁদের চরিত-প্রশস্তি, সভাবর্ণন কাব্যে দেখা দিল। এগুলি নতুন যুগের 'বিশিষ্ট' দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত নয়। গতানুগতিক ধারারই রচনা, তবে কাল ও পাত্র বদল হয়েছে। কাল্পনিক বা পৌরাণিক বিষয়ের বদলে সমকালীন 'প্রত্যক্ষ ব্যক্তি' কাব্যের বিষয়ীভূত হয়েছে। শোভাবাজারের কালীকৃষ্ণদেবের সভাপণ্ডিত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার 'মাধব মালতী' কাব্যে মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের 'নবরত্ন' সভার যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, বলরাম তর্কভূষণ প্রভৃতির উল্লেখ ও ব্যক্তি-পরিচয় আছে।[৬] মাসুল্লা মণ্ডলের 'কান্তনামা', কোচবিহারের মহারাণী বৃন্দেশ্বরী দেবীর 'বেহারোদন্ত', অনুপচন্দ্র দত্তের 'প্রতাপচন্দ্র-লীলারস সঙ্গীত', জয়ন্তীচন্দ্র সেনের 'শ্রীনন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান' এবং 'রাজমালা'[৭], প্রভৃতি পদ্যবন্ধ চরিত-কাব্যগুলি পুরাতন রীতিতে রচিত, শুধু মানুষগুলি এ-যুগের

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) রচিত "আশ্চর্য উপাখ্যান অর্থাৎ মুক্ত কালীশঙ্কর রায়ের বিবরণ। ক্ষমতাদি কীর্তিকৃত্য ইহাতে বর্ণন" (১৮৩৫) এই বর্গের রচনা।

এই ধারায় একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রাজা রাধাকান্ত দেবের পদ্যবন্ধ চরিত-কাব্য 'জীবনচরিত' (১৮৬৭)।[৮] মঙ্গলকাব্যের ধরণে লেখা এই কাব্যখানি রেভারেণ্ড লঙ্ সাহেবকে উৎসর্গ করা হয়েছে। কাব্যখানি শেষ হয়েছে রাধাকান্ত দেবের আদ্যশ্রাদ্ধের বর্ণনার পর। কাব্যের রচয়িতা 'ট্রেনিং একাডেমির অন্যতর শিক্ষক' হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়। পয়ার-ত্রিপদীতে গ্রথিত কাব্যখানির ঈষৎ পরিচয় দেওয়া হল :

উইলসন রাধাকান্ত ডেভিড হেয়ার।
হ্যার হাইডিস্ট হল প্রধান সভার ॥
চারিজন মহাসত্ত্ব হয়ে একত্তর।
বিদ্যানিধি বিতরণে হলেন তৎপর ॥
স্থাপিলেন হিন্দু নামে কলেজ সহরে।
কেবল বিশিষ্ট বালকের শিক্ষার তরে ॥ ইত্যাদি।

গদ্যে লিখিত হলে গ্রন্থখানি বোধ করি বেশি আদৃত হত। 'পিতৃদেব চরিত' নামে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (১৮৩১-১৯০৮) একখানি পয়ারবন্ধ চরিত কাব্য রচনা করেছিলেন তাঁর কন্যা মনোরমা দেবী[৯]।

পুরোনো রীতিতেও নতুন যুগের বাস্তব, ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে কাব্য রচনা সম্ভব ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের পক্ষে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল।' হিন্দু কলেজের ছাত্র, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-৭৩) 'সুরধুনী' কাব্য তার দৃষ্টান্ত। তাঁর সুরধুনী কাব্যের[১০] (১ম ভাগ ও ২য় ভাগ যথাক্রমে ১৮৭১ ও ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত) প্রথম থেকে ষষ্ঠ সর্গ অবধি বিরহিনী গঙ্গানদীর পতি-সাগরের উদ্দেশে যাত্রা-উপলক্ষে বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত তার প্রবাহ পথ ও উভয় পার্শ্বের জনপদের ইতিহাস ও কিম্বদন্তী বর্ণিত হয়েছে। বাংলা কাব্যে নৌযাত্রা ও তীরবর্তী অঞ্চলের উল্লেখ ও বর্ণনা বহু আছে। 'তীর্থমঙ্গল' কাব্যের কথা কিছু আগে বলা হয়েছে। কিন্তু দীনবন্ধুর রীতি প্রাচীন হলেও দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক। ভাগীরথী-গতিপথ বর্ণনার সঙ্গে তিনি অধিকাংশ স্থানের ঐতিহাসিক রূপ ও গুরুত্ব নির্দেশ করে গেছেন।

সপ্তম সর্গ থেকে বাংলাদেশের ইতিহাস শুরু হয়েছে। সেখানে দেখতে পাই নবদ্বীপ বর্ণনায় চৈতন্যদেব, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন, জগদীশ, আগমবাগীশ, বুনো রামনাথ প্রত্যেকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

অষ্টম সর্গে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসঙ্গ। ঐ সঙ্গে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, শ্যামাচরণ প্রভৃতি ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে। ভাগীরথীর ত্রিবেণী আগমনে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডে বংশবাটী চুঁচুড়া, বৈদ্যবাটী, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, কোন্নগর, হালিশহর, গরিফা, নৈহাটি, মূলাজোড়, আগরপাড়া, উত্তরপাড়া প্রভৃতি খ্যাতনামা স্থান ও তত্রস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় দানের পর কলিকাতার বর্ণনা। কলিকাতার চমৎকার অবজেকটিভ বা তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ দিয়েছেন দীনবন্ধু। এই সূত্রে এসেছে বরেণ্য ব্যক্তিদের কীর্তি-বর্ণন। ডেভিড হেয়ার, উইলসন্, 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের রসিককৃষ্ণ, রামগোপাল, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষ; সংস্কৃত কলেজের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, রামকমল ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী; রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, মধুসূদন দত্ত, রাজেন্দ্রলাল দত্ত, কালীকৃষ্ণ মিত্র, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর দেব মহেন্দ্রলাল সরকার; হরিশ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ কালীপ্রসন্ন সিংহ, রমানাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র; শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রমাপ্রসাদ রায়, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, আবদুল লতিফ, ও শেষে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, মহাশয়গণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কীর্তন 'সুরধুনী' কাব্যখানিকে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যদান করেছে। এই সুদীর্ঘ তালিকা থেকে বোঝা যাবে বর্ণিত ব্যক্তিদের সকলেই দীনবন্ধু মিত্রের প্রায় সমকালীন। তাঁদের অনেকেই তখনো জীবিত অথবা হয়ত কিছুদিন পূর্বে পরলোকগত হয়েছেন। দীনবন্ধুর এই কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড সেদিক থেকে

সমকালীন ব্যক্তি, ঘটনা, প্রতিষ্ঠান ও সমাজের এক বিশ্বস্ত বিবৃতি। কাজেই একে দীনবন্ধুর পদ্যবন্ধ Men and Events of my time বললে অযৌক্তিক হয় না।

কিন্তু পদ্যবন্ধ চরিতের প্রচলন বন্ধ হলো গদ্যরচিত চরিতগ্রন্থের আবির্ভাবে। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার না ঘটা পর্যন্ত গদ্যের পদসঞ্চার শ্লথ হতে বাধ্য। মুদ্রাযন্ত্রই মানুষকে পাণ্ডুলিপির যুগ (age of manuscript) থেকে মুক্তি দিয়েছে। মধ্যযুগীয়তা থেকে নিষ্ক্রমণের রাজপথ মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তায় রচিত হয়েছে। রেণেসাঁসের যুগে একদিকে চলেছে ধনরত্নের সন্ধানে নব-নব উপনিবেশের সন্ধান, ভাস্কো ডা গামা, কলম্বাস অথবা ম্যাগেলানের আবিষ্কার ভৌগোলিক জগতে, অপরিচিত স্থলভাগের রহস্য তাঁরা উদ্ঘাটিত করেছেন। অন্যদিকে কোপার্নিকাস করেছেন সৌরজগতের রহস্য বিশ্লেষণ। মুদ্রাযন্ত্র জ্ঞানের জগতে নতুন বার্তা বহে আনল। ইংলণ্ডে রেণেসাঁসী চিন্তার ভগীরথ বেকন ঠিকই বলেছিলেন :

"Printing, gunpowder and the magnet have changed the whole face and state of things throughout the world."

পূর্বে বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির আশানুরূপ বিকাশ লাভ ঘটেনি মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে। শ্রীরামপুরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্মচারী চার্লস উইলকিনস্ (১৭৫০-১৮৩৬) বাঙালী কারিগর পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় বাংলা ধাতব হরফ তৈরী করান। নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেডের (১৭৫১-১৮৩০) রচিত 'A Grammar of Bengal Language' (১৭৭৮) গ্রন্থে উৎকলিত দৃষ্টান্তগুলি ছাপাবার জন্য এই বাংলা হরফের প্রয়োজন হয়েছিল। হালহেড ব্যাকরণখানি লিখেছিলেন 'ফিরীঙ্গীনামুপকারার্থং'। কাজেই বাংলা সাহিত্যে ১৭৭৮ সাল থেকে পাণ্ডুলিপি যুগের অবসানের সঙ্কেত ধ্বনিত এবং গদ্যের পথ প্রশস্ত হল।

এই অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেছেন রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) রামকমল সেন, (১৭৮৩-১৮৪৪) রাধাকান্ত দেব, (১৭৮৪-১৮৬৭) দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) অর্থাৎ বাঙালীদের মধ্যে যাঁরা মুখ্য নবযুগ স্রষ্টা। এবং এই শতকের শেষভাগে স্থাপিত হয়েছে স্যর উইলিয়ম জোন্সের

সহাযতায় এশিয়াটিক সোসাইটি, (১৭৮৪) জ্ঞান-বিজ্ঞান চচার প্রধান কেন্দ্র। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেবা চেষ্টা কবেছিলেন প্রাচ্যেব বিস্মৃতপ্রায় জ্ঞানভাণ্ডাবেব সম্পদ উদ্ধাবে, বাঙালী পণ্ডিতদেব সহাযতায়।

ইতালীয বেণেসাঁসের একটি প্রধান প্রবণতা ছিল প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যেব আবিষ্কাব ও অনুশীলন। বেণাঁ পেত্রার্ককে (১৩০৪-৭৪) বলেছিলেন "The first modern man'। ধর্মনিবপেক্ষ ও ব্যক্তি হৃদযেব সংরাগমণ্ডিত অপরূপ সনেট স্রষ্টা হিসাবে তিনি 'আধুনিক' গীতিকবি। কিন্তু পেত্রার্কেব আবো একটি দিক লক্ষণীয। তিনি প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যেব পাণ্ডুলিপি আবিষ্কাবে ব্রতী হযেছিলেন। একদা কিকেবো-ব রচনাব লুপ্ত পাণ্ডুলিপিব কিয়দংশ আবিষ্কাব কবে তিনি আনন্দে চিৎকাব কবে উঠেছিলেন। তিনি সহযোগী বন্ধুদেব উৎসাহিত করতেন লুপ্ত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কাবে ব্রতী হতে, প্রাচীন লিপিগুলির নকল রাখতে, প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ ও সংবক্ষণ করতে। ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও চেতনা তাঁব ছিল। সাধাবণ গ্রন্থাগাব স্থাপনেব জন্যও তিনি জোব দিযেছিলেন। বাংলা দেশে এশিযাটিক সোসাইটি (১৭৮৪) এই ধবণের ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন কবেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায, উইলিযম জোনসেব শকুন্তলা অনুবাদ (১৭৮৯), উইলকিনসেব ভগবদগীতাব অনুবাদ (১৭৮৫), জেমস প্রিন্সেপেব অশোকেব শিলালিপিব পাঠোদ্ধাব (১৭৮৫) এইচ টি, কোলব্রুকেব বেদ বিষযক প্রবন্ধ প্রকাশ তাবই সাক্ষ্য। তাঁবা আবো বহু মূল্যবান কাজ করেছেন কিন্তু বাহুল্যভয়ে সেগুলিব উল্লেখ কবা হল না। তখনকাব বাঙালী পণ্ডিতেবা তাঁদেব সহাযতা কবেছেন। শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি সংস্কৃত কলেজে প্রবেশেব পূর্বে তিন বছর উইলসন সাহেবেব 'পণ্ডিত' ছিলেন। কোলব্রুকেব অন্যতম 'পণ্ডিত' ছিলেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কাব (১৭৭৫-১৮৪৬)। কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কাব (মৃত্যু ১৮৪৩) জেমস্ প্রিন্সেপেব দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাঁব সম্পর্কে বলা হযেছে with him has expired the accurate knowledge of the ancient Pali and Sanskrit forms of writing'.[১১] এশিযাটিক সোসাইটি সংস্কৃত মহাভারতেব যে প্রামাণিক সংস্কবণ প্রকাশ কবেন তাব অন্ততঃ তিনটি খণ্ডেব (২য খণ্ড ১৮৩৬, ৩য় খণ্ড ১৮৩৭, ৪র্থ খণ্ড ১৮৩৯) অন্যতম সম্পাদক ছিলেন নিমাইচাঁদ শিরোমণি (মৃত্যু ১৮৪০)। কোলব্রুক কৃতজ্ঞভাবে লিখেছেন যে দেশীয় পণ্ডিতেবা সংস্কৃত শিক্ষাদানে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন, তাঁবা

"do not even conceal from us the most sacred texts of their Vedas."[১২]

এ আগ্রহ তাঁদের মধ্যে জাগিয়েছিলেন পাশ্চাত্য ভারত-তত্ত্ববিদেরা। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র, সাহিত্য, স্মৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। তাঁদের পূর্বে রামমোহন রায়ের ঈশ-কঠ-কেন প্রভৃতি পাঁচখানি মুখ্য উপনিষদের বঙ্গভাষানুবাদ প্রকাশ, রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম সম্পাদন ও মুদ্রণ (১৮১৯-৫৯) এই 'নবজাগ্রত' দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের পরিচয় দেয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি বহু সুধী ব্যক্তি ভারত-আবিষ্কারের এই পথে অগ্রসর হয়েছেন।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন, ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের আবিষ্কার এবং নতুন দৃষ্টিতে পাণ্ডুলিপি সম্পাদন, মাতৃভাষার চর্চা সবই 'নবজাগরণ'-যুগের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বাংলা গদ্যের চলতাধর্ম ও বহুমুখিতা মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের পর সম্ভব হয়েছে। কাজেই আমাদের বহু শতাব্দীর পদ্যবন্ধের স্থলে গদ্যরীতির, তার সুষ্ঠু প্রকাশ-ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা ঘটতে স্বাভাবিকভাবে কিছু বিলম্ব ঘটবেই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১৮০০ সালে স্থাপিত হয় ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষিত করে তোলার জন্য। বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরী কলেজের অন্যতম শিক্ষক রামরাম বসুকে (১৭৫৭-১৮১৩) নির্দেশ দেন এদেশীয় কোনো রাজার ইতিহাস রচনা করতে 'to compose a history of their kings, the first prose book ever written in the Bengalee Language'।[১৩] রামরাম বসু স্বেচ্ছায় বেছে নেন যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে, কেননা তাঁর নিজের কথায়— "আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত।" রামরাম বসু নিজে সচেতনভাবে এ ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হননি, হয়েছিলেন কেরীর নির্দেশে। কিন্তু অ-সচেতন থেকেও তিনি একটি নতুন পথ খুলে দিলেন রামরামের প্রধান কৃতিত্ব এরূপ একখানি আদ্যোপান্ত ক্রম-রক্ষিত আখ্যানমূলক

গ্রন্থ গদ্যে রচনা করা। প্রতাপাদিত্যের কথা রামরামের রচনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে ভারতচন্দ্র রায় গ্রথিত করে গেছেন পদ্যছন্দে। কিন্তু রামরামের বর্ণিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ঐতিহাসিক তথ্যে বহুগুণ সমৃদ্ধ এবং চিত্তাকর্ষক। রামরাম বসুর রচিত গ্রন্থের তথ্য-স্থাপনা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পদ্যে রচিত হওয়া সম্ভব ছিল না। আর এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল ছাত্র-পাঠকের জন্য, শ্রোতার জন্য নয়। রামরামের সম্মুখে বাংলায় গদ্য রচিত একরূপ ইতিহাস বা চরিতগ্রন্থ ছিল না। কিন্তু তিনি ফার্সি জানতেন এবং তাঁর রচনার ঐতিহ্য ফার্সি ভাষায় লিখিত ইতিহাস ও চরিতগ্রন্থে খুঁজতে হবে। কেন না তিনি প্রতাপাদিত্য চরিতের তথ্যগত দিক সম্পর্কে লিখেছেন, "বিবরণ কিঞ্চিৎ পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গপাঙ্গরূপে সামুদাইক নাহি।"

কাজেই ইতিবৃত্ত-মূলক উপাদান ও প্রচলিত জনশ্রুতি উভয়ের সংযোগে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে। 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং' গ্রন্থে রামরাম বসুর বক্তব্যের সমর্থন আছে।[১১]

ফার্সি সাহিত্যে ইতিবৃত্ত, জীবনী, আত্মজীবনী প্রচুর। ঐ পর্যায়ের রচনার সহিত পরিচয়ের ফলে আলোচ্য গ্রন্থের তথ্যধর্মিতা বেড়েছে ও অলৌকিকতা কমেছে বলে মনে হয়। রামরাম বসু 'লিপিমালা'য় (১৮০২) গদ্যে যে চৈতন্য-চরিত লেখেন সে বর্ণনাও ভক্তিবিহ্বল নয়।

রামরামের গ্রন্থের অনুকরণে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অপর একজন পণ্ডিত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫) রচনা করেন। গ্রন্থকার কৃষ্ণনগর রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকায় তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা করেছেন। অবশ্য সিটন কার ও ইয়েটস্ উভয়েই রাজীবলোচনের বক্তব্যের নিন্দা করেছেন কেননা তাঁরা গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য মনে করেছেন 'to gain favour of the English.' রাজীবলোচনের গ্রন্থে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত হরিহোড় পালা, মানসিংহ পালা, বিদ্যাসুন্দর বৃত্তান্ত, ঈশ্বরী পাটনী প্রসঙ্গ সবই বিদ্যমান। অন্যদিকে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা, সিরাজদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির চক্রান্ত ও সিরাজের পতন বর্ণিত হয়েছে। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'কে যেমন 'History' বলা হয়েছে 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'কেও একই আখ্যা দান করা চলতে পারে। এই সূত্রে বলা দরকার যে পাদরী লঙের প্রযত্নে হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার

রামরাম বসুর গ্রন্থকে ভিত্তি করে সংস্কৃতানুগ গদ্যে রচনা করেন 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮৫৩)।[১৫] তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত গদ্যরীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হরিশ্চন্দ্রের গ্রন্থের 'Preface' অংশে রামরাম বসুকে স্মরণ করে বলা হয়েছে "His Biography, one of the few historical ones we have in Bengal was compiled fifty years ago as a text-book for the college of Fort William"। এ ক্ষেত্রে 'Biography' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

ফোর্ট উইলিয়মের পাঠ্যপুস্তক হলেও রামরাম বসুব গ্রন্থই আমাদের প্রথম যুগপৎ ইতিবৃত্ত ও চরিত গ্রন্থ। 'চরিত গ্রন্থ' নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও শক্তি অর্জন করেছে আরো অনেক পরে।

পাদটীকা

১। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সাঃ সাঃ চরিতমালা।

২। A Defence of Hindu Theism, Rammohan Roy, 1817.

৩। মহারাষ্ট্র পুরাণ, ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত।

৪। চিত্রচম্পূ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ১৭৫০।

৫। তীর্থমঙ্গল, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্তৃক সম্পাদিত, ১৩১২।

৬। দ্রঃ রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, সাঃ সাঃ চরিতমালা।

৭। কান্তনামা বা রাজধর্ম কাব্য। নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী, ৮ সংখ্যক।

বেহারোদন্ত, নিরুপমা দেবী কর্তৃক সম্পাদিত, কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাবলী, ৩ সংখ্যক।

প্রতাপচন্দ্র লীলারস রঙ্গীত, 'বীরভূমি' পত্রিকা, ১৩০৮-০৯।

শ্রীনন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান, সাকিন সভাবাজার, ১২৭৩।

রাজমালা, কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত, আগরতলা, ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ।

৮। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত।

৯। Private Circulation হিসাবে মালশ্রী দেবী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৪১।

১০। সুরধুনী কাব্যে রাধাকান্ত দেবের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় তাঁর মৃত্যুর (১৮৬৭) পূর্বে কাব্য সমাপ্ত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, দীনবন্ধু এ কাব্য রচনা করে অনেক কাল ফেলে রেখেছিলেন।

১১। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (১৮২৪-১৮৫৮) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, পৃঃ ৪০-৪১।

১২। Notices of the life of H. T. Colebrooke--by his son.

১৩। Memoir of William Carey, pp. 453-54 দ্রঃ 'রামরাম বসু' সাঃ সাঃ চরিতমালা, পৃঃ ৩৩।

১৪। 'ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতং' (১৮৪২) W. Pertsch কর্তৃক সম্পাদিত ও বার্লিনে মুদ্রিত হয়। 'প্রতাপাদিত্য' প্রসঙ্গ চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

॥ সাময়িক পত্র, জীবনচরিত ও নভেল ॥

উনবিংশ শতকের গোড়ায় কলিকাতা শহরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান হলে অর্থসন্ধানী দালাল, ভাগ্যান্বেষী বণিক, স্বল্পশিক্ষিত চাকুরিয়া ও গ্রামত্যাগী শহরবাসীর ভিড় বাড়তে থাকে। একদিকে যেমন বিভিন্ন বণিককোম্পানীর ও খাস মহামান্য 'কোম্পানীর' কর্মচারীদের সহযোগীরূপে দেওয়ান, হৌসদার, মুচ্ছুদ্দি, বেনিয়ান বা হঠাৎ-ধনী "বাবু"র দল দেখা দিয়েছিল, তেমনি তাদেরই বেতনভুক কর্মচারী, বিল-আদায়কারী সরকার, পেয়াদা মুহুরী, নীলামডাকের গোমস্তা থেকে বাড়ীর কাজ করবার জন্য দারোয়ান, ঝি-চাকর রূপে বহু বৃত্তিজীবীর সমাগম ঘটছিল। নিয়োগ-কর্তা ও নিযুক্ত-ব্যক্তি উভয়েই কাঁচা পয়সার ঝাঁঝালো স্বাদ পাচ্ছিল, যার স্বাদ গ্রাম-জীবনে পাওয়া সম্ভব হয়নি। গ্রাম-সমাজে সামাজিক শাসন, সংস্কার, প্রথা অগ্রাহ্য করা কঠিন। সমাজবিরোধী দুষ্কার্য করলে গ্রামে 'প্রায়শ্চিত্ত' এড়ানো কঠিন ছিল, 'একঘরে' হতে হতো। কিন্তু শহরে সে মানুষই স্বাধীন, কেন না সে আর্থিক দিক থেকে কারো অধীন নয়। কাজেই এখন তার 'Practical Ethics' হল গ্রামীণ সমাজের মৌল ধর্মভয় ও পাপ-পুণ্যতত্ত্বকে ফাঁকি বলে ঘোষণা করা। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা গড়ে ওঠার এই হল একটি পথ। শহরে যত উচ্ছৃংখল জীবনই সে যাপন করুক গ্রামের সামাজিক-শাসন তাকে পূর্বের মত আর বাঁধতে পারে না। তখনকার কলিকাতার জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ এই শ্রেণীর লোকেরাই জুড়ে ছিল। এরা ও এদের সন্তানেরা বুলবুলির লড়াইয়ের দর্শক, কবি-হাফআখড়াইয়ের শ্রোতা, 'সস্তা' বইয়ের পড়ুয়া বা Reading public—এরা পড়ত প্রধানত যাকে আমরা বলে থাকি এককথায় "বটতলা"র বই। এরাই নিতাই বৈরাগীকে কবিগানের সময় ভদ্রজনের রুচিসম্মত 'সখী-সংবাদ' ছেড়ে 'খাড়' ['খেউড়'] গান করতে বাধ্য করেছিল।[১]

আমরা জানি মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও মুদ্রণব্যবস্থার বিস্তার সর্বদেশে পড়ুয়া-জনসাধারণ তৈরি করে। পাদরী লঙ্ সাহেব লিখেছেন ১৮২১ সালে এদেশীয় লোকের পরিচালনায় চারটি বাংলা ছাপার প্রেস ছিল। সে চারটি

হল লালবাজারে 'হিন্দুস্থানী প্রেস', চোরবাগানে হরচন্দ্র রায়ের 'বাঙ্গালি প্রেস', পটলডাঙ্গায় লল্লুলালের 'সংস্কৃত প্রেস' ও শোভাবাজারে বিশ্বনাথ দেবের প্রেস। মিশন রো-র 'গভর্ণমেণ্ট গেজেট' প্রেসেও বাংলা ছাপার কাজ চলত। এছাড়া দেখি তখনকার পত্রিকাগুলির নিজেদেরই প্রেস ছিল, দৃষ্টান্তস্বরূপ সমাচার দর্পণ, সমাচার চন্দ্রিকা, বঙ্গাল গেজেটি, সম্বাদতিমির-নাশক, বঙ্গদূত, সম্বাদপ্রভাকর, সম্বাদভাস্কর প্রভৃতি প্রেসের কথা উল্লেখ করা যায়। রামমোহন রায়ের ইউনিটারিয়ান প্রেসের কথাও এই সূত্রে বলা উচিত। তারপর ছোট-বড়ো অসংখ্য প্রেস সারা শহরে মাথা তুলল।

'বটতলা'-বাজারের প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে বিবিধ পৌরাণিক, শাক্ত ও বৈষ্ণব গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে আদিরসমুখ্য (আদিরস, রতিমঞ্জরী, রতিবিলাস ও রসমঞ্জরী) বইয়ের সাক্ষাৎ মেলে। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের ভূতপূর্ব কম্পোজিটর ও পরে 'বঙ্গাল গেজেটি'র সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৮১৬ সালে বিদ্যাসুন্দর, রতিমঞ্জরী প্রভৃতি ছেপে বার করেন। ১৮২৩ সালে সংবাদপত্রে জনৈক অজ্ঞাতনামা পত্রলেখক জানান যে ঐ সব বই "বাবুদিগের নিকটে আগতমাত্র সমাদরপুরঃসরে মূল্য প্রদানপূর্বক গ্রহণ করিয়া দিবারাত্রি তদামোদে আমোদিত হইয়া থাকেন।"[২] সমকালীন Reading public-এর বৃহদংশের রুচির নমুনা ঐ উক্তি থেকে বোঝা যায়। প্রশ্ন হতে পারে এর সঙ্গে জীবনী-সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনার যোগ কোথায়? উত্তরে বলা যায় যে জীবনী সাহিত্যের সঙ্গে কথাসাহিত্যের যোগ ঘনিষ্ঠ উভয়েরই উপজীব্য মানুষের জীবন। উভয়েরই কার্য—বিশেষ 'মানুষ' অথবা বিশেষ 'চরিত্রে'র জীবনের রহস্য, দ্বন্দ্ব, ভালোমন্দ খুলে দেখানো। তবে জীবনীকার করেন 'discovery' আর ঔপন্যাসিক চলেন 'invention'-এর পথে। কেন না জীবনীকার কাল্পনিক তথ্যের আশ্রয় নিতে পারেন না। সত্যই সে-ব্যক্তির জীবনে যা যা ঘটেছিল, তাকে ভিত্তি ধরে কিছু অনুমান, কিছু ব্যাখ্যা করতে পারেন মাত্র।

কিন্তু ঔপন্যাসিক 'চরিত্র'কে সৃষ্টি করেন, নিজের মনের মতো করে গড়েন সেখানে তিনি 'স্বাধীন'। জীবনীকারের মত 'সত্য' ও 'স্বীকৃত' তথ্যের গণ্ডিতে তাঁর পদচারণ সীমিত নয়।[৩] এবং জীবনী-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য গঠনের দিক থেকে পরস্পরের পর লক্ষণীয় প্রভাব ফেলেছে। আর Reading public

বা পড়ুয়া-সাধারণ উভয় বিষয়-বস্তুর উৎসুক পাঠক। তুলনা দিয়ে বলা যায় অষ্টাদশ শতকের ইংরাজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল।

নাগরিক ও বণিক-সভ্যতার প্রসার, শহরজীবী মধ্যবিত্তের ও বুর্জোয়া-শ্রেণীর ক্রমবিস্তার, মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের প্রচলন, ক্লাব ও কফিহাউসের জটলা অপরাপর লোকদের সম্পর্কে সপ্রশ্ন কৌতূহল জাগিয়েছিল ও বাড়িয়েছিল। সাধারণ ও অ-সাধারণ সমকালীন ও ঈষৎপূর্বজ সবস্তরের মানুষের জীবনের তথ্য জানবার আগ্রহ, কোথায় কোন্ ঘটনা কী করে ঘটল জানবার দুর্নিবার ঔৎসুক্য মিটিয়েছিল মুখ্যত সংবাদপত্র, পুস্তিকা, নকশা, জীবনী ও 'ভুয়ো' (pseudo) জীবনী। সংবাদপত্রগুলিতে 'Obituary' বা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ যখন প্রকাশিত হত, তার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত গদ্যে কখনও বা পদ্যে Epitaph গোছের কিছু জুড়ে দেওয়া হত। তার কারণ আদিকাল থেকে এই স্মৃতি-রক্ষণ প্রবৃত্তি বা 'Commemorative Spirit' জীবনী রচনার মূলে কাজ করে এসেছে।[১] তাছাড়া যেসব ঘটনার বিবরণ ছাপা হত, তার মধ্যে রয়ে যেত বহু লোকের জীবনের নানা চিত্তাকর্ষক ঘটনা। ইহলোকের মানুষের প্রত্যক্ষ জীবনই সবচেয়ে বেশি জ্ঞাতব্য বলে সেদিনকার ইহচেতন পড়ুয়াদের মনে হয়েছিল। সেইজন্যই 'রবিনসন্ ক্রুশো'র (১৭১৯) গল্প এত বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। অষ্টাদশ শতক ইংরেজের চতুর বণিকবৃত্তির তথা বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণের যুগ। এই যুগের মানুষদের জীবনের বাস্তব তথ্যমণ্ডিত বর্ণনা পড়বার জন্য লোকের চোখে ঘুম থাকত না। নিম্ন মধ্যবিত্ত কসাই ঘরের সন্তান ডাফো (Defoe) খবরের কাগজে কাজ করতেন, নক্শা বা পুস্তিকা লিখিতেন। তাঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, বর্ণনার নৈপুণ্য ও ঝরঝরে ভাষা সবই সাংবাদিকতা থেকে লব্ধ। লক্ষ্য করতে হবে পূর্বোক্ত বইয়ের পুরো নামটি হল 'The Life and Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner'. নভেল হলেও নামটি হুবহু জীবনচরিতের মতো করে দেওয়া হয়েছিল। কাহিনীটিকে পুরোপুরি বিশ্বাস্য করে তুলবার জন্য 'of York, Mariner' বসানো হয়েছিল।[৫]

ড্যাম্পিয়ারের New Voyage Round the World (১৬৯৭), ক্যাপ্টেন কুকের Voyage to the South Seas and Round the World (১৭১২) প্রভৃতি বই থেকে ডাফো তাঁর রচনার উপাদানসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন।

আলেকজাণ্ডার সেলকার্কের কাহিনী তাঁর তো জানা ছিলই। ঐ ধরনের অসংখ্য বই ও পুস্তিকা সেদিন বার হয়েছিল। চোর, ডাকাত, কয়েদীদের কথাও লোকের জানবার ইচ্ছা বা 'curiosity' হয়েছিল। 'মল ফ্লানডার্স' নভেলখানি তারই সাক্ষী। ফিল্‌ডিঙের রচিত 'The true and genuine account of the life and actions of the late Jonathan Wild ; not made up of fiction and fable, but taken from his own mouth and collected from papers of his own writing'—প্রকৃতপক্ষে একখানি 'রিয়ালিষ্টিক' নভেল। এই কালপর্বে কথাসাহিত্যের ঝোঁক পড়ল প্রত্যক্ষতার দিকে। ঐ বইয়ের নাম ও পরিচয় পড়ে মনে হবে বইখানি কোনো অংশে কল্পনামিশ্রিত নয় পুরোপুরি 'বিশ্বাস্য' তথ্যপূর্ণ জীবনচরিত। এইভাবে 'জীবনচরিত'গুলি উপন্যাসের বক্তব্য ও কাঠামোর উপর প্রভাব ফেলেছিল। আবার একটি বিশেষ মানুষের জীবনের অ্যারিষ্টটল ঘোষিত আদি-মধ্য-অন্ত্যভাগকে সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করবার বিশিষ্ট শিল্পকৌশল চরিত-সাহিত্য লাভ করেছিল প্রধানতঃ নভেলের কাছ থেকে। সেজন্য জীবনচরিতগুলির কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বড়ো দান হল মধ্যযুগীয় রোমান্‌স থেকে ('Heroic Romance') নভেলকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারা। এই সূত্রে বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে ঐ ধরণের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে ১৮১৮ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য 'বঙ্গাল গেজেটি' এবং শ্রীরামপুরের মিশনারীরা 'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচারদর্পণ' প্রকাশ করেন। ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র 'Friend of India' তাঁরা একই সঙ্গে বার করেন। 'সমাচারদর্পণ' জানিয়েছিল যে "ইংগ্লণ্ড ও ইউরোপের অন্য ২ প্রদেশ হইতে যে ২ নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার" "লোকেরদের জন্ম বিবাহ মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া," "ইউরোপদেশীয় লোককর্তৃক যে ২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে এবং যে ২ নূতন পুস্তক মাসে ২ ইংগ্লণ্ড হইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যে ২ নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে" এবং "ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ" মুদ্রিত হবে (২৩শে মে, ১৮১৮)।

'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত কয়েকটি মৃত্যু-সংবাদ উদ্‌ধৃত করা গেল :

"মরণ॥ গোপীমোহনবাবু এতদ্দেশের মধ্যে অতি খ্যাত এবং সম্পত্তিতে

ও সন্ততিতে অখণ্ড ভাগ্যবান ও শিষ্ট ও অনুগত প্রতিপালক ও গুণজ্ঞ ও গুণবান ও প্রিয়ম্বদ ছিলেন তিনি নানা সুখবিলাসে ও সৎকর্মেতে ও পরোপকারেতে এতাবৎ কাল ক্ষেপণ করিয়া ১২২৫ সালের ১ আশ্বিন বুধবার ইহলোক পরিত্যাগ পূর্বক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপন সন্তানেরদের প্রতিপালনার্থে আশী লক্ষ টাকা রাখিয়া ও চিরজীবিনী কীর্তি সংস্থাপন করিয়া আপনি স্বকর্মানুযায়ি ফলভাগী হইয়াছেন।” (১৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ৪ আশ্বিন ১২২৫)

“মরণ॥ গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ইং ১৭ ফাল্গুণ বাং যশোহরের রাজা বাণীকণ্ঠ রায় মরিয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার পিতা শ্রীকণ্ঠ রায় এতদ্দেশে অতিখ্যাত এবং সংস্কৃত ও পারশী ও হিন্দী ও ইংরাজীতে বিদ্যাবান্ ছিলেন এবং তাঁহার গানশক্তি ও কবিতাশক্তি অতিশয় ছিল তাঁহার রচিত অনেক উত্তম ২ গান গায়কেরা অদ্যাপি গান করেন।” (১৩ মার্চ ১৮১৯। ১ চৈত্র ১২২৫)

“জেনরল স্টুয়ার্টের মৃত্যু॥ জেনরল স্টুয়ার্ট এই বাঙ্গালার পল্টন ভুক্ত ছিলেন তিনি প্রাচীন হইয়া কর্মচ্যুত হইয়াছিলেন সংপ্রতি তিনি কোন পীড়ার উপলক্ষে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন। এই স্টুয়ার্ট সাহেব এই বঙ্গদেশীয় ভাষার ধারার রীতি এমত অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং এমত বাঙ্গালিপ্রিয় ছিলেন যে সকলে ইঁহাকে হিন্দু স্টুয়ার্ট কহিত। সুতরাং ইনি বাঙ্গালিদিগের সহিত সতত আলাপন করাতে ও শাস্ত্র শ্রবণ করাতে বাঙ্গালিদিগের তাবৎ বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ইঁহার এমত সচ্চরিত্র এবং দয়া ছিল যে ইনি সদাসর্বদা লোকের উপকার করিতেন এবং শত ২ অনাথ ইঁহা হইতে প্রতিপালিত হইত। গত দুই বৎসরাবধি জেনরল স্টুয়ার্ট সাহেব চৌরঙ্গির নিজ বাটীতে বাস করিতেন ইহাতে এই বাঙ্গালার নানা প্রকার পুরাতন চমৎকার ২ দ্রব্য সকল অর্থাৎ উত্তম ২ প্রতিমা ও আভরণ ও অস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যে কেহ ইহা দেখিতে ইচ্ছুক হইতেন তাঁহাকে স্বয়ং আপনি কিম্বা লোকদ্বারা ঐ সব চমৎকৃত দ্রব্য দেখাইতেন। জেনরল স্টুয়ার্ট সাহেব ঐ সকল দ্রব্য আগামি শীতকালে বিলাতে লইয়া যাইতে মনস্থ

করিয়াছিলেন কিন্তু মৃত্যুতে তাঁহার এ আশা নিরাশা হইয়াছে।"
(১৯ এপ্রিল ১৮২৮। ৮ বৈশাখ ১২৩৫)

ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত obituary-র অনুকরণে এ ধরনের ছোট-বড়ো প্রচুর বিবরণ সকল সংবাদপত্রেই মুদ্রিত হত। এগুলির মধ্যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জীবনী রচনার বীজ রয়ে গেছে।

নভেল ও চরিতসাহিত্যের মধ্যেকার যোগ নির্ণয়কালে আমরা দেখিয়েছি উভয়েরই লক্ষ্য 'বিশ্বাস্য' (convincing) জীবন কাহিনী রচনা করা। প্রত ক্ষ বা 'অবজেকটিভ' দৃষ্টি উভয় রচনায় দেখা দেয়। সংবাদপত্রে তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ও ঘটনার বাস্তব ও বিশ্বাস্য বর্ণনা প্রকাশিত হত। তার থেকে বিশেষ বিশেষ মানুষের জীবনের ক্রম-ইতিহাস কখনো-কখনো ধরা যেত। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে চুঁচুড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদার নামে একজন বিখ্যাত ধনী ছিলেন। তিনি বদান্যতা ও জাঁকজমক উভয়ের জন্যই বিখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জালিয়াতির অপরাধে তিনি সাত বছর দ্বীপান্তরবাস দণ্ড লাভ করেন। সংবাদপত্রে তাঁর সম্বন্ধে যে-সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল তার কয়েকটি জুড়ে দিলে একটি সংক্ষিপ্ত চরিত চিত্র গড়ে উঠবে

২৯শে অক্টোবর ১৮২৫। ১৪ কার্তিক ১২৩২

> কীর্তি যস্য স জীবতি। পরম্পরা শুনা গেল যে সংপ্রতি মোকাম চুঁচুড়া শহরের মধ্যে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বাটীতে দুর্গোৎসব অতি বাহুল্যরূপে হইয়াছিল তাহার শৃঙ্খলা এবং ব্যয় দেখিয়া সকলেরই চমৎকার বোধ হইয়াছে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত থাল গাড়ু ঘটি বাটী ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল এবং গীত বাদ্য রোশনাই ও বাটীর সজ্জা যেখানে যাহা সাজে সেই স্থানে তাহা অনায়াসে দিয়াছিলেন কলিকাতা ভ বানীপুর চুঁচুড়া নপাড়া চন্দননগর প্রভৃতি নানা দিগ্দেশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়েস্থাদি এবং ইংরাজ প্রভৃতির নিকট নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইয়াছিল। (সমাচার দর্পণ)

Thursday, September 20 1827
Grand Nauches
Doorga Pooja Holidays
Baboo Prankissen Holder of Chinsurah

Begs to inform the Ladies and Gentlemen and the Public in General that he has commenced giving a Grand Nauch from this day that it will continue till the 29th inst. Those Ladies and Gentlemen who have received invitation cards are respectfully solicited to favour him with their company on the days mentioned above, and those to whom the invitation Tickets have not been sent (strangers to the Baboo) are also respectfully solicited to favour him with their company (Calcutta Gazette).

২০শে অক্টোবর ১৮২৭। ৫ই কার্তিক ১২৩৪

ঔষধ দান। শুনিলাম শহর চুঁচুড়া নিবাসী দ্বিজ মিষ্টভাষি শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয় বহুতর ধন ব্যয়পূর্বক নানা রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দীন দরিদ্র দ্রবিণহীন রোগিদিগকে ঐ ভেষজ দান দ্বারা আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া কে না ধন্যবাদ করিবেন। (সমাচার দর্পণ)

Thursday, March 12, 1829.

Judgement was pronounced on Monday in the case of Prankissen Holder for forgery when he was sentenced to be transported for seven years to Prince of Wales Island. (Calcutta Gazette).

শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যু-সংবাদ বা আনুষঙ্গিক তথ্য নয়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা কে কাকে পোষ্যপুত্র নিচ্ছেন, কার বিবাহ বা শ্রাদ্ধে কেমন ঘটা হচ্ছে, রাজা-মহারাজের মামলা-মোকদ্দমার ফলাফল কি হল, সব খবরই সংবাদপত্র থেকে লোকে পড়ত অথবা অপরের পড়া শুনত। যাদের খবর তারা জানতে পারছে, তাঁরা সকলেই সমকালীন মানুষ, ইতিহাসের পুরাণের বা রোমান্সের নন। কৌতূহলের সঙ্গে বিশ্বাস জাগাতে পারে এমন তথ্যের জন্যই সংবাদপত্র বা পুস্তিকার পাঠক আগ্রহী হয়। কাজেই 'আশ্চর্য বিবাহ', 'বৃদ্ধের বিবাহ' 'কন্যা বিক্রয়' 'বলাৎকার' 'এক নবীন যোগির উপাখ্যান' 'জাবনিক রুটিভক্ষণ' 'হাজি সাহেবের সং' 'কবিতাসঙ্গীত সংগ্রাম' 'কুস্তির লড়াই' প্রভৃতি খবর তখনকার পড়ুয়াদের যে খুবই মনোরঞ্জন করত তাতে আর সন্দেহ কি।[৬]

সমকালীন মানুষ ও ঘটনার বিবরণ জীবনী ও নভেল উভয়ের মধ্যেই দেখা যায়। সমাচার দর্পণে, (১৮২১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। ১৪ই ফাল্গুন ১২২৭ এবং ৯ জুন। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮ তারিখে) "বাবুব উপাখ্যান" প্রকাশিত হয়। দেওয়ান চক্রবর্তীর বংশের তিলক, পুত্র 'তিলকচন্দ্র' যথার্থ "বাবু", তিনি "ঘুড়ী বুলবুলি প্রভৃতি খেলাতে সদা মগ্ন থাকেন লেখা পড়ার দোকান আছে কিন্তু কবেন না।" তাঁর জীবন-চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে। এই রচনাটি যথার্থ 'বাবু'-র চবিত। এই ধরণের কাল্পনিক (fictitious) অথচ বিশ্বাস্য (convincing) আংশিক জীবনচিত্র 'সমাচার-দর্পণে' আরো অনেক বেরিয়েছিল। 'শৌকীনবাবু' (২৩ জুন ১৮২১। ১১ আষাঢ় ১২২৮), 'গুণাকরবাবুর বৃত্তান্ত' (৭ জুলাই ১৮২১। ২৫ আষাঢ় ১২২৮), 'বৈদ্যসম্বাদ' (১ সেপ্টেম্বর ১৮২১।১৮ ভাদ্র ১২২৮) প্রভৃতি রচনা তারই দৃষ্টান্ত। এদের কোনো-কোনোটি সম্পাদকের কাছে লিখিত পত্রাকারে প্রকাশিত। এখানে চিঠিপত্রকে বিদ্রূপাত্মক চরিত-চিত্র তৈরীর কাজে লাগানো হয়েছে।

'বাবুব উপাখ্যানে'র পরিণতি প্রমথনাথ শর্মা বা ভবানীচরণেব 'নববাবু বিলাসে' (১৮২৫)। 'নববাবু বিলাস' তাঁর সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় (প্রথম প্রকাশ ১৮২২) প্রকাশিত হয়নি, একবারে বই হিসাবে ছাপা হয়েছিল। 'বাবুব উপাখ্যান' খুব সম্ভব ভবানীচবণেরই রচনা। 'বিলাস' যুক্ত নামের বই 'নরোত্তম বিলাস' 'প্রেমবিলাস' 'করুণানিধানবিলাস' প্রভৃতি পূর্বেই ছিল। এবার সে যুক্ত হল 'বাবু' চরিতে। 'নববাবুবিলাস' বইখানি 'অঙ্কুব, পল্লব, কুসুম ও ফল' এই চারখণ্ডে সম্পূর্ণ। এর অধ্যায়গুলির তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে যে, 'বাবুব উপাখ্যান' রচনাটি 'নববাবুবিলাসে'র পূর্বরূপ এবং 'আলালের ঘরেব দুলালে' তারই পরিণতি।[৭] নববাবুবিলাসেব সমালোচনায় বাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' লিখেছিলেন :

> "যে সময়ে তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল তৎকালে বর্ণিত বাবুর আদর্শ কলিকাতায় অপ্রাপ্য ছিল না। অল্পকালে হতপিতৃ অনেক ধনাঢ্যের চরিত্র অবিকল গ্রন্থোক্ত নববাবুর প্রতিরূপ মনে হইত।"

ভবানীচরণেব বচিত অপর গ্রন্থ, 'দূতীবিলাস' সম্পর্কে রাজেন্দ্রলাল লেখেন :

> "অতঃপর সুবিখ্যাত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন দোষী পরিবারের নিগঞ্জনার্থে দূতীবিলাস নামে একখানি কাব্য প্রস্তুত কবেন।"[৮]

এগুলি বিদ্রূপাত্মক চরিত রচনার নিদর্শন।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকৃতপক্ষে 'কল্পিত' মতিলাল-বাবুর জীবনচরিত। অর্থাৎ সাধারণ জীবনচরিতে এক ব্যক্তির জন্ম, বিদ্যাভ্যাস, বিবাহ, কর্মজীবন প্রভৃতি যেমন পর-পর বর্ণিত হয়ে থাকে, 'আলালের ঘরেব দুলালে' অনুরূপ রীতি গৃহীত হয়েছে। ফলে নভেল ও চরিতসাহিত্য উভয়ের কিছুটা মিল ঘটেছে এই পর্যায়ের বইগুলিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৮৩) ব্যঙ্গবর্ষী রচনা তবে উচ্চাঙ্গের রচনা আদৌ নয়। মনে হয় দীনবন্ধু-সৃষ্ট 'ঘটিরাম ডেপুটি'র অনুসরণে বঙ্কিম 'মুচিরাম' নাম করেছিলেন। তিনি এই উগ্র বিদ্রূপাত্মক রচনাটিকে 'চরিত' শব্দ যুক্ত করায় সেকালে অনেকে এই রচনার মধ্যে সমকালীন কোনো-কোনো ব্যক্তির ছায়া দেখেছিলেন বলেই বঙ্কিমচন্দ্রকে বলতে হয়েছিল :

> 'সাধারণ সমাজ ভিন্ন কাহারও প্রতি ইহাতে ব্যঙ্গ নাই। ইহাতে পাঠক যেরূপ মনুষ্যচরিত্র দেখিবেন, সেরূপ মনুষ্যচরিত্র সকল সমাজে সকল কালেই বিদ্যমান।'

বঙ্কিমচন্দ্র মুচিরামের জন্ম থেকে 'রাজা' খেতাব লাভ পর্যন্ত জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করে গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এই রচনার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু 'সত্য' আছে বলে পাঠকেরা যে মনে করেছিল তার অন্যতম কারণ বঙ্কিমের অদ্ভুত এক ছদ্মনাম গ্রহণ, "শ্রীদর্পনারায়ণ পূতিতুণ্ড"।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার সামাজিক বিদ্রূপাত্মক নক্‌শা রচনায় অনেকেই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রমথনাথ শর্মা', প্যারীচাঁদ মিত্র 'টেকচাঁদ ঠাকুর', কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম', ও বঙ্কিমচন্দ্র 'দর্পনারায়ণ পূতিতুণ্ড' নামধারণ করেছেন। ছদ্মনামের আড়ালে থেকে ব্যঙ্গ-শর নিক্ষেপ করা স্থান-কাল-পাত্রের দিক থেকে সবচেয়ে সুবিধাজনক। অন্যদিকে ছদ্মনামে প্রকাশিত হলে সে-রচনা সাধারণ-পাঠক মহলে অধিকতর ঔৎসুক্য ও রোমাঞ্চ সৃষ্টি করত। রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে সমাচার দর্পণে (৬ই এপ্রিল, ১৮২২) যে 'চারি প্রশ্ন' বার হয়েছিল তার প্রশ্নকর্তা নিজে 'ধর্মসংস্থাপনাকারী'র ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন। সমাচার চন্দ্রিকা প্রেস থেকে ১৮২৩ সালে যে 'পাষণ্ড-পীড়ন' গ্রন্থ বার হয়েছিল সেখানেও অনুরূপ রীতি দেখা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমূলক রচনাগুলি বেনামীতে লিখেছিলেন।[৯] কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৭-১৯০৭) নিজের আত্মকথা লিখেছিলেন 'রাঃ সের

ইতিবৃত্ত' নামে (ঢাকা, ১৮৬৮) 'বামচন্দ্র দাস' তাঁব 'বাশ-নাম'। ছদ্মনামে প্রচাবিত হওয়ায় বইটি সম্পর্কে পাঠকদেব কৌতূহল বেড়েছিল।

নভেল ও ব্যঙ্গাত্মক বচনাকে 'চবিত' শব্দ যুক্ত কববাব দৃষ্টান্ত দেখতে পাই ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) 'ডমরু চবিত', (গ্রন্থাকাবে প্রকাশ, ১৯২৩) যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুব (১৮৫৪-১৯০৫) 'চিনিবাস চবিতামৃত' (১৮৯০), বাঙ্গালীচবিত (১৮৮১-৮৬) মহীবাবণেব আত্মকথা (১৮৭৭) বইগুলিতে। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবেব বেনল্ডকৃত 'জোসেফ উইলমট' অবলম্বনে বচিত 'হবিদাসেব গুপ্তকথা' বা 'আমাব গুপ্তকথা' (১৮৭২-৭৩) বইয়েব নাম এই সূত্রে কবা যেতে পাবে। এত জনপ্রিয়তা আব কোনো বইয়েব হয়নি।

পাদটীকা

১ সংবাদ প্রভাকব, বুধবাব ১ অগ্রহায়ণ, ১২৬১

২। শ্রীসুকুমাব সেন, বটতলাব বেসাতি, বিশ্বভাবতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৫।

৩। 'Truth is Stranger ,Robert Littell, compiled in 'Biography as an Art' Ed, by James L. Clifford, Oxford University Press 1962

৪। Nicolson Harold, The Development of English Biography, Ch. I

৫ Watt Ian, The Rise of the Novel, Ch. I 1957

৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, সংবাদপত্রে সেকালেব কথা ১ম ও ২য় খণ্ড।

৭। শ্রীদেবীপদ ভট্টাচায, 'উপন্যাসেব কথা', ১৫০-১৫১ পৃঃ।

৮ বিবিধার্থ সংগ্রহ, ৬০ খণ্ড।

৯। 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য, 'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ', 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচবস্য'।

॥ চিত্তের নবজাগরণঃ ব্যক্তির মুক্তি ॥

কিন্তু চারপাশের পরিচিত মানুষের প্রতি জাগরিত কৌতূহল-বোধ বা তাদের জীবনের বিভিন্ন তথ্য জানবার আগ্রহ, আর মানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ এক কথা নয়। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নবজাগরণের অন্যতম প্রধান ধর্ম। পাশ্চাত্য বনিকদের সংস্পর্শে এসে, নাগরিক জীবন, বৈষয়িক সমৃদ্ধি, স্বচেষ্টায় ধনার্জনের আস্বাদ এক শ্রেণীর বাঙালী লাভ করেছিল। ফলে সেদিনের সমাজে দেখা দিল 'Economic Man'-এর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। কাজেই সেদিনের সমাজে 'ইহ-চেতনা' জাগ্রত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু 'ইহ-চেতনা' ও 'মানব-স্বীকৃতি' সমকালীন হলেও একার্থক নয়। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার দর্শন আমাদের জেগেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত সংযোগের ফলে। মানুষ নিজের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ না করলে, নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করতে না পারলে দেবতা, পুরোহিত ও স্বর্গের দরজায় মাথা কোটে। কিন্তু রেণেসাঁসের মুখ্য ধর্ম ছিল ব্যক্তি-মানুষের নিজের শক্তি আবিষ্কার। এই সম্পর্কে জনৈক মনীষী লিখেছেন ঃ

> "It was a discovery of no less importance than the discovery of a new continent on our globe and of new worlds in the heavens."[১]

মানুষের এই শক্তি-আবিষ্কার সম্ভব করে তোলে মুখ্যত যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। তার ফলে সমাজে এল Intellectual Man-এর চিত্ত-স্বাতন্ত্র্য। বাঙালীদের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে রামমোহন রায় ও ঈষৎ-পরবর্তী কালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার স্রোতকে আবাহন করে নিয়েছিলেন। ১৮২৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্টকে যে ঐতিহাসিক পত্র লেখেন, সেখানে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছিলেন বাংলাদেশের শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করে দ্বিতীয় একটি সংস্কৃত কলেজ খুলে, মায়াবাদী বেদান্ত পড়িয়ে যেন তরুণদের আর বিভ্রান্ত করা না হয়। তার চেয়ে তাদের যেন 'Mathematics, Natural Philosophy,

Chemistry, Anatomy and other useful sciences which the natives of Europe have carried to a degree of perfection' পড়ানো হয়। এই সূত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, যে-রামমোহন 'বেদান্তগ্রন্থে'র রচয়িতা তিনিই বেদান্ত-শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন এবং এই পত্রে ইংলণ্ডে নব্যচিন্তার প্রবর্তক ফ্রানসিস্ বেকনের (১৫৬১-১৬২৬) নামের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে লিখেছেন :

> "If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance"

বেকন-পূর্ব যুগকে তিনি সংগতভাবেই অজ্ঞানতার যুগ বা Age of Ignorance বলে মনে করেছেন। বেকনের বহুকথিত ঘোষণা 'Knowledge is power' অর্থাৎ 'জ্ঞানই শক্তি' নবযুগের ধর্মকে বহন করেছে। দর্শনকে দাঁড়াতে হবে 'reason' বা যুক্তিবাদের উপর, বেকনের এই চিন্তা দর্শনকে অধ্যাত্মবিদ্যা (theology) থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। বিজ্ঞানের প্রতি আস্থাপোষণের ফলে তিনি তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন মানুষের 'ভ্রান্তি' মূলত পঞ্চবিধ, যাদের তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন 'idols' এখানে বলা অসঙ্গত হবে না যে, বেকন নাস্তিকতা ও অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে ররং নাস্তিকতাকে কম-ক্ষতিকর বলে মনে করতেন। এই সূত্রে বলা যায় রামমোহন প্রকৃত 'Religion' বা ধর্মের সঙ্গে লক ও নিউটনের মত বিরোধ কল্পনা করেন নি :

> "Did such philanthropists as Locke or Newton oppose Religion? No."[২]

দ্বিতীয়-সংস্কৃতকলেজ স্থাপন এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র-অধ্যাপনার বিরোধিতা করেছিলেন রামমোহন। ঐ পত্র প্রেরণের ঠিক ত্রিশ বৎসর পরে (১৮৫৩, ২৯শে আগস্ট) বিদ্যাসাগর মহাশয় কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্যালান্টাইনকে জানিয়েছিলেন যে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি বিভাগে বার্কলের (১৬৮৫-১৭৫৩) 'Inquiry' না পড়িয়ে মিলের 'Logic' [System of Logic] পড়ানোই শ্রেয়। কেন না, তাঁর মতে বেদান্ত ও সাংখ্য

ভ্রান্তদর্শন এবং বার্কলের দর্শন বেদান্ত ও সাংখ্যের সম-মতাশ্রয়ী। কাজেই ঐ দর্শন না পড়িয়ে 'advancing science of Europe' পড়াতে হবে।[৩] বলাবাহুল্য এ সবই বেকনীয় দৃষ্টির সাক্ষ্যবহ। যে মনীষী মিলের কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছেন তিনি বেকনেরই শিষ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত কলেজের ছাত্র রামকমল ভট্টাচার্য (১৮৩৪-৬০) ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২) ভ্রাতৃদ্বয় নবযুগের যুক্তিবাদী দর্শন দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রামকমল 'বেকন অর্থাৎ তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ' গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুর পর গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। জন স্টুয়ার্ট মিলের 'ন্যায়দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ দৃষ্টে' তিনি বাংলায় একখানি বই লেখেন। তিনি কঁৎ ও মিলকে 'গুরুদেবের ন্যায় ভক্তি' করতেন। তিনি ঘোরতর নাস্তিক ছিলেন, ঈশ্বর বা পরকাল কিছুই মানতেন না। কৃষ্ণকমল কঁৎ-ব্যাখ্যাত 'পজিটিভিজমে' বিশ্বাসী ছিলেন।[৪] 'Reason, এবং 'Faith' এই দুইটির মধ্যে তাঁরা 'Reason'কে বেছে নিয়েছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যখন এই মনোভাব দেখা দিয়েছে তখন 'হিন্দু কলেজে'র ইয়ং বেঙ্গলদের কথা অতি সহজেই অনুমেয়। বেকনের 'Essays' তাঁদের নির্দিষ্ট পাঠ্য ছিল। ইয়ং বেঙ্গলদের দীক্ষাগুরু ছিলেন ডিরোজিও (১৮০৯-৩১)। তাঁর গুরু ড্রুমণ্ড ছিলেন দার্শনিক হিউমের শিষ্য। তিনি বেকন, লক ও হিউমের পন্থা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর ছাত্রদের মনে জাগিয়ে দিয়েছিলেন 'সংস্কারে'র আনুগত্যবর্জন ও যুক্তিবাদ গ্রহণ। চিন্তাজাত-বিপ্লব, স্বাধীনতা-স্পৃহা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য দর্শন তিনিই তাদের মধ্যে উজ্জীবিত করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ডিরোজিও সম্পর্কে লিখেছেন :

> "He used to impress upon them the sacred duty of thinking for themselves—to be in no way influenced by any of the 'idols' mentioned by Bacon—to live and die for truth—to cultivate all the virtues, shunning vice in every shape. He often read examples from ancient history of the love of justice, patriotism, philanthropy and self-abnegation, and the way in which he set forth the points stirred up the minds of his pupils."

হিন্দু কলেজের পরিচালকগোষ্ঠীর রক্ষণশীল অংশ রামকমল সেনের নেতৃত্বে মিথ্যা অপবাদ উত্থাপন করে তাঁকে ১৮২৮ সালে কর্মচ্যুত করেন। ডিরোজিও তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের প্রতিবাদে হোরেস হেম্যান উইলসনকে যে দ্বিতীয় পত্র পাঠান তার মধ্যে তিনি বেকনের কথা উল্লেখ করেছেন :

> "I can vindicate my procedure by quoting no less orthodox an authority than Lord Bacon 'If a man' says this philosopher (and no one even had a better right to pronounce an opinion upon such matters than he) 'will begin with certainties, he shall end in doubts' ৬

হুগলী কলেজের ছাত্র হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-৮৪) 'Bacon's Essay on Truth' সন্দর্ভের অনুবাদ করে ১৮৪১ সালে লর্ড অকল্যাণ্ডের কাছ থেকে কপোর ঘড়ি পুরস্কার পান। ডিরোজিও বেকনের উপর একটি সনেট রচনা করেন 'Sonnet on the Philosophy of Bacon.' ৭ ১৮২৮ সালে হিন্দু কলেজের কর্মত্যাগ করবার পর তিনি 'East Indian Association' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সংকল্প করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল 'to promote their intel'ectual, moral and political improvement'. এই প্রতিষ্ঠানের যে Prospectus বা ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল তার শিরোদেশে মুদ্রিত ছিল "Knowledge is power —Lord Bacon" (১৮২৯, ১১ই জুন)। 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' নামে একখানি পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন

ডিরোজিও ছাড়া বেকনের মতবাদ প্রচারে সহায়তা করেছিলেন বিভাবেও টি স্মিথ ও হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার। তাঁরা পৃথক ভাবে বেকনের Novum Organum ('The New Logic') গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন (১৮৪৮)।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত (১৮১৯ ৬৭) তাঁর ছাত্রজীবনে বন্ধু ভবানীপ্রসাদ দত্তের সঙ্গে যুগ্মভাবে বেকনের প্রবন্ধগুলি সহজ বাংলায় প্রচার করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত সংশয়বাদী ও যুক্তিপন্থী ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন :

"ভাস্কর ও আর্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ বিষয়

উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাস্ত্র, গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কোমত (Comte) যে কোনও প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাস্ত্র।"

বেকনের সঙ্গে চিন্তানায়ক লকের নামও স্মরণীয়। কেন না, লক (১৬৩২-১৭০৪) তার মতবাদে 'যুক্তি' বা 'Reason'কেই বড়ো বলে জেনেছিলেন। যেখানে 'light of nature' পদপ্রয়োগ করেছেন সেখানে প্রকৃতপক্ষে তিনি 'reason'কেই বোঝাতে চেয়েছেন। অন্যদিকে লক 'divine right of kingship' তত্ত্বের বিরোধী এবং মানুষের 'natural rights' বা স্বাধিকার-তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে 'to preserve himself and to defend his life, and he has right to his freedom.'[৯] একদিকে 'যুক্তিবাদ' অপরদিকে 'স্বাধীনতাস্পৃহা' লকের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ইয়ং বেঙ্গলরা। ঠিক এই কারণেই টোমাস পেইনের 'Age of Reason' এবং 'Rights of Man'. ইয়ং বেঙ্গলদের মনপ্রাণ অধিকার করেছিল। 'Age of Reason' বইখানি কিয়দংশ অনূদিত হয়ে সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়েছিল।[১০] ১৮৩০ সালে কলিকাতায় আগত খৃষ্টান পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ পূর্বোক্ত বই দুখানি এবং হিউম ও গিবনের লেখার তীব্র নিন্দা করেছেন কেননা তারা এদেশীয় যুবকদের মনে খৃষ্টধর্ম-বিরোধিতা, বৈপ্লবিক চিন্তা এবং সংশয়বাদ জাগিয়ে তুলেছেন।[১১] প্রসঙ্গত বলা চলে ১৮৮৮ সালের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আশঙ্কার সঙ্গে লেখা হয়েছিল

> "Some years ago, Huxley's 'Life of Hume' was a part of the B. A. Course, in which the young men of India were told that there was no God, no future state and that death was an eternal sleep."

বেকন, লক, হিউম ও পেইনের রচনায় মধ্যযুগীয়তার মোহমুক্ত নতুন জীবনদর্শনের সন্ধান পেয়েছিল উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের তরুণ বাঙালী। তারই সঙ্গে অনিবার্যভাবে এসেছিল দেশপ্রীতি। ইতালীয় নব-জাগরণের 'প্রথম আধুনিক মানুষ' পেত্রার্কের মধ্যেও শুনেছি স্বদেশবন্দনা। ডিরোজিও তাঁর কবিতায় ভারতবর্ষকে সম্বোধন করে লিখেছেন 'My

Country !' তাঁর অন্যতম শিষ্য কাশীপ্রসাদ ঘোষ 'ইণ্ডিয়া গেজেট' (১৮৩০ ১৭ই ফেব্রুয়ারি) পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতায় লিখেছিলেন :

"Land of the Gods and lofty name ,
Land of the fair and beauty's spell ,
Land of the bards of mighty fame,
My native land ! for e'er farewell !"

কাশীপ্রসাদ এই দেশপ্রীতিবশতঃ জেমস্ মিলের 'History of British India গ্রন্থে ভারতবাসীদের সম্পর্কে ব্যবহৃত কয়েকটি মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। তিনি A Sketch of Ranjit Singh নামে একটি ঐতিহাসিক-জীবনীমূলক প্রবন্ধ ক্যালকাটা ম্যাগাজিনে (১৮৩০, ৫ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যা) প্রকাশ করেন।

'দৈব' তথা 'সংস্কারের' প্রতি আনুগত্যবর্জন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাস ইয়ং বেঙ্গলদের মূলমন্ত্র ছিল। য়ুরোপীয়দের চেয়ে তাঁরা যে কোনো অংশে ছোটো নন একথাটি তাঁরা তাঁদের চিন্তায়, রচনায় ও আচরণে বারংবার বুঝিয়ে দিতেন। রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০) সম্পর্কে আমরা জানতে পারি তিনি গো-মাংস ভক্ষণ করতেন আর 'ইনি অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেন না। এ নিমিত্ত দুষ্টস্বভাব ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার বনিত না। সর্বদা তাহাদিগের সহিত তাঁহার মুষ্টিযুদ্ধ হইত।'[১২] তাঁরা দেরাদুনে থাকবার সময় ১৮৪৩ সালের ১৫ই মে তারিখে সার্ভে অফিসের কুলীদের বাধ্য করা হয় ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যবহার্য মালপত্র বহন করতে। রাধানাথ মালপত্র আটকে রাখেন। খবর পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর এক সামরিক কর্মচারী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসে চোখ রাঙান। কিন্তু রাধানাথ টলেন নি। হঠাৎ সামরিক কর্মচারিটি খেপে গিয়ে বলেন : "Who the devil are you ?" রাধানাথ উত্তরে বলেন : "A man, and so are you."[১৩] 'A man' এই প্রত্যুত্তরটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

ডিরোজিও-র শিষ্যেরা রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই ঐ ধাতুতে গড়া ছিলেন। সকলেই লকের ব্যাখ্যাত 'Natural Rights'কে বড়ো বলে মেনেছিলেন। এঁরা সকলেই ডেভিড হেয়ারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তার কারণ হেয়ার মানব-পন্থী ও সংশয়বাদী বা নাস্তিক ছিলেন, শিক্ষাবিস্তার ও নরকল্যাণই তাঁর ধর্ম, দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি

ছিলেন যুক্তিবাদী। কাজেই ইয়ং বেঙ্গলদের 'Hero-worship' স্বভাবতই হেয়ার, ডিরোজিও, রামমোহন প্রভৃতির উদ্দেশে গড়ে উঠেছিল।

নতুন যুগের ভাবচর্চার জন্য ডিরোজিওর শিষ্যদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল 'অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েসন' (১৮২৮)। পরে একই উদ্দেশ্যে তাঁদের দ্বারাই Society for the Acquisition of General Knowledge বা 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' ১৮৩৮ সালের ১২ই মার্চ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪০ থেকে ১৮৪৩ পর্যন্ত এই তিন বছরে যে-সব প্রবন্ধ সভার অধিবেশনগুলিতে পঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে পাই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "On the Nature and Importance of Historical Studies", মহেশচন্দ্র দেবের "Condition of Hindu Women", প্যারীচাঁদ মিত্রের "State of Hindustan under the Hindus", গোবিন্দচন্দ্র সেনের "Brief Outline of the History of Hindustan" প্রভৃতি ইতিহাসচর্চার নিদর্শনবহ রচনা। এগুলি মৌলিক রচনা, কারো অনুবাদ নয়। এই প্রসঙ্গে ইয়ং বেঙ্গলদের নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তী-কৃত হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের 'আসাম বুরঞ্জি'র সমালোচনাটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিছক 'tradition'-ভিত্তিক ইতিহাসকে মূল্যবান বলে জ্ঞান করেননি।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের "পুরাবৃত্তে কোন পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত, তাহা নির্ধারিত না থাকাতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বৎসরের ভিতর পড়িতে হইত :

Hume's History of England. (Unabridged)
Gibbon's Roman Empire. (Unabridged)
Mitford's History of Greece.
Fergusson's Roman Republic.
Elphinstone's India.
Russel's Modern Europe.

সর্বশুদ্ধ প্রায় ছত্রিশ ভলুম হইবে।"

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯) প্রদত্ত এই পাঠ্যতালিকা দেখলেই বোঝা যায় তখনকার হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ইতিহাস-অধ্যয়ন কতো ব্যাপক ছিল। পূর্বোক্ত রচনাগুলি ইতিহাস-অধ্যয়নজাত দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষ্যবহ। ইতিহাসের

চর্চা চরিতসাহিত্য সৃষ্টির পূর্বসূবী। তখনো বাংলাভাষায় উচ্চাঙ্গেব মৌলিক বচনা প্রণয়নের আকাংক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষিত গোষ্ঠীব মধ্যে প্রবল হয়নি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে পূর্বেব তুলনায় এখন অর্থাৎ ১৭৭২ শকে (১৮৫০) হিন্দু কলেজেব ছাত্রদেব ইতিহাস কম পড়ানো হয। উক্ত পত্রিকাব মতে—

> "অন্ততঃ তাহাবদিগের প্রাচীন ও আধুনিক সমুদায় প্রধান প্রধান রাজ্যেব ইতিহাসে একপ্রকাব দর্শন থাকা উচিত। পূর্বে হিন্দু কালেজেব এইপ্রকাব নিযমই নিরূপিত ছিল। তাহাতে কোন কোন ছাত্র ইতিহাসবিদ্যায় এরূপ পরীক্ষাপ্রদান ও এ প্রকাব পাবদর্শিত্ব প্রদর্শন কবিযাছিল যে অনেকানেক খ্যাতবিদ্য ইংবাজে তাহা দৃষ্টি কবিয়া উল্লেখ কবেন যে, আমবা এ সকল বিষযে জিজ্ঞাসিত হইলে এ প্রকাব উত্তর প্রদানে সমর্থ হইতাম কিনা সন্দেহ।"

ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতিব চর্চা ইযং বেঙ্গলেবা কবেছেন মুক্তবুদ্ধি নিযে। এ সবই ইহ-লোকাশ্রিত-দর্শনেব প্রতি শ্রদ্ধাব ফল। বাষ্ট্র, ব্যক্তি ও সমাজেব পাবস্পবিক সম্পর্ক নির্ণযেব যে চেষ্টা তাঁবা কবেছিলেন তাব প্রেবণা যুগিযেছিলেন পাশ্চাত্য চিন্তাবিদেবা।

ঊনবিংশ শতকেব প্রথম ভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষায শিক্ষিত গোষ্ঠীব হাতেই যথার্থ Biography বা জীবনচবিত গড়ে তুলবাব চেষ্টা চলেছে। তবে তাঁদেব সেই ভাষণগুলি বা মুদ্রিত চরিত-প্রবন্ধগুলি স্বভাবতই ইংবেজি ভাষায বচিত হয়েছে, বাংলায নয। তাবা 'আধুনিক' যুগেব প্রবণতাগুলি সবই আত্মস্থ কবেছিলেন। জীবনচবিত তাদের কাছে ড্রাইডেন-ব্যাখ্যাত 'Lives of Particular Men' ছাড়া অন্য কিছু নয়। তখনকাব দিনে বিশেষ-বিশেষ বরণীয মানুষের তিবোধানেব পব অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভাব কার্যাবলী ও প্রদত্ত ভাষণ সবই চলত ইংবেজি ভাষায।

ঊনবিংশ শতকেব প্রথম দিকে যে-সব জীবনচবিত-বিষযক বই ইংলণ্ড থেকে কলিকাতায় আমদানি কবা হয়েছিল এই প্রসঙ্গে তাব কিছু-কিছু উল্লেখ কবা দবকাব। কেননা ঐ ইগুলিব উল্লেখ থেকে বোঝা যাবে সেদিনকাব পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ব্যক্তিরা কোন বইগুলি পড়ে জীবনচবিত সম্পর্কিত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বচনারীতি গড়ে তুলেছিলেন। শুধু ১৮২৫ সালেব 'Bengal Hurkaru' পত্রিকাব কয়েক মাসেব বিজ্ঞাপন থেকেই

জানা যায় যে, St, Andrew's Library এবং Hurkaru Library এই দুটি পুস্তক-বিক্রয় প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত চরিত-বিষয়ক বইগুলি আনিয়েছিল :

১. Memoirs of Henry the Great ot the Court of France,
২. Captain Lyon's Private Journal during the recent voyage of discovery under Captain Parry.
৩. Memoirs of Captain Rock, the celebrated Irish chieftain with some account of his ancestors.
৪. Stottowe's Life of Shakespeare.
৫. The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner.—Written by himself.
৬. Beginnings of Biography, being the lives of one hundred persons,
৭. Fielding's works, Essay on his Life and Genius.
৮. Goldoni's Memoirs written by himself (translated by Black).
৯. Tomline's Memoirs of the Life ot Rt. Hon. William Pitt.
১০. Horace Walpole's Private Correspondence now first Collected.
১১. Gibbon's Decline and Fall ot Roman Empire.
১২. Boswell's Life of S. Johnson 2 Vols.
১৩. Boswell's Life of S. Johnson 5 Vols.
১৪. Biographica Dramatica—4 Vols.
১৫. Hayley's Lite of George Romney.
১৬. Works of Benjamin Franklin with Memoirs of his Life and Writings and Private Correspondence. 6. Vols.
১৭. Plutarch's 'Lives' translated from the Greek with Notes Historical and Critical by Langhornes. 6 Vols.
১৮. Campan's Memoirs of the Private Life of Marie Antoinette with Recollections, Sketches and Anecdotes illustrative of the reigns of Louises XIV, XV, XVI. 2 Vols.

১৯. Voltaire's History of Charles the XII. Peter the Great.

২০. Gifford's Life of Duke of Wellington.

২১. Roger's Lives of twelve Ceasars. 5 Vols.

২২. Goldsmith's works with an account of his Life and Writings.

২৩. Northcote's Life of Sir Joshua Reynold,

২৪. Standish's Life of Voltaire with interesting particulars respecting his Death, and Anecdotes and Characters of his contemporaries.

২৫. Clarke's and M' Arthur's Life of Admiral Lord Nelson.

২৬. Anecdotes, Biographical Sketches and Memoirs, Collected by L. Matilda Hawkins.

২৭. Chalmer's Biographical Dictionary—ইত্যাদি বহু বই।

১৮২৫ সালের আমদানি এই বইগুলির নাম দেখলেই বোঝা যাবে তখন চরিতবিষয়ক গ্রন্থের অপ্রতুলতা ছিল না এবং প্লুটার্ক, ভল্টেয়ার, জনসন্, গিবন্, বস্ওয়েল—সকলের লেখাই এসে পৌঁচেছে। এই প্রসঙ্গে ইংরেজি চরিতসাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা অযৌক্তিক হবে না।

টোমাস নর্থের অনূদিত প্লুটার্কের 'Lives' (১৫৭৯) অথবা ড্রাইডেনকৃত প্লুটার্কের জীবনী (১৬৮৩) ইংরেজি চরিতসাহিত্যে খুবই উল্লেখযোগ্য রচনা। কিন্তু অষ্টাদশ শতকেই যথার্থ চরিত ও আত্মচরিতের রূপগত ও গুণগত উৎকর্ষ ঘটে ইংরেজি সাহিত্যে। তার পূর্বে 'পিউরিটান যুগে' (১৬২০-১৬৬০) চরিতসাহিত্যের চর্চা খুব বেশি হয়নি। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে রক্তপাতহীন বিপ্লবের পর থেকে (১৬৮৮) নাগরিক ও গণতান্ত্রিক মনোভাব, সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গি, মানবীয় বোধ, যুক্তিপন্থা সবই প্রতিষ্ঠালাভ করতে থাকে—ঐতিহাসিকের ভাষায়—"A cat might now look at a king, he might even scratch,"

সপ্তদশ শতকের শেষে চরিত-প্রবন্ধ রচয়িতা হিসাবে আইজাক ওয়াল্টন্ (১৫৯৩-১৬৮৩) ও টোমাস স্প্রাটের (১৬৩৫-১৭১৩) নাম উল্লেখযোগ্য। ওয়াল্টনের 'Lives' পাঁচটি চরিত-প্রবন্ধের সংকলন, Life of Donne (১৬৪০), Life of Sir Henry Wotton (১৬৫১), Life of Richard

Hooker (১৬৬৫), Life of George Herbert (১৬৭০) ও Life of Sir Sanderson (১৬৭৮)। প্লুটার্কের 'Lives'-এর অনুকরণে তিনি তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছেন। তাঁর এই চরিত-প্রবন্ধগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য, তিনি জীবনী-রচনায় চিঠিপত্র, উইল,স্বরচিত কবিতা প্রভৃতির সহায়তা নিয়েছেন এবং অষ্টাদশ শতকে ম্যাসন, জন্‌সন ও বস্‌ওয়েল এই রীতি স্বীকার করেছেন। ওয়াল্‌টনের দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ অবরোহ (deductive) পদ্ধতির। কিন্তু স্প্রাটের দৃষ্টিভঙ্গি আরোহ (inductive) পদ্ধতিমূলক। তাঁর রচিত 'Life of Cowley' (১৬৬৮) বেশ 'অব্‌জেকটিভ' জীবনী কিন্তু তার মধ্যে প্রাণের উত্তাপ নেই। ওয়াল্‌টন যখন ডানের চরিত-প্রবন্ধ লেখেন সেখানে চরিত্রটিকে 'মানুষ' করে তুলবার জন্যই তাঁর চিঠিপত্র বা কবিতার সাহায্য নিয়েছিলেন। স্প্রাট্ এই রীতির বিরোধী ছিলেন। পিউরিটানী হাওয়া তাঁর পালে বেশি লেগেছিল। অতএব রচিত-জীবনী যাতে পাঠকমনে 'নৈতিক প্রভাব' বেশি বিস্তার করতে পারে—জীবনী রচয়িতার সেদিকেই স্থির লক্ষ্য থাকা দরকার এমন মনোভাবই তাঁর ছিল। এজন্য কোলরিজ তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন।

সপ্তদশ শতকের শেষে প্লুটার্কের 'Lives' গ্রন্থের ভূমিকায় (Preface) ড্রাইডেন লিখেছিলেন, জীবন-চরিতে ভালোয়-মন্দয় মেশানো যে মানুষ তার সঙ্গেই আমাদের পরিচয় হয়ঃ

> "are made acquainted with his passions and his follies ; and find the demi-god a man."

দেখা যাচ্ছে চরিত-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য-সূত্রটি তিনি ধরে দিয়েছিলেন, কিন্তু বোধ করি জন্‌সনের রচনাতেই এই দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক প্রয়োগ লক্ষিত হয়। তিনি বলতে পেরেছিলেনঃ

> "men and women are my subjects of inquiry ; let us see how these differ from those we have left behind."

সপ্তদশ শতকে পাশ্চাত্য সমাজে জনসাধারণের মনে 'ব্যক্তি' বা 'ব্যষ্টি' সম্পর্কে সেই কৌতূহল জাগেনি, যেমন জাগ্রত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে। ইংলণ্ডে ফ্রান্‌সিস বেকন ও ড্রাইডেন কর্তৃক চরিত-সাহিত্য সম্পর্কে স্মরণীয় প্রশংসা সত্ত্বেও তার প্রসার ঘটেনি। বাহিরের দিক থেকে নাগরিক সভ্যতার

বিস্তার 'ব্যক্তি' বা Individual গড়ে উঠতে সহায়তা করেছিল ঠিকই। তার সঙ্গে 'রিফরমেশন'-আন্দোলন থেকে এসেছিল ভিতরের প্রেরণা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ। মানুষের মনে নতুন জিজ্ঞাসা নতুন প্রশ্ন জেগেছিল 'মানুষ' সম্পর্কে। কী ভাবে লেখা হবে একজন মানুষের জীবনী? তাঁর বাহিরের ও ভিতরের জীবন, তুটি দিকই কি দেখাতে হবে?

তার জবাব দেবার যোগ্য প্রয়াস করেছিলেন রজার নর্থ 'Life of the Lord Keeper North' লিখে। তিনি প্লুটার্কের মতোই জীবনী-সাহিত্যের লক্ষ্য ধরেছিলেন 'entertainment' ও তৎসহ 'moral instruction' দান করা। তবু তিনি ইতিহাস ও চরিতের ভেদ-রেখা তাঁর পূর্ববর্তী বেকন বা ড্রাইডেনের চেয়ে আরো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর মতে ইতিহাসে বড়ো-বড়ো রাষ্ট্রিক বা ধর্মীয় ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সঙ্গে বর্ণনীয় ব্যক্তির সম্পর্ক নির্দেশিত হয়; ব্যক্তিগত জীবনের তুচ্ছ, অথচ অর্থবহ ঘটনার স্থান সেখানে বিশেষ নেই। কিন্তু চরিত-সাহিত্যের ক্ষেত্রে শেষোক্ত দিকটির দাবি প্রাধান্য পাওয়া উচিত।

প্লুটার্কও নিজেকে 'Laws of history'র দ্বারা বাঁধতে চাননি। তিনি বলেছিলেন একটি বিশেষ কথা বা চকিত-পরিহাস একজন মানুষের ভিতরটা অনেক বেশি উদ্‌ঘাটিত করে দিতে পারে এবং তিনি ঐ প্রসঙ্গ তুলেছিলেন আলেকজাণ্ডারের জীবনী বর্ণনার সূত্রে। রজার নর্থও আলেকজাণ্ডারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন:

> "what signifies to us, how many battles Alexander fought. It were more to the purpose to say how often he was drunk, and then we might from the ill consequences to him incline to be sober."

তাঁর লেখা এই 'General Preface' অংশটি লোকলোচনের অন্তরালে ছিল তুশো বছর ধরে। জনসন বা বস্‌ওয়েল সেই পাণ্ডুলিপি দেখেন নি। তবে আমরা এই সিদ্ধান্তে স্বতঃই উপনীত হতে পারি যে জীবনী-সাহিত্যের রূপ ও লক্ষ্য সম্পর্কে জন্‌সন যে-সব কথা বলেছেন তার পূর্বাভাষ রজার নর্থের চিন্তায় স্পষ্ট ভাবে দেখা দিয়েছিল।

নর্থের ঐ পাণ্ডুলিপি-প্রবন্ধ জনসন-বসওয়েল পড়েন নি, কিন্তু তাঁরা উইলিয়ম ম্যাসনের সম্পাদিত কবি গ্রে-র রচনাবলীর ভূমিকাস্বরূপ লিখিত গ্রে-র চরিত-

প্রবন্ধ (১৭৭৫) অবশ্যই পড়েছিলেন ও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ড্রাইডেন যেমন প্লুটার্কের 'Lives' সম্পাদনাকালে প্লুটার্কের জীবনী গ্রথিত করেছিলেন ম্যাসন্‌ও ঐ রীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁব পদ্ধতি ড্রাইডেন ও ওয়াল্‌টনকে ছাড়িয়ে চলে এসেছিল। 'Life and Letters' পদ্ধতির তিনিই কুশলী প্রয়োগ-কর্তা। কোনো ব্যক্তির চিঠিপত্রকে তিনি মনে করতেন 'images of interior thought'। অবশ্য ম্যাসন্‌ তাঁব ঋণ স্বীকার কবেন মিউলটনেব 'The Life and Letters of Marcus Tullius Cicero (১৭৪১) বইখানির কাছে।

ম্যাসন্‌, জন্‌সন ও বস্‌ওয়েলের যুগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে মানুষের ভালোয়-মন্দয় বিজড়িত জীবনকে চবিত সাহিত্যের উপজীব্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। জনৈক সমালোচক এ সম্পর্কে লিখেছেন:

> "In the interpretation of human life the greatest single conception which gained wide currency in 18th century biography was the idea that in most mortals good and evil, strength and frailty were inextricably tangled."

প্লুটার্ক-জন্‌সন কথিত, ব্যক্তির জীবনে আপাত-তুচ্ছ ঘটনার উপস্থাপনাব গুরুত্ব, স্বীকাব করেছিলেন জীবনী রচনার ক্ষেত্রে। তবে বর্ণিত ব্যক্তিব অন্তর্‌জীবনটি যাতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেদিকে তিনি ঝোঁক দিয়েছিলেন বেশি। এবং সে-ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ছিল যে, মৃতেব প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের চেয়েও বড়ো কর্তব্য হল, তথ্য ও সত্যেব প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ:

> "If we owe regard to the memory of the dead, there is yet more respect to be paid to Knowledge, to Virtue, to Truth."

সেজন্য জন্‌সন জীবনী সাহিত্যকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছিলেন 'Panegyric' অর্থাৎ প্রশস্তি রচনা ও 'Life' অর্থাৎ ভালোয়-মন্দয় মিশ্রিত জীবনচিত্র রচনা। ওয়াল্‌টনের বইয়ের নাম 'Lives' হলেও জন্‌সন ঐ গ্রন্থকে 'Panegyric' পর্যায়ে ফেলেছেন। (ওয়াল্‌টনের রচিত ডানের জীবনীকে তিনি যদিচ 'the most perfect of them' বলেছেন)। তিনি বর্ণিত ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি ক্ষালন করে তাঁকে দেবোপম করে দেখাবার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি চরিত সাহিত্যের নৈতিক-প্রভাবকে পাঠকচিত্তে প্রতিফলিত হওয়া সমর্থন করেছেন।

আর 'sincere admiration' প্রকাশের তিনি বিরোধী ছিলেন না, ছিলেন স্তুতিবাদের। অকৃত্রিম, জীবন্ত চরিত গড়ে তোলাই যে চরিতকারের কাজ, শুধু বংশগৌরব থেকে তিরোধান পর্যন্ত ('which begins with a man's pedigree and ends with his funeral') তথ্যের পুঞ্জীভূত তালিকা প্রদান নয়, সেকথা তিনি জোরের সঙ্গেই বলেছেন। আর তাঁর মতে সেই জীবন্ত চরিত্র আঁকা সম্ভব হয় ব্যক্তিগত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ আলাপের মধ্য দিয়েঃ

> "history may be framed from permanent monuments and records, but 'lives' can only be written from personal knowledge."

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—৮৩) হেয়ারের জীবনালেখ্য রচনা আরম্ভ করেছেন জনসনের ঐ বাক্যটি দিয়ে। রামচন্দ্র ঘোষ রচিত A Biographical Sketch of the Rev. K. M. Banerjea (১৮৯৩) ঐ একই উক্তি দিয়ে শুরু হয়েছে। উনবিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি চরিত-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না। কিন্তু আমাদের দেশে তখনো বর্ণনীয় ব্যক্তির জীবনের তথ্য সহজপ্রাপ্য ছিল না। ডেভিড হেয়ার ১৮৪২ সালে দেহত্যাগ করেন। তাঁর অন্যতম অনুরাগী কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রতি বৎসর ১লা জুন তারিখে হেয়ার স্মৃতিসভা আহ্বানের প্রস্তাব করেন। প্রথম বর্ষের অধিবেশনে হেয়ারের একখানি জীবনচরিত সংকলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদনুসারে হেয়ারের জীবনের পূর্বভাগের তথ্য পাঠিয়ে দেবার জন্য হেয়ার ভ্রাতা যোশেফ হেয়ারকে লেখা হয় রামমোহন রায়ের পালিত পুত্র রাজারামের মারফতে। কিন্তু দুই বছরের মধ্যে কোনো জবাব আসেনি। সেজন্য ১৮৫১ সালে রামগোপাল ঘোষ হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ডের সভায় দুঃখ করে বলেছিলেন :

> "I doubt if there are materials to enable a writer to produce an interesting biography. Instead of a "life" we would probably get a rhapsodical essay on David Hare's character."

এই অভাব দূর করার জন্য হেয়ারের গুণমুগ্ধ বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ১৮৪৫ সালের ৮ই মার্চ তারিখে দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে গিয়ে তিনি হেয়ারের জীবনের পূর্বভাগের তথ্য তাঁদের

পরিবারের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিন্তু অকস্মাৎ ১৮৪৬ সালের ১লা অগস্ট তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি কি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন আজও সেটা জানা যায় নি।

এই ধরণের প্রতিবন্ধকতা সেদিন বহু ছিল। তবুও দেখতে পাই প্যারীচাঁদ, কিশোরীচাঁদ, ভোলানাথ চন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র বসু, লালবিহারী দে প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইংরেজি ভাষায় হলেও বাংলা দেশে চরিত-সাহিত্যের প্রকৃত মূল্যবান ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের চরিত-বিষয়ক রচনাপঞ্জী নিচে দেওয়া হল :

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—৮৩)

১. Tara Chand Chuckerovurtee, India Review, March. 1840.

২. A Biographical Sketch of David Hare, 1877.

৩. Life of Dewan Ramcomul Sen, 1880.

৪. Life of Colesworthy Grant, 1881.

তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত :

৫. Life of Rustomjee Cowsjee, National Magazine, April & May, 1908.

৬. Early Recollections, June & Aug. 1908.

কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮২২—৭৩)

১. Rammohan Roy, Calcutta Review, 1845.

২. Hurris Chunder Mookherjea, Indian Field, 1861.

৩. Radhakanta Dev, Calcutta Review, 1867.

৪. Ramgopal Ghosh, Calcutta Review, 1868.

৫. Life of Muttylal Seal, 1869.

৬. Memoirs of Dwarkanath Tagore, 1870.

৭. The Territorial Aristocracy of Bengal, Cal. Rev. 1872—74.

৮. Caitanya, Bengal Magazine, 1872.

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮২৯—৬৯)

১. Hurris Chunder Mookerjea, Mookerjea's Magazine, 1861.

২. Life of Ramdulal Day, The Bengali Millionaire, 1868.

ভোলানাথ চন্দ্র (১৮২২—১৯১০)

১. Hindu Female Celebrities, Cal. Review, 1869.

২. Outlines of Hindu Celebrities, National Magazine, 1890-92.

৩. Life of Raja Digambar Mitra Vol.I, 1893, (1st Edition) 1896 (2nd Ed.) Vol, II, 1896.

৪. Recollections of Famous Indian Public Characters—
Cal. Uni. Magazine Feb. 1896.

৫. „ „ D. L. Richardson „ July, 1894.

৬. „ „ George Thompson M. P. „ Nov. 1895.

ভোলানাথ চন্দ্র জন্‌সন-বস্‌ওয়েল রীতিকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত' প্রকাশের পর তিনি গৌরদাস বসাককে লিখিত পত্রে জানিয়েছিলেন :

> "The best biography is that from which we can know the outer as well as the inner man. There are two books, so far as my little reading goes, which do this—Boswell's Life of Johnson, and Abul Fazl's Ayin-i-Akbari. We know Johnson and Akbar as we know any one living amongst us,"

ভোলানাথ যে কতদূর জনসন-ভক্ত হয়েছিলেন তার পরিচয় রয়েছে 'Old Leaves turned back' পর্যায়ের লেখাগুলিতে (১৮৯৬—৯৭) সেখানে তিনি জন্‌সনের ছদ্মনাম ধার নিয়েছেন 'An Idler'.

কৈলাসচন্দ্র বসু (১৮২৭—৭৮)

১. A lecture on the life of Ramgopal Ghosh, 1868.

লালবিহারী দে (১৮২৪-৯৪)

১. Recoll ons of Alexander Duff, 1879.

২. Rev. Wilson, Bengal Magazine, 1876.

৩. Kissory Chund Mittra, Bengal Magazine, 1873.

প্রদত্ত বিবরণী থেকে বোঝা যাবে যে উনবিংশ শতকে যাঁরা বাংলাদেশে নিজস্ব

দুর্বার শক্তিতে নানাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, স্বভাবতই যুক্তিবহ শ্রদ্ধা নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত গোষ্ঠী তাঁদের জীবনী রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের সামনে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের চৈতন্য-জীবনী ছিল এবং মুসলমান ঐতিহাসিক ও চরিতাখ্যায়কদের বহু গ্রন্থ ছিল। কিন্তু তাঁরা নবজাগ্রত বাংলার প্রতিনিধি এবং তাঁদের চিত্তের নবজাগরণ সম্ভব হয়েছিল পাশ্চাত্য চিন্তা, দর্শন ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে। তাঁরা ইংরেজি চরিত-সাহিত্যের আদর্শে ইংরেজি ভাষায় লিখেছেন এবং সেটাই ঐ যুগের পটভূমিকায় অনিবার্য ছিল।

প্যারীচাঁদ, কিশোরীচাঁদ বা ভোলানাথ চন্দ্র যাঁরা উনবিংশ শতকের পূর্বার্ধে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন তাঁরা প্লুটার্ক থেকে বস্‌ওয়েল এবং কারলাইল, এমার্সন অবধি পাশ্চাত্যের চরিত-সাহিত্য স্রষ্টাদেব রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁদের আদর্শে পূর্বোক্ত চরিত-প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা কবেন।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের রামমোহন রায় সম্পর্কিত প্রবন্ধটির প্রথম পর্যায় রচিত হয় 'Biographical Memoir of Late Raja Rammohan Ray with a series of illustrative extracts from his writings, Calcutta (1839) বইখানির সমালোচনা উপলক্ষে। রামমোহন রায়ের মৃত্যু ঘটে ব্রিষ্টলে ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর। তাঁর মৃত্যুর পর উক্ত পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হয়। কিশোরীচাঁদের সমালোচনা প্রবন্ধটি বার হয় ১৮৪৫ সালে, বারো বছব পরে। বিশেষ একটি যুগের পরিপ্রেক্ষিতে 'ব্যক্তি'কে স্থাপন করে তাঁর চবিত্র-বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিব অভিজ্ঞানবহ। কিশোরীচাঁদ সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগকে রামমোহন-পন্থী লেখক নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিশ্লেষণ করে যথার্থই বলেছেন: 'the age of inquiry and investigation' এবং সেজন্য তাঁর পক্ষে হিন্দু সমাজের প্রচলিত মত ও পথ পরিত্যাজ্য বলে মনে করা স্বাভাবিক: 'customs, consecrated by immemorial observance and interwoven with the fibres of Hindu society are unhesitatingly renounced as incompatible with the laws of God and Man'. কিশোরীচাঁদ রামমোহনকে এই নতুন ভাব-বিপ্লবের ('moral revolution') নায়করূপে দেখেছেন।

রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর একদা-সেক্রেটারি স্যাণ্ডফোর্ট আর্নট লণ্ডনের 'Atheneum' ও 'Literary Gazette' পত্রিকায় রামমোহনের আত্মজীবনী-মূলক একখানি পত্র প্রকাশ করেন। কিশোরীচাঁদ সেই পত্রের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। তিনি রামমোহনের পিতৃপরিচয় জন্ম শিক্ষা কর্মজীবন বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশ খৃষ্টধর্ম ও মিশনারীদের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে বিলাতযাত্রা—রস্কো, বেন্থাম, লুই ফিলিপ্পি প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ ও পরিশেষে তাঁর মৃত্যু বর্ণনা করেছেন। রামমোহনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, যাকে জন্সন বলেছেন 'sincere admiration', তাই নিয়ে কিশোরীচাঁদ এই প্রবন্ধ রচনা করেন। তবু তিনি রংপুরে ডিগবির অধীনে দেওয়ান হিসাবে কাজ করবার সময় রামমোহনের প্রভূত বিত্তলাভের ব্যাপারটিকে সকল সন্দেহের ঊর্ধে ঠেলে দিতে পারেন নি। তিনি অবশ্য বলেছেন, 'neither to substantiate, nor to repudiate'.

কিশোরীচাঁদ রামমোহন রায়ের একনিষ্ঠ অনুরাগী হয়েও রামমোহনের জীবনেব প্রথম ভাগের ঐ ঘটনাটিকে বর্জন করতে চান নি।

রাধাকান্ত দেবের মৃত্যুর (১৮৬৭) পর ঐ সালে তিনি 'ক্যালকাটা রেভিউ' পত্রিকায় 'Radhakanta Dev' নামে যে চরিত-প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তার মধ্যেও দেখতে পাই তিনি রাধাকান্তের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সহায়তা, 'শব্দকল্পদ্রুম' সম্পাদন, জর্মান স্কলারকে আর্থিক সাহায্য দান প্রভৃতি সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সমাজ-সংস্কারে রাধাকান্ত রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মত ও পথের বিরোধী হওয়ায় কিশোরীচাঁদ তাঁর কঠিন সমালোচনা করেছেন। তিনি রাধাকান্তের চরিত্রের এই দুটি দিকই দেখিয়েছেন। সেজন্য তিনি লিখেছেন, কারো চিত্রকে যথার্থ সত্য করে তুলতে হলে তাঁর গুণ ও দোষ কোনটিকেই ইচ্ছাকৃতভাবে ঢাকতে নেই :

> "We believe however that the most faithful painter is he who represents the imperfections, as well as the perfections of his subject. What we have said, we have said in the interests of truth and principle."

কিশোরীচাঁদ মতিলাল শীলের (১৭৯২-১৮৫৪) চরিত-প্রবন্ধও রচনা করেন (১৮৬৯)। মতিলাল শীলের আত্মীয়বর্গের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁদের আসরে ঐ চরিতপ্রবন্ধটি পাঠ করেন, পরে রচনাটি পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত

হয়। প্রবন্ধটিতে মুখবন্ধ ছাড়া জন্ম-মৃত্যু বিধৃত জীবনকথা বিবৃত হয়েছে। অত্যন্ত সামান্য অবস্থায় মদের খালি বোতল বিক্রী থেকে শুধু নিজের কর্মশক্তি, ব্যবসায়-বুদ্ধি ও অ-সামান্য সততার ফলে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে মতিলাল কী করে ক্রোড়পতি হয়েছিলেন তার একটি তথ্যপূর্ণ কালক্রমিক বর্ণনা কিশোরী-চাঁদ দিয়েছেন। ১৮৫৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ পুর্নগ্রহণের কালে রামতুলাল ঘোষকে লিখিত মতিলাল শীলের পত্র, তাঁর জীবনের বহু ক্ষুদ্র গল্প বা anecdotes এবং তাঁর উইল এই জীবনকথা রচনায় তিনি ব্যবহার করেছেন। ওয়াল্‌টন, মিডল্‌টন, ম্যাসন্ ও বস্‌ওয়েল এই রীতির প্রকৃষ্ট ধারক। এই জীবন-চিত্রটি হিন্দু পেট্রিয়টের মতে যুগপৎ 'আনন্দ ও শিক্ষাদায়ক'। কিশোরীচাঁদ মতিলালের কর্মজীবনের ঘটনা-সমৃদ্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তার মধ্য দিয়ে তাঁর 'ব্যক্তিত্বের' প্রকাশ ঘটেছে। লেখক দেখিয়েছেন মতিলালের সতীদাহ-বিরোধিতা ও বিধবাবিবাহ-সমর্থন ঘটনা দুটি 'ধর্মসভা'-পন্থীদের থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা প্রমাণ করে। তবে কিশোরীচাঁদ মতিলালের চরিত্রে কিছু কিছু ত্রুটি লক্ষ করেছেন এবং সেগুলি বলতে কুণ্ঠিত হন নি। তিনি লিখেছেন :

> "He was obstinate and short tempered and did not learn to school his impulses. His temper betrayed him into vehemence and intemperance of language. He did not easily forget or forgive injuries done him."

মতিলালের বিধবা ও অনাথ সেবা, শীলস ফ্রি কলেজ শিক্ষালয় স্থাপন, দরিদ্র প্রজাদের খাজনা মাপ প্রভৃতি বহু সদগুণের কথাও কিশোরীচাঁদ বলেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই ধরণের 'merchant-prince' স্বশক্তিমান বাঙালী চরিত্রকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা 'to the admiration and imitation of the rising generation.'

উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে বাঙালীদের মধ্যে রামমোহন, দ্বারকানাথ, রামগোপাল ঘোষ বা মতিলাল শীলের পর্যায়ের ব্যক্তিদের কিশোরীচাঁদ 'Hero' রূপে বা এমারসন্-কথিত 'Representative Man'রূপে দেখেছেন। রামমোহনের মনীষা, পাণ্ডিত্য, বিশ্বজনীনতা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম, তাঁর ব্যক্তি-স্বাধীনতা ঘোষণা ও ভারতবাসী হিসাবে গৌরব বোধ কিশোরীচাঁদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। মতিলালের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাবান

ছিলেন, না হলে তাঁর পক্ষে ঐ চরিতকথা রচনা সম্ভব ছিল না। ঐ শ্রদ্ধার মূলে ছিল Individual Enterprise-এর প্রতি শ্রদ্ধা। য়ুরোপীয়দের সঙ্গে ব্যবসায়গত প্রতিযোগিতায় মতিলালের সফলতা এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্বে মতিলালের বিধবাবিবাহ দান প্রচেষ্টা ও সতীদাহ নিবারণ সমর্থন কিশোরীচাঁদের মত প্রগতিশীল ব্যক্তির শ্রদ্ধা স্বভাবতই আকর্ষণ করেছে। ১৮৫৩ সালে ২৯শে জুলাই তারিখের পত্রে মতিলালের রামগোপাল ঘোষের দেশপ্রীতিমূলক রাজনৈতিক কাযক্রমকে সমর্থন করা তাঁর চরিত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে আমাদের কাছে পরিচিত করিয়ে দিয়েছে। এই ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিশোরীচাঁদ মতিলাল শীলের (তাঁকে তিনি 'un-common man' বলেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন) একখানি সংক্ষিপ্ত হলেও তথ্যমূলক (factual) জীবনকাহিনী রচনা কবেছেন।

বস্‌ওয়েল তাঁর রচিত গ্রন্থেব শেষে লিখেছেন :

> "Such was Samuel Johnson whose talents, acquirements and virtues were so extraordinary that the more his character is considered, the more he will be regarded by the present age and by posterity with admiration and reverence."

কিশোরীচাঁদ যাঁদেব কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে তাঁর 'admiration' ও 'reverence' যথেষ্ট ছিল। বর্ণিত ব্যক্তিদেব চিঠি, টুকরো গল্প, স্বমুখের উক্তি, উইল, ভ্রমণপঞ্জী, সংবাদপত্রেব মন্তব্য প্রভৃতি উপাদান কিশোরীচাঁদ ব্যবহার করবার প্রয়াস পেয়েছেন বস্‌ওয়েলের অনুসরণে। তারই সঙ্গে এসেছে কারলাইল-শিষ্য রালফ্‌ ওয়ালডো এমারসনেব (১৮০৩-৮২) প্রভাব। আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে এসে (১৮৪৭) এমারসন্‌, কারলাইলের (১৭৯৫-১৮৮১) ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গিগত সাধর্ম্য অর্জন করেন। তাঁর 'Representative Man' গ্রন্থ ১৮৫০ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ রচনায় তিনি কারলাইলের 'Heroes and Hero-worship' (১৮৪১) গ্রন্থের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কারলাইল বলেছিলেন 'The history of mankind is the history of great men'. ঐ 'greatmen' রা তাঁব কাছে 'Heroes'. আর এমারসনের দৃষ্টিতে তাঁরাই হলেন 'Representative Men.'

এই গ্রন্থখানির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় কিশোরীচাঁদের, 'রামগোপাল ঘোষ' ও 'দ্বারকানাথ ঠাকুর' সম্পর্কিত রচনাদ্বয়ে। রামগোপাল ঘোষের (১৮১৪-৬৮) মৃত্যুর পর কিশোরীচাঁদ তাঁর স্মরণে 'ক্যালকাটা রেভিউ' পত্রিকায় 'Ramgopal Ghosh' প্রবন্ধটি লেখেন। রামগোপাল হিন্দু কলেজের 'Young Bengal' দলের নেতৃত্ব করেছেন। গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি রামগোপালের জীবনী প্রবন্ধাকারে উপস্থাপিত করেছেন। কেন না, রামগোপালের মধ্যেও তিনি দেখেছেন 'Individual'-এর তথা এমার্সন-কথিত 'Self-reliance'-এর বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ, সম্পূর্ণ নিজের শক্তিতে আস্থা রেখে সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে নিজের প্রতিষ্ঠা গড়ে তোলা। ডিরোজিয়োর শিষ্যের এই স্বাধীনচিত্ততা, দেশপ্রীতি, অদম্য কর্মশক্তি প্রভৃতি গুণাবলীর জন্য কিশোরীচাঁদ তাঁর সম্পর্কে এমার্সন-ব্যাখ্যাত 'Representative Man' শব্দটি ব্যবহার করেছেন :

> "In boldness and decision and energy of character, in acute good sense, in application to business, in independence of thougnt and action and in love for his country he was one of the most extraordinary Hindoos, *Representative Man.*"

এবং এই ধনে-মনে বলিষ্ঠ ব্যক্তির 'আদর্শ' অনুকরণ করে দেশবাসী নিজেকে উন্নত করে তুলবে সেই উচ্চাশা নিয়ে রামগোপালের চরিত্র-চিত্র অঙ্কন করেছিলেন কিশোরীচাঁদ।

দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে চরিতসাহিত্য-জিজ্ঞাসায় প্লুটার্ক, জন্সন-বস্‌ওয়েল রীতির সঙ্গে কারলাইল ও এমার্সনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করবার চেষ্টা চলছে। এই সূত্রে বলা দরকার, জন্সন জীবনী রচনার যে রীতিকে কটাক্ষ করেছিলেন অর্থাৎ 'begins with a pedigree and ends with a funeral' সেই রীতিকে অর্থাৎ 'factual' বা 'descriptive biography'র রীতিকে প্যারীচাঁদ, কিশোরীচাঁদ, কৈলাসচন্দ্র, ভোলানাথ সকলেই গ্রহণ করেছেন। (তথ্যমূলক চরিত না থাকলে তত্ত্বমূলক চরিত গড়ে উঠবে কি করে?) এঁরা সকলেই তথ্যবহুল, উপাদানসমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণধর্মী জীবনী রচনার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এর 'moral' দিকটিকেও তাঁরা সচেতন ভাবে ফুটিয়ে তুলতে ছিলেন আগ্রহী। 'পরিশিষ্ট' অংশে বর্ণিত ব্যক্তির মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত

শোক সভায় বিভিন্ন ব্যক্তির মৃত-ব্যক্তি সম্পর্কিত স্মৃতি-ভাষণ, শোক-প্রস্তাব, বিভিন্ন সংবাদপত্রের মতামত থেকে শুরু করে ঐ ব্যক্তি যে-সব সভায় যোগ দিয়েছেন, যে-যে বক্তৃতা করেছেন, সেই 'minutes' গুলি সযত্নে চয়ন করে দেওয়া হত। তার থেকে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি লাভ করা সহজ হত। এই ধরণের চরিত রচনাকে 'art' না বলে 'craft' বলা উচিত। আবাব বর্ণিত ব্যক্তিব 'আদর্শ' অনুকরণে দেশবাসী যে উপকৃত হবে এ-কথা তাঁরা সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেন :

> "As he manifested in his life a noble and elevated spirit and has left foot-prints to guide his countrymen to a better path…"

'হেয়ার-স্মৃতি সভা'য় পডবার জন্য দ্বারকনাথেব যে 'Memoir' তিনি ১৮৭০ সালে প্রস্তুত করেন ও পরে প্রকাশ কবেন তার আরম্ভ হয়েছে এমারসনেব 'Representative Man' গ্রন্থেব প্রথম অধ্যায় 'Uses of Great Men' থেকে উৎকলিত কয়েকটি পংক্তি দিয়ে ঃ

> "I admire great men of all classes, those who stand for facts and for thoughts, I like rough and smooth, 'Scourges of God' and 'Darlings of the human race.'
> I like the first Caesar, and Charles V. of Spain; and Charles XII. of Sweden, Richard Plantagenet, and Bonaparte of France…"

কারলাইলেব 'হিরো'দের অনুকরণে এমার্সন যে সপ্ত-চরিত্র বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন প্লেটো, সুইডেন্‌বুর্গ, মন্‌টেইন, সেকস্‌পীয়ব, নেপোলিয়ন এবং গ্যেটে। তিনি বিশ্বাস করতেন এই সব মহান ব্যক্তিদের জীবনই মানুষেব শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, তাকেই তিনি বলেছেন 'moral of biography'. কিন্তু কারলাইল বা এমার্সনের রীতিতে, 'deductive' পদ্ধতিতে তিনি লেখেন নি। তাঁর দৃষ্টি মূলতঃ 'Inductive'.

দ্বারকানাথের জীবনী আলোচনায় তিনি তাঁর 'pedigree'র আলোচনা কালে ভট্টনারায়ণ থেকে ঠাকুর বংশ উদ্ভূত হবার তথ্যকে স্বীকার করেন নি, ঐতিহাসিক বিচারের দ্বারা। জন্ম, শিক্ষা, চাকরি, নিজস্ব স্বাধীন ব্যাবসা, বিস্তৃত জমিদারি, রেশম-কয়লা-চিনি প্রভৃতি শিল্প-পরিচালনা বিষয়ক তথ্যাদি

কিশোরীচাঁদ অতি নিপুণভাবে চয়ন ও গ্রন্থন করেছেন। দ্বারকানাথের জীবনী রচনায় তিনি 'A Brief History of the Tagore Families' (১৮৬৮) গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর (১৮৪৬) পর 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকা থেকে শুরু করে সমকালীন সকল পত্রিকায় দ্বারকানাথের সম্পর্কে বহু তথ্য প্রকাশিত হয়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় দ্বারকানাথের স্বলিখিত বিলাত যাত্রার, ও ভ্রমণের দিনপঞ্জী প্রকাশিত হয়েছিল। বস্‌ওয়েল তাঁর 'A Journey to the Western Islands of Scotland' (১৭৭৫) গ্রন্থে জনসন ও তাঁর যাত্রাপথের স্থানকালকে জীবন্ত করে তুলেছেন। কিশোরীচাঁদের বর্ণনার কৃতিত্ব বস্‌ওয়েলের রীতিকে স্মরণ করায়। তিনি রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রা ও বিলাতে পৌছবার যে-বর্ণনা দিয়েছেন তার উপস্থাপনারীতিও অনুরূপভাবে চিত্তাকর্ষক।

দ্বারকানাথের ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কিত মতামত ও তাঁর কার্যাবলী আলোচনাকালে কিশোরীচাঁদ দেখিয়েছেন, ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ রামমোহনের রায়ের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি সর্বক্ষেত্রে রামমোহন সহযোগী ছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও রামমোহনের মতোই তাঁর কাম্য ছিল 'Justice for India and loyalty to the British Government'. এইভাবে কিশোরীচাঁদ দ্বারকানাথের জীবনের মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দানে অগ্রসর হয়েছেন। দ্বারকানাথের জীবনের একটি ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করে তাঁর চরিত্রের একটি উজ্জ্বল দিক আমাদের দেখিয়েছেন। শোরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে দ্বারকানাথ প্রথমে ইংরেজি শিখেছিলেন। বাল্যের গুরুমহাশয়-সাহেবকে আজীবন তিনি প্রতিপালন করেছিলেন।

কিন্তু দ্বারকানাথের সব আচরণ কিশোরীচাঁদ সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর নিজের নৈতিকবোধ বা ethical দিক থেকে তিনি দ্বারকানাথের অত্যধিক ভোগ-বিলাস বা অসংযত জীবনযাপনের সমালোচনা করেছেন। সেজন্য তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন :

> "But Dwarkanath was not a perfect man and I do not purpose to paint him as perfection. He had faults as who has not ? His was not 'the pure severity of perfect light.' Dwarkanath was intensely of the social type and delighted in society and in the pleasures thereof···

It may be that these temptations were not wrested down as they ought to have been ; he wanted the capacity to conquer them…"

দ্বারকানাথের জীবনের যে দোষ-ত্রুটি (তাঁর ভাষায় 'infirmities') কিশোরী-চাঁদ লক্ষ করেছেন তিনি সেগুলি ক্ষালন করবার প্রয়োজনবোধ করেন নি তৎসত্ত্বেও দ্বারকানাথ তাঁর কাছে নবীন বাংলার 'Representative Man' এবং তিনি মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন, দ্বারকানাথের জীবনবৃত্তান্ত দেশবাসীর জীবনে শিক্ষাপ্রদ হবে ('must be instructive') ।

রামমোহন ও দ্বারকানাথ, ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের এই দুই উদ্গাতার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য চমৎকার ভাবে একটি তুলনামূলক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কিশোরীচাঁদ দেখিয়েছেন। রামমোহন হলেন চিন্তানায়ক আর দ্বারকানাথ কর্মবীর। দ্বারকানাথ সম্পর্কে এর চেয়ে তথ্যসমৃদ্ধ কোনো গ্রন্থ তখনো রচিত হয়নি। কিশোরীচাঁদের রচিত রমাপ্রসাদ রায়, হরিশ মুখোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর সম্পর্কিত রচনাগুলিও বিশেষ মূল্যবান।

কিশোরীচাঁদের জ্যেষ্ঠ প্যারীচাঁদ যে সব চরিত-বৃত্তান্ত লিখেছেন তাদেব মধ্যে প্রথমে উল্লেখযোগ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তীব জীবিতকালেই তাঁর জীবনী-প্রবন্ধ রচনা। ১৮৪০ সালের 'ইণ্ডিয়া রেভিউ' পত্রিকার মার্চ সংখ্যায় ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্যারীচাঁদ বয়সে তারাচাঁদের চেয়ে আট বৎসরের ছোট ছিলেন। উভয়েই হিন্দু কলেজের তথা ডিরোজিওব ছাত্র, রামমোহন রায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত, অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন ও 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র সদস্য। তাছাড়া প্যারীচাঁদ, কালাচাঁদ শেঠ ও তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়ে বহু অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তারাচাঁদ ১৮৪৪ সালে নিজেকে সরিয়ে নেন এবং প্যারীচাঁদ স্বাধীনভাবে ব্যাবসা শুরু করেন। কাজেই 'lives can only be written from personal knowledge'—জনসন-কথিত এই উক্তি প্যারীচাঁদের রচনায় সার্থক হয়েছে। প্যারীচাঁদের অপর চরিত-প্রবন্ধগুলিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে :

(ক) ডেভিড হেয়ার ও কোলস্‌ওয়ার্দি গ্রাণ্ট।

(খ) রামকমল সেন ও রুস্তমজী কাওয়াসজী।

ডিরোজিও-শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৭৭ সালে 'A Biographical Sketch of David Hare' প্রকাশ করেন। এদেশে শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে হেয়ারের

নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। হিন্দুকলেজ, স্কুল সোসাইটি, স্কুলবুক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হেয়ারের ঘনিষ্ঠ যোগ, স্ত্রীশিক্ষায় হেয়ারের আগ্রহ, মুদ্রাযন্ত্রের কণ্ঠরোধের বিরোধিতা, জুরীপ্রথার সমর্থন, ছাত্রদের জন্য তাঁর পিতৃ-প্রতিম দরদ—হেয়ারের বাহির ও ভিতরের দুটি দিকই এই গ্রন্থে ধরে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। নিস্পৃহ নিরভিমান এই বিদেশী ভারতবন্ধুর জীবনকথা প্যারীচাঁদ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাসহ রচনা করেছেন। হেয়ারের প্রসঙ্গে হিন্দুকলেজ, ডিরোজিও, তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি, কর্তৃপক্ষের ডিরোজিও-দ্বেষ, তাঁর পদচ্যুতি বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল ঐ যুগকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য, বিশেষত যখন হেয়ার অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন ডিরোজিওর কর্মচ্যুতির। জীবনী সাহিত্য সম্পর্কে বলা হয়েছে 'a man's biography is mostly his contemporaneous history'—প্যারীচাঁদ সেইভাবে সমসাময়িক যুগের পটভূমিকা রচনা করেছেন হেয়ারের জীবনবৃত্তান্ত রচনায়। প্রত্যেকটি লোকের জীবনী রচনায় তার দোষ ত্রুটি দেখাতেই হবে এমন ফতোয়া দান ঠিক নয়। 'দোষ ঢাকতেই হবে' এমন দাবি যেমন সমর্থনযোগ্য নয়, তেমনি 'দোষ দেখাতেই হবে' এমন জেদও ঠিক নয়। হেয়ারের জীবনের পূর্বভাগের বৃত্তান্ত জানা যায় নি। ১৮১৬ থেকে ১৮৪২ কাল-পর্বে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে কলিকাতায়, সমসাময়িক কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। এই ধরনের রচনাকে যদি 'panegyric' বলা হয় তাতে ক্ষতি কি? রেণেসাঁসের চিন্তাপুষ্ট প্যারীচাঁদ পরার্থব্রতী হেয়ারকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর উক্তি দ্বারা সেকথা প্রতীয়মান হবে:

> "The men who labour for the good of others,—practising self-abnegation, suffering privation, and blushing to find it fame, may be looked upon as 'angels', in as much as their examples conduce to the spiritual development of those who come in contact with them or read their lives."

তথ্যগত দু-একটি ভুল প্যারীচাঁদের গ্রন্থে আছে। কিন্তু হেয়ারের জীবন ও কার্যাবলী বিচারের দিক থেকে সেগুলি নগণ্য। পরিশেষে হেয়ার সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতিকথার সংকলন গ্রন্থখানির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।

প্যারীচাঁদ সমাজসংস্কারে ও নরহিতে অগ্রণী ছিলেন তাঁর সতীর্থদের

মতো। স্কটল্যাণ্ডবাসী ডেভিড হেয়ারের নিঃস্বার্থ জীবনোৎসর্গ এবং কোলসওয়ার্দি গ্রাণ্টের পশুক্লেশনিবারণ প্রচেষ্টা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। কোলস্‌ওয়ার্দি গ্রাণ্টের মৃত্যুর পর তাঁর চরিত-প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন (১৮৮১)। প্যারীচাঁদ জর্জ গ্রাণ্ট ও কোলস্‌ওয়ার্দি উভয়েরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র স্বদেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে দেওয়ান রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪) ও রুস্তমজী কাওয়াসজীর জীবনবৃত্তান্ত রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন তার কারণ এই দুই ব্যক্তি উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে নিজেদের কর্মশক্তিতে সমাজে বিশেষ মান্য ব্যক্তি হতে পেরেছিলেন। রামকমলের জীবনবৃত্তান্ত রচনায় (১৮৮০) প্যারীচাঁদ তাঁদের কুলপঞ্জীকে বর্জন করেন নি, জন্ম ও পিতৃ-পরিচয়ের সঙ্গে কুল-পরিচয় থাকা সেকালে নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ইংরেজি জীবনীগ্রন্থেও তাব উপস্থিতি লক্ষিত হয়, জন্‌সনের কটাক্ষ সত্ত্বেও। প্যারীচাঁদ কোলস্‌ওয়ার্দি গ্রাণ্টের জীবনীরচনায় তাঁর জন্মস্থান ও বংশের প্রভাব নির্দেশ করেছেন। রুস্তমজী কাওয়াসজীর বর্ণনায়ও তিনি ভারতে পার্শী সম্প্রদায়ের আদি-ইতিবৃত্ত আলোচনা করেছেন। রামকমল, কোলস্‌ওয়ার্দি বা রুস্তমজীর জীবনবৃত্তান্ত রচনায় তিনি পরিবেশ ও পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ তুলেছেন।

কিন্তু প্যারীচাঁদ এঁদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার কারণ উভয়েই কেবলমাত্র নিজেদেব শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার জোরে ধন ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। যে মানুষ ১৮০৪ সালে ২১ বৎসর বয়সে হিন্দুস্থানী প্রেসে মাসিক ৮৲ টাকা বেতনে কম্পোজিটারের কাজ করতেন এবং ১৮১৮-১৯ সালে হোরেস হেমান উইলসনের অধীনে এশিয়াটিক সোসাইটিতে মাসিক ১২৲ টাকা বেতনে কেরানীগিরি গ্রহণ করেন তিনিই পরবর্তী কালে কলিকাতা টাঁকশালের দেওয়ান এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান (১৮৩২) হয়েছিলেন। ১৮০১ সালে কলুটোলায় রামজয় দত্তের স্কুলে সামান্যই ইংরেজি শিখেছিলেন রামকমল। সেই শিক্ষালাভের জন্য অধিক অর্থব্যয় করা তাঁর পিতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ এই রামকমল পরবর্তী কালে নিজের উৎসাহে ও চেষ্টায় ইংরেজি ভাষায় বিশেষ কৃতবিদ্য হয়ে সংকলন করেছিলেন 'A Dictionary in English and Bengalee translated from Todd's Edition of Johnson's English Dictionary in two volumes'. এই অভিধানের গোড়ায় রামকমল প্রাচীন কলিকাতার যে তথ্যপূর্ণ

ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন, প্যারীচাঁদ রামকমলের জীবনী রচনায় তার ব্যবহার করেছেন। হিন্দুকলেজ, সংস্কৃত কলেজ, স্কুলবুক সোসাইটি স্কুল সোসাইটি, এশিয়াটিক সোসাইটি, জেনারল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রামকমল সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। আলোচ্য চরিতগ্রন্থে প্যারীচাঁদ রামকমলের কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেছেন। তাঁদের গোষ্ঠীর গুরু ডিরোজিওর কর্মচ্যুতির পিছনে রামকমল সেনের প্রভাবই মুখ্য ছিল। ধর্ম ও সমাজগত রক্ষণশীল মতামতের দিক থেকে রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের মধ্যে মিলও তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু কিশোরীচাঁদ মিত্র যে-ভাবে রাধাকান্ত দেবের মত ও পথের তীব্র সমালোচনা করেছেন প্যারীচাঁদকে তার থেকে বিরত দেখতে পাই।

রুস্তমজী কাওয়াসজীর (১৭৯২-১৮৪৪) প্যারীচাঁদ-কৃত যে জীবনী-প্রবন্ধ 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত হয় তার মধ্যে প্যারীচাঁদ দেখিয়েছেন পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে বিষয়-সম্পত্তি কিছুই তিনি পান নি। কিন্তু নতুন যুগের 'Free Merchant'-দের কার্যকলাপ ও শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে-সম্ভাবনাগুলি ভারতবাসীর সম্মুখে এসেছিল রুস্তমজী সেগুলির চূড়ান্ত সদ্‌ব্যবহার দ্বারা প্রভূত বিত্তবান হন। প্যারীচাঁদ মিত্র নিজেও যৌথ কারবার চালিয়েছেন, বহু শিল্প-সংস্থা পরিচালনা করেছেন। রুস্তমজীর জীবনী রচনা করা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। বীমা, ব্যাঙ্ক, নিমক্‌ ও জাহাজী ব্যাবসা— সর্বক্ষেত্রে রুস্তমজী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ভারতে 'জাতীয়-বুর্জোয়া' শ্রেণীর আসন পাকা হয়েছে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রুস্তমজী কাওয়াসজীর মত ব্যক্তিদের কর্মশক্তির জোরে। এই কর্মশক্তির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাঁদের শিক্ষা বিস্তার ও সমাজহিতসাধন প্রচেষ্টা। মতিলাল শীলও ধনোপার্জনের সঙ্গে সমাজ কল্যাণের জন্য বহু অর্থ দান করেছিলেন।

রুস্তমজীর জীবনী রচনায় প্যারীচাঁদ স্বভাবতঃই তাঁর কৃতী ব্যবসায়ী জীবন এবং সমাজহিতকারী কার্যাবলী বর্ণনা করেছেন। প্যারীচাঁদ নিজে অনুরূপভাবে ব্যাবসা ও শিল্প পরিচালনার সঙ্গে সমাজ কল্যাণ প্রচেষ্টায় অগ্রসর হয়েছিলেন। সেজন্য তাঁব পক্ষে রুস্তমজী চরিত্রের মূল্যায়ন সহজ হয়েছে। এ-ধরণের জীবনী-প্রবন্ধগুলিতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের বহুমুখী কর্মজীবনের তথা সমাজ হিতসাধনের তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কেন না তার দ্বারা তাঁদের জীবনের প্রধান দিকটিকে আমরা ধরতে পারব। এগুলি তথ্যপ্রধান জীবনী। প্যারীচাঁদ

রুস্তমজীর চরিত্রে শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনায় দক্ষতা এবং সমাজসেবায় ব্রতী হওয়ার যে দুটি দিক সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে দেখাতে চেয়েছিলেন তাঁর সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

রেভাঃ লালবিহারী দে তাঁর 'Recollections of Alexander Duff' (১৮৭৯) গ্রন্থখানিকে ডাফ সাহেবের (১৮০৬-৭৮) জীবনী ঠিক বলতে চাননি। ডাফ সম্পর্কে মুখ্যতঃ তাঁর স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং ডাফকে তাঁর 'Spiritual father' বলে ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশে ডাফের আগমন ঘটে ১৮৩০ সালে, রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রার পূর্বে। এদেশে শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও দেশীয় খ্রীষ্টান তৈরী করা ডাফের উদ্দেশ্য ছিল। লালবিহারী ডাফের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, ছাত্র ও সহকর্মী হিসাবে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ডাফের ভূমিকাই লালবিহারীর প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। সেজন্য তিনি ডাফের আগমনের পূর্ববর্তী ও সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাক্রম, পাঠ্য বিষয়, তাদের নবজাগ্রত মনোভাব, (অর্থাৎ 'They began to reason,' to question, to doubt') ডিরোজিওর জ্বলন্ত প্রভাব বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছেন। কারণ ডাফ ধর্ম-নিরপেক্ষ (secular) শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তরুণ হিন্দুছাত্রদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা। প্রথমে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনিই দীক্ষিত করেন। ডাফের শিক্ষাদান পদ্ধতির বর্ণনাও লালবিহারী দিয়েছেন। ডাফের স্বাধীন-চিত্ততার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ 'ফ্রি চার্চ ইনসস্টিট্যুশন' গঠন করা। লালবিহারী এ সমস্ত বর্ণনা করলেও ডাফের মূর্তিটি 'জীবন্ত' হয়ে উঠতে পারেনি তাঁর রচনায়। তিনি বাংলাদেশের বিখ্যাত পজিটিভিস্ট বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের একখানি জীবনী লিখেছিলেন বলে জানা যায়। শিক্ষাব্রতী প্যারীচরণ সরকারের (১৮২৩-৭৫) একখানি 'Life' লিখবার আগ্রহও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। সেজন্য তিনি বস্‌ওয়েলের পন্থায় প্যারীচরণের চিঠি, তাঁর সম্পর্কিত টুকরো গল্প, অন্য ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা, সাময়িক পত্রাদির মন্তব্য—সর্ববিধ উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর লেখেন নি।[১৬]

ভোলানাথ চন্দ্রের 'Raja Digambar Mitra. His Life and Career' (১৮৯৩) গ্রন্থ তথ্যবহুল বিরাট জীবনী গ্রন্থ। তিনি এই গ্রন্থের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। (এর পূর্বে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুরোধে পারিশ্রমিক নিয়ে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জীবিতকালেই

তাঁর একখানি জীবনী লিখে দিয়েছিলেন[১৭])। কাজেই দেখা যায় দিগম্বর মিত্রের জীবনী রচনায় তাঁর কার্যকলাপের নিরপেক্ষ বিচার ভোলানাথের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উনবিংশ শতকে ইংরেজি সাহিত্যে 'Life and Times' রীতিতে অন্ততঃ দুই ভল্যুমে তথ্যপুঞ্জিত জীবনী লেখার যে প্রথা দেখা দিয়েছিল ভোলানাথ তাকে মেনে চলেছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে উৎকলন করেছেন—'A man's biography is mostly his contemporaneons history' উক্তিটি। তাই দেখি দিগম্বর মিত্রের জীবনী রচনার সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা, আন্দোলন ও তৎসম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলির বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। তার কারণ রাজা দিগম্বর মিত্র তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালীর সর্বপ্রকার প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রেখেছিলেন। ভোলানাথ যে-যুগের কথা লিখেছেন, তিনি নিজেই সে-যুগের অধিবাসী। অতএব তিনি ঐ যুগের যাঁদের কথা লিখেছেন যেমন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল তাঁদের জীবনচিত্র চিত্তাকর্ষক হয়েছে। দিগম্বর মিত্রের জীবনের তথ্য তিনি নিজে সংগ্রহ করেননি, রাজার নিকট-আত্মীয়েরা বিশেষতঃ রাজযজ্ঞেশ্বর মিত্র তাঁকে দিয়েছিলেন। ভোলানাথ সেগুলিকে ঐতিহাসিক-ক্রম রক্ষা করে নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন। তবে জনসন্-বস্ওয়েল রীতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও এবং দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৯৬) ভূমিকায় ভোলানাথ বস্ওয়েল কথিত 'The picture shall have shade as well as light'-নীতি ঘোষণা করলেও কার্যতঃ তা ঘটে ওঠেনি। তিনি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দিগম্বরের পক্ষাবলম্বন করেছেন এবং 'রাজার' সঙ্গে যাঁরা মতৈক্য বোধ করেন নি তাঁদের সম্পর্কে ভোলানাথের মন্তব্য নিরপেক্ষতার দাবি করতে পারে না।[১৮] যেখানে তিনি স্বাধীন ভাবে লিখেছেন প্রকৃত শ্রদ্ধা নিয়ে, যেমন ডি. এল. রিচার্ডসন্ বা জর্জ টমসন্ সম্পর্কে, সেই প্রবন্ধগুলি উচ্চাঙ্গের রচনা হয়েছে।

কৈলাসচন্দ্র, প্যারীচাঁদ, কিশোরীচাঁদ, লালবিহারী ও ভোলানাথ—সকলেই সেকালের হিন্দু কলেজ অথবা জেনারেল অ্যাসেমব্লির ছাত্র। সকলেরই জন্ম উনবিংশ শতকের প্রথম পর্বে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা যে সুফল ফলিয়েছে তাঁরা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দেশের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনে

তাঁদের চিন্তা ও কর্মশক্তি সদা নিয়োজিত ছিল। ইহ-জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাহেতু সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে তাঁরা আঁকড়ে ধরেছিলেন। 'ব্যক্তি'র (Individual) নিজস্ব বিকাশ এই যুগে হয়েছে বলে একই সঙ্গে নিজের প্রতি ও অপরের প্রতি কৌতূহল ও শ্রদ্ধা জেগেছে।

ইহ-জগত ও ইহ-জীবন উভয়ের প্রতি মন আকৃষ্ট হলে ইতিহাসের প্রতি ঝোঁক পড়ে। যখন জাতির ইতিহাসে ঝোঁক পড়ে, রচিত হয় ইতিবৃত্ত আর সেই ঝোঁক যখন 'ব্যক্তি'র বা 'particular man'-এর উপর পড়ে তখন হয় জীবন-চরিত বা জীবন-বৃত্তান্ত। পাশ্চাত্য শিক্ষিত গোষ্ঠী নব্য বাংলা তথা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা সর্ব বিভাগে। তাঁরা চরিত সাহিত্যের যে 'মডেল' বা আদর্শ ইংরেজি সাহিত্য থেকে পেয়েছিলেন তারই অনুসরণে গড়েছিলেন আমাদের জীবনী সাহিত্যকে। 'Life', 'Life and Letters', 'Life and Times', 'Two volume biography'—অর্থাৎ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে যে-রীতিগুলি ব্যবহৃত হয়েছে ইংরেজি জীবনী সাহিত্যে, পূর্বোক্ত বাঙালী লেখকেরা বাংলাদেশে তাদের প্রচলন ঘটাবার চেষ্টা করেছেন।

পাদটীকা

১। Hoffding, A History of Modern Philosophy, Vol. I, 'The Discovery of Man' ch.

২। Collet, D. S., The Life and Letters of Raja Rammohun Roy, Appendix VII, Ed. by Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguli Cal. 1962.

৩। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যসাধক চরিতমালা)।

৪। পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত।

৫। Mittra, P. C., A Biographical Sketch of David Hare, Ch. I, Cal. 1877.

৬। ডিরোজিও কর্তৃক হোরেস্ হেমান্ উইলসনকে লিখিত দ্বিতীয় পত্র, Bengal Obituary, Cal. 1851.

৭। Poems of Derozio, Ed. by F. B. Bradley-Birt (Oxford 1923).

৮। Copleston, F., A History of Philosophy, Vol. V, p. 126.

৯। Ibid, p. 128.

১০। Bengal Harkaru and Chronicle. January 23, 1832, Native Papers.

১১। Duff. A., India and India Mission, p. 624. 1840.

১২। হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত, রাজনারায়ণ বসু, ১৮৭৬ শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৫৬।

১৩। Bengal Spectator, Sep. I, 1843, (শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার-কৃত History of Polictical Thought, Vol. I গ্রন্থে ১১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।

১৪। আত্মচরিত, রাজনারায়ণ বসু, ১৯০৯।

১৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭২ শক, চতুর্থ ভাগ, ৮৬ সংখ্যক।

১৬। প্যারীচরণ সরকার, নবকৃষ্ণ ঘোষ, ১৩০৯। 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।

১৭। মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র, মন্মথনাথ ঘোষ, পৃ ১২৪-২৫।

১৮। দিগম্বর মিত্র ১৮৭৮ সালের কুখ্যাত Vernacular Press Act-এর বিরোধিতা না করে, সমর্থন করেছিলেন। সেজন্য জনসাধারণ তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করেছিল (অমৃতবাজার পত্রিকা, ৬ জানুয়ারি ১৮৮২)।

॥ স্কুলপাঠ্য, স্ত্রীপাঠ্য ও শিক্ষামূলক চরিত ॥

দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটুক, স্কুলগুলিতে বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠন চলুক, স্কুলপাঠ্য বই ও নানা ধরণের শিক্ষাপ্রদ পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হোক এসবই পাশ্চাত্য-শিক্ষিত গোষ্ঠী চেয়েছিলেন। হিন্দু কলেজ ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিত্তবান হিন্দুদের ছেলেদের উচ্চ শিক্ষার জন্য। এই সালে ডেভিড হেয়ারের প্রযত্নে স্কুলবুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। পরের বছর ১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলা ভাষায় ছাত্রপাঠ্য ও স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ স্কুলবুক সোসাইটির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল প্লুটার্কের 'Lives' গ্রন্থের আদর্শে পরিকল্পিত 'সত্যইতিহাসসার' (১৮৩০)। লঙ্ তাঁর A descriptive catalogue of Bengali works (১৮৫৫) গ্রন্থে 'সত্যইতিহাসসার' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন "Sketches of Seruramis, Sesostris, Homer, Lycurgus, Romulus, Cyrus, Confucius, Pythagoras, Miltiades, Socrates, Demosthenes, Alexander—a translation of stories in ancient history, on the model of Plutarch's 'Lives'." বইখানিতে মোট উনসত্তরটি প্রসঙ্গ আছে, লঙ্ স্বভাবতই তালিকা প্রণয়ন কালে অল্প কয়েকটির উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছেন। উল্লেখিত প্রসঙ্গগুলি ছাড়াও পাওয়া যায় 'থিসুস্‌র বিবরণ', 'থিমিস্তক্লি প্রভৃতির বিবরণ', 'কীমোন প্রভৃতির বিবরণ', 'পেরিক্লি প্রভৃতির বিবরণ', 'হান্নিবাল সেনাপতি ও দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের বিবরণ', 'আন্তোনিক ও ক্লিওপাত্রার বিবরণ', শার্লিমান অর্থাৎ মহাশালি রাজার বিবরণ' প্রভৃতি বিবিধ ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনা। বাংলা ভাষায় এই প্রথম প্লুটার্ক-চর্চা। এর রচয়িতা পাদ্রী ইয়েটস্ (১৭৯২-১৮৪৫)।

ইংরেজি সাহিত্যে টমাস নর্থ প্লুটার্ক-রচিত 'Lives' গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৫৭৯ সালে। এলিজাবেথীয় যুগ প্রকৃতপক্ষে 'English Renaissance'-

এব যুগ, ঐ সময়ে প্লুটার্কের গ্রন্থের অনুবাদ স্বতঃই খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। 'সত্য, ইতিহাস সার'ও ছাত্র-পাঠ্য হওয়ায় বহুল প্রচলিত হয়েছিল।

ছাত্র-পাঠ্য বলেই এই বইয়েব সঙ্গে নর্থের অনূদিত গ্রন্থের তুলনা করা সংগত হয় না। প্লুটার্ক বর্ণিত চরিত্রগুলি এলিজাবেথীয় নবজাগরণ যুগের নর-নারীকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। শেক্সপীয়র তাঁর জুলিয়াস সিজার ও অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাত্রা ও কোরিওলেনাস নাটকে প্লুটার্ক থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন—বক্তব্যে, সংলাপ রচনায়, চরিত্রচিত্রণে।[১]

বাংলাদেশে প্লুটার্ক-বর্ণিত কোনো কোনো বিষয় রাধানাথ শিকদার সহজ বাংলায় লেখেন 'মাসিক পত্রিকা'র পাঠিকাদেব জন্য। হিন্দু পেট্রিয়ট (২৩শে মে, ১৮৭০) লিখেছিলেন :

> 'He was particularly fond of Greek and Roman literature and wrote several articles from Plutarch, Xenophon, etc. for the Patrika'.[২]

তখন বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষা তথা স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা চলেছে। সেজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয়েছিল স্কুলপাঠ্য ও সাধারণবোধ্য গ্রন্থের। কাজেই কৃষ্ণমোহন, বিদ্যাসাগব, অক্ষয়কুমার, ভূদেব সকলেই বাংলা ভাষায় সহজ পাঠ্যপুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। স্কুলবুক সোসাইটি ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি রচনার ও প্রচারেব বিরোধী ছিলেন।

যেভাবেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যে 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' বা 'Encyclopaedia Bengalensis' সংকলন করেন তার 'মঙ্গলাচরণ' অংশে তিনি জানিয়েছিলেন :

> "গৌড়ীয় ভাষাতে ইউবোপীয় পুরাবৃত্ত ও দর্শনাদি শাস্ত্রের বর্ণনা করা বহুদিবসাবধি আমাব অভিপ্রেত ছিল। বাল্যাবস্থাবধি আমার বাসনা ছিল যে স্বদেশীয়বর্গের সুশীলতাবৃদ্ধিব নিমিত্ত যত্ন করিব।… বঙ্গভূমির মধ্যে সাধারণের মতিভ্রম নিবারণার্থে গৌড়ীয় ভাষাতে পুরাবৃত্ত ও পদার্থবিদ্যার অনুবাদ এক উত্তম উপায় বোধ হইতেছে।… আমায় অভিপ্রায় এই যে…সকলের সুবোধক কথা ব্যবহার করিব, তথাচ রচনার মাধুর্য দর্শাইয়া মনোরঞ্জক শিক্ষাবিস্তারের ত্রুটি করিব না।"

'মনোরঞ্জক শিক্ষাবিস্তারের ত্রুটি' কৃষ্ণমোহন করেননি। পূর্বোক্ত গ্রন্থের

তৃতীয় খণ্ডে (১৮৪৬) 'বিবিধ বিষয়ক পাঠ' সঙ্কলিত হয়। তার দ্বিতীয় অধ্যায়টির সূচীতে পাই : 'narrative and historical, contains selections from Greek historians Herodotus, Plutarch, etc. Gandhari's lament from the Mahabharata, story of Rama and Bharata from the Ramayana and a legend about Kalidasa'. প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন ভারতীয় প্রসঙ্গ উভয়কেই তিনি পাশাপাশি উপস্থাপিত করেছেন। হেরোডোটাস ও প্লুটার্ক থেকে প্রসঙ্গ-উপস্থাপনা বিশেষ ভাবে মনে রাখবার মতো।

ঐ গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের নাম 'জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৪৭)। সূচীতে কৃষ্ণমোহন জানিয়েছেন : 'Biography, Part I. Containing the lives of Yudhisthira (original contribution), Confucius (from Du Halde's description of the empire of China), Plato (from Stanley's History of Philosophy), Vicramaditya (original contribution), Alfred (from Turner's History of the Anglo-Saxons), Sultan Mahmud (from Elphinstone's History of India)। এগুলি একাধারে ইতিহাস ও চরিতপ্রসঙ্গ, রচনার উদ্দেশ্য ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের 'মনোরঞ্জক শিক্ষা'। অবশ্য বলা দরকার যে, 'যুধিষ্ঠিরের চরিত্র', 'প্লেতোর চরিত্র' এবং 'বিক্রমাদিত্যের চরিত্র' প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনা, কৃষ্ণমোহনের নয়।[৩] 'বিবিধ বিষয়ক পাঠ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৪৭) 'পুরাবৃত্ত' অংশে তিনি হ্যানিবলের বিষয় প্রকাশ করেন। 'জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৫১) 'গ্যালিলিওর চরিত্র' প্রকাশিত হয়। রচনাটি জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের ইংরেজি ভাষায় লিখিত উক্ত জীবনী থেকে 'সংক্ষেপে সংগৃহীত' হয়।[৪]

বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণমোহনের বয়ঃকনিষ্ঠ। দুজনেই শিক্ষাব্রতী, দৃঢ়চেতা, দেশহিতৈষী, বঙ্গভাষানুরাগী, প্রাচীন শাস্ত্রসম্পাদনে যত্নবান ও দেশীয় 'সংস্কার' দূরীকরণে সক্রিয়। বিদ্যাসাগর যে স্কুলপাঠ্য 'জীবনচরিত' গ্রন্থ প্রকাশ করেন (১৮৪৯) তারও উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের কল্যাণসাধন। এই 'didactic tone' স্কুল-পাঠ্য চরিত গ্রন্থে খুবই স্বাভাবিক। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

"জীবনচরিত পাঠে দ্বিবিধ মহোপকার লাভ হয়। প্রথমতঃ কোন ২ মহাত্মারা অভিপ্রেতার্থ সম্পাদনে কৃতকার্য হইবার নিমিত্ত যেরূপ

অক্লিষ্ট পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ, মহীয়সী সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কেহ ২ বহুতর দুর্বিষহ নিগ্রহ ও দারিদ্রনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও যে ব্যবসায় হইতে বিচলিত হয়েন নাই তৎসমুদায় আলোচনা করিলে এককালে সহস্র উপদেশের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ আনুষঙ্গিক এতদ্দেশের তত্তৎকালীন রীতিনীতি, ইতিহাস ও আচার পরিজ্ঞান হয়।···

রবার্ট উইলিয়ম চেম্বার্স বহু সংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ মহানুভব মহাশয়দিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া ইঙ্গরেজি ভাষায় যে জীবনচরিত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হইলে এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিগণের পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে এই আশায় ঐ পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু সময়াভাবে ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিবন্ধকতাবশতঃ তন্মধ্যে আপাততঃ কেবল কোপার্নিকাস, গ্যালিলিয়, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশস্, লিনিয়স, ডুবাল, জেঙ্কিন্স, জোন্স এই কয়েক মহাত্মার চরিত অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল।”

রবার্ট (১৮০২-৭১) ও উইলিয়ম চেম্বার্স (১৮০০-৮৩) জনশিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে বইয়ের দোকান খোলেন (১৮১৯)। 'popular instruction' দানের উদ্দেশ্যে তাঁরা কুড়ি খণ্ডে "A Miscellany of Useful and Entertaining Tracts" (১৮৩৫) প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় Biography খণ্ডের সহায়তা গ্রহণ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শম্যানের গ্রন্থের 'শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনপূর্বক সঙ্কলিত' বাঙ্গালার ইতিহাস (১৭৫৬—১৮৩৫) ২য় ভাগ ১৮৪৮ সালে প্রকাশ করেন। ইতিহাস চর্চায় বিদ্যাসাগরের বিশেষ অনুরাগ ছিল। 'জীবনচরিত' সঙ্কলনে তিনি যাঁদের বিষয় বেছে নিয়েছিলেন তাঁদের নামগুলি যত্নসহকারে দেখলে নবযুগের শক্তিপুষ্ট বিদ্যাসাগর-মানস সহজেই উপলব্ধ হবে। ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'চরিতাবলী'তে ডুবাল, রস্কো প্রভৃতির জীবনী আলোচিত হয়।

বাঙালীদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের শক্তিতে বড়ো হয়েছেন তাঁদের চরিত্র অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় স্কুল-পাঠ্য শিক্ষামূলক (didactic) জীবনী রচনা করেন কালীময় ঘটক (১৮৪০-১৯০১)। তিনি হুগলী নর্মাল বিদ্যালয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি রানাঘাটে

বঙ্গবিদ্যালয়ে [Vernacular school] শিক্ষকতা করেন। তাঁর জীবনের শেষ দিকে কলিকাতা বয়েজ স্কুলে কিছুকাল কাজ করেছিলেন। তাঁর 'চরিতাষ্টক' প্রথম পর্যায় ১৮৬৮ সালে হুগলী থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি গ্রন্থখানি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নামে উৎসর্গ করেন। তাঁর 'চরিতাষ্টক' দ্বিতীয় পর্যায় ১৮৭৩ সালে কলিকাতা থেকে বার হয়। চরিতাষ্টকের প্রথম পর্যায়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, কৃষ্ণ শাস্ত্রী, রাজা রামমোহন রায়, পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়, মতিলাল শীল ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চরিত-কথা বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বিবৃত হয়েছে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রামদুলাল সরকার, ক্রোরীয়ান গোবিন্দ চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব, বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ, কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের চরিত।

কালীময়ের 'চরিতাষ্টক' গ্রন্থের প্রথম পর্যায় প্রকাশিত হলে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল: "বঙ্গভাষায় দেশীয় লোকদিগের জীবনচরিত ধারাবাহিক রূপে লেখার এই প্রথম উদ্যম।" 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাও এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার এসেছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাত থেকে। তিনি কালীময়কে লিখেছিলেন :

> "কালীময়, তুমি আমার অনেক শ্রম বাঁচাইয়াছ। দেশীয় ব্যক্তিগণের জীবনী সংগ্রহের ক্লেশ মনে করিয়াই আমি বিদেশী পুরুষ লইয়া 'চরিতাবলী' লিখিয়াছি। তোমার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম মনে করিয়া আমি যেমন সুখ পাইতেছি তেমনি অবাকও হইয়াছি।[৪]

কালীময় বাংলা ভাষায় বাঙালীর নিজের ইতিহাস ও চরিত গ্রন্থ না থাকার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর নিজের প্রয়াস সম্পর্কে যা লিখেছেন, তার প্রশংসা করা উচিত :

> "নানা স্থান ভ্রমণ, প্রাচীন কীর্তি ও চিহ্নাদি পর্যবেক্ষণ, জীবনবৃত্তান্ত সংক্রান্ত গ্রন্থ, সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদি পাঠ—প্রাচীন জনগণের প্রমুখাৎ শ্রুত বিবরণ, প্রচলিত কিম্বদন্তী পরম্পরার সমন্বয় ইত্যাদি দ্বারাই 'চরিতাষ্টক' লিখিত হইয়াছে।"

কালীময় 'রামমোহন', 'দ্বারকানাথ', 'রামগোপাল', 'রাধাকান্ত দেব', 'মতিলাল শীল', 'হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়', রচনাগুলিতে কিশোরীচাঁদ মিত্র রচিত

উক্ত ব্যক্তিগণের জীবনী-প্রবন্ধগুলির বিশদ ব্যবহার করেছেন। 'রামদুলাল সরকার' রচনাটিতে গিরিশচন্দ্র ঘোষের রামদুলাল সম্পর্কিত প্রবন্ধের ও 'মদনমোহন তর্কালঙ্কার' রচনাটিতে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের লেখা জীবনীর সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র ও ভারতচন্দ্র প্রবন্ধ দুটিতেও তাঁর কোনো মৌলিকতা নেই, সেখানে তিনি যথাক্রমে রাজীবলোচন ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনা থেকে সমস্ত উপাদানই সংগ্রহ করেছেন। তবে 'ক্রোরীয়ান গোবিন্দ চক্রবর্তী' এবং 'পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়' ও 'কৃষ্ণ পান্তী' কালীময়ের নিজস্ব রচনা।

বালক-বালিকাদের নৈতিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে সবদেশেই স্কুল-পাঠ্য জীবনী রচিত হয়েছে। ইংলণ্ডে দেখি এই 'didactic function' উদ্‌যাপনের প্রচেষ্টা হিসাবে প্লুটার্কের 'Lives' গ্রন্থের সংক্ষেপিত সংস্করণ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৭৬২) ও অলিভার গোল্‌ডস্‌মিথ উক্ত সংস্করণের প্রথম খণ্ডের 'ভূমিকা'য় এই শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার সমর্থনে লিখেছেন :

> "Biography has ever since the days of Plutarch, been considered as the most useful manner of writing, not only from the pleasure it affords the imagination but from the instruction it artfully and unexpectedly conveys to the understanding.
>
> It furnishes us with an opportunity to giving advice freely and without offence. It not only removes the dryness and dogmatical air of precept but sets persons, actions and their consequences before us in the most striking manner , and by that means turns even precept into example."

অবশ্য জীবনচরিত যে যুগপৎ 'pleasure' ও 'instruction' দান করবে, একথা প্লুটার্কই প্রথম বলেন। বেকন, বজার নর্থ, বস্‌ওয়েল, কোলরিজ প্রভৃতি মনীষীরা এই মতকে সমর্থন করেছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে ইংরেজি সাহিত্যে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে বহু ছাত্রপাঠ্য জীবনী প্রণীত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মেরি হপকিনস্‌ পিলকিংটন রচিত বইয়ের উল্লেখ করা যায়। বইখানির নাম ও রচনার উদ্দেশ্য এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে : "Biography

for boys; or characteristic histories, calculated to impress the youthful mind with an admiration of virtuous principles and detestation of vices." অর্থাৎ সদ্‌গুণের প্রতি বালকচিত্তে আকর্ষণ সৃষ্টি ও অসদ্‌বৃত্তির প্রতি চিত্তে ঘৃণা সঞ্চার এজাতীয় গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর মহাশয় বালকদের চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্য নিয়েই 'জীবনচরিত' ও 'চরিতাবলী' রচনা করেছিলেন। তাঁর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর 'চরিতমালা' (১৮৯৩) গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন:

> "আমি সুকুমারমতি বালকদেব শিক্ষার জন্য 'চরিতমালা' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে দেশীয় পঞ্চদশ কৃতবিদ্য মহাত্মাগণের জীবনী লিখিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছি।"

ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) প্রণীত 'নবচরিত' (১৮৮০) বইখানি অনুরূপ উদ্দেশ্যবহ। তিনি বর্ণিত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে নামের পূর্বে বিশেষণ বসিয়ে দিয়েছেন, যেমন—'স্বশক্তি-সমুত্থিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন', 'বৈদেশিক-পরহিতৈষী ডেভিড হেয়াব', 'ধর্মনিষ্ঠ দেওয়ান রামকমল সেন' ইত্যাদি।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪) তাঁর 'আত্মোৎসর্গ বা প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা'র মুখবন্ধে (১৮৮৩) লিখেছেন:

> "স্কুলসমূহের সুবিখ্যাত ইনস্‌পেক্টর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথামত আমি এই জীবনীমালা লিখিতে আরম্ভ করি। ইহা স্কুলসমূহের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট হইবে এই আশা পাইয়া আমি এই জীবনীগুলি কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করিযা লিখি।…
>
> ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে যে কয়েকটি চরিত্ররত্ন আহরণ করিয়াছি তাদৃশ উজ্জ্বল রত্ন আধুনিক সময়ে দুষ্প্রাপ্য। মহাভারত ও রামায়ণ পাঠে যে ফল এই মহাত্মাগণেব চরিত্র পাঠেও সেই ফল। এই সকল চরিত্রের অনুসরণে মানুষ দেবতা হয়।…চরিত্রসংগঠন যদি শিক্ষাব প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক বালককে এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণের চরিতমঞ্জরী পড়িতে দেওয়া প্রত্যেক অভিভাবক ও প্রত্যেক শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য।"

অমৃতলাল বসু (নাট্যকার নন) তাঁর 'জীবনসংগ্রহ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের (১৮৮৪) ভূমিকায় লিখেছেন:

"যদি ইহা পাঠে একজনও প্রীতিলাভ করেন, যদি একজনেরও হৃদয়মুকুরে বর্ণিত মহাত্মাদিগের স্বজাতিস্নেহ ও স্বদেশপ্রিয়তা প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলেই সমস্ত শ্রম সফলজ্ঞান করিব।"

গ্রন্থখানিতে রামদুলাল সরকার, রামমোহন রায়, রামগোপাল ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্যক্তির চরিতবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

উনবিংশ শতকের শেষ পাদে এই পর্যায়ের অসংখ্য বই বার হয়েছিল, তাদের মধ্যে মাধব ভট্টাচার্যের 'চরিত চতুষ্টয়' (১৮৭৫), কালীচন্দ্র ঘোষালের 'চরিতরত্নাবলী' (১৮৯৪), মন্মথনাথ চৌধুরীর 'সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ' (১৮৯৭) ধীরেন্দ্রনাথ পালের 'বঙ্গের পঞ্চরত্ন'(১৮৮৪)প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইংলণ্ডে বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্যও অনুরূপ জীবনীগ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। কলিকাতায় ১৮৪৯ সালে বালিকাদের শিক্ষার জন্য বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের সম্মুখে 'আদর্শ' নারী চরিত্র স্থাপনের আকাংক্ষা উদ্যোক্তাদের ছিল। ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর (১৮৪২) পর হেয়ার স্মৃতিকমিটি সৃষ্টি করেন 'হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড'। উক্ত কমিটির পক্ষ থেকে ১৮৫১ সালে বাংলা ভাষায় 'Exemplary biography of Females in ancient and modern times' প্রবন্ধরচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কোনো প্রবন্ধ পাওয়া যায় নি সে বছর।[৫] নীলমণি বসাকের (১৮০৮–৬৪) 'নবনারী' (১৮৫২) এই অভাব কিয়দংশে মোচন করে। নীলমণি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্র নীলমণি তাঁর মহান শিক্ষকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। 'নবনারী'র পাণ্ডুলিপি বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখে দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থে সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, লীলাবতী, খনা, অহল্যাবাঈ ও রাণী ভবানী এই নয়টি নারীচরিত্র সংকলিত হয়েছে। 'পৌরাণিক' ও কিম্বদন্তী-আশ্রিত চরিত্রের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের ঐতিহাসিক চরিত্র অহল্যাবাঈ ও রাণী ভবানী যে আলোচিত হয়েছেন তার কারণ তিনি তাঁদের 'আদর্শ' নারীচরিত্র বলে গণ্য করেছেন। এইখানে বলে রাখা ভালো, 'নবনারী' হিন্দু স্কুলে ছেলেদেরও পাঠ্য বই ছিল। বর্ণিত পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে দেখা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অর্থাৎ এখানে 'moral education' দানই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই ধরণের রচনার সঙ্গে উনবিংশ শতকের জাতীয় গৌরব সঞ্চারিণী মনোভাব বিদ্যমান ছিল। নীলমণি যে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'

(১ম-৩য় ভাগ) সংকলন করেছিলেন (১৮৫৭-৫৮) তার প্রথম ভাগের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি বাংলা ভাষায় লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস না থাকার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন যে ইংরেজের বই পড়ে এদেশের বালকদের—

"এমত সংস্কার জন্মে যে এ দেশের ধর্ম কর্ম সকলি মিথ্যা এবং হিন্দুরা পূর্বকালে অতি মূঢ় ছিলেন। অপর বালকেরা অন্য দেশের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে কিন্তু জন্মভূমির কোন বিবরণ বলিতে পারে না।"

সেই অভাব পুরণের জন্য নীলমণি 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' রচনায় অগ্রসর হন।[৬] 'নবনারী'র "ভূমিকা"য় নীলমণি তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন :

"পূর্বকালে এতদ্দেশে অনেক বিদ্যাবতী ও গুণশালিনী কামিনী ছিলেন, বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থে ইহা প্রকাশ আছে। এবং একালেও গুণবতী নারীর অভাব নাই। কিন্তু এতদ্দেশে জীবনচরিত লিখিবার প্রথা না থাকাতে তাদৃশ স্ত্রীদিগেব গুণ যশঃ বিশেষরূপে সর্বত্র বিদিত হইতে পারে নাই। এই ন্যূনতা পরিহার বাসনায় এবং বালিকারা সদ্গুণ বিশিষ্টা স্ত্রীদিগের উত্তম উত্তম চবিত্র দর্শন করিলে পবিত্র পথ অবলম্বন করিবেক এই অভিপ্রায়ে অশেষ প্রকার অনুসন্ধান ও নানা গ্রন্থ হইতে সঙ্কলনপূর্বক প্রাচীন ও আধুনিক নবনারীব চরিত্র লিখিত হইল।"

বিদ্যাসাগর ও নীলমণি বসাকের ধারায় বালিকাদের উপযোগী বহু নীতিশিক্ষামূলক স্কুলপাঠ্য জীবনচরিত রচিত হয়েছিল। বেথুন স্কুলের পর থেকে মফঃস্বল শহরগুলিতেও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয় (স্থাপিত-১৮৬০) তাব অন্যতম নিদর্শন। 'ইয়ংবেঙ্গল'দলের শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০) এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। মার্থা সৌদামিনী সিংহ এই বিদ্যালয়েরশিক্ষিকা ছিলেন, তিনি 'নারী চরিত' বা 'Exemplary and Instructive Female Biography'১৮৬৫ সালে প্রকাশ করেন। এই মহিলা কলিকাতা ফিমেল নর্মাল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূতপূর্বছাত্রী। লঙ্ সাহেবকে উৎসর্গ করা এই গ্রন্থখানিতে নয়টি য়ুরোপীয় নারীচরিত্র অনূদিত রূপে প্রকাশিত হয়েছে—হানা মুর, এথেলস্, বিবি কারটর, রাজ্ঞী মেবিয়া থেরিসা, মার্গ্রেট রোপর, মেরিয়া জী এগ্নিসি, লোকহিতৈষিনী এলিজাবেথ ফ্রাই, রুসিয়াধীশ্বরী ক্যাথারিন, লেডি জন গ্রে, হাইপেসিয়া। বইখানির সমালোচনায় 'রহস্য সন্দর্ভ' মন্তব্য করেছিল, "অনেক সুশিক্ষিত পুরুষে ইহার রচয়িতা হইলে প্রশংসাভাজন হইতেন।"

বিদ্যাসাগরের উক্তির প্রতিধ্বনি করে সৌদামিনী লিখেছেন, "জীবনচরিত পাঠে দুই প্রকার ফল লাভ হইয়া থাকে", "অতএব বঙ্গবিদ্যার্থিনী বালিকাগণের শিক্ষার জন্য আমি কতগুলি বিদ্যাবতী, গুণবতী ও ধার্মিকা নারীর জীবনচরিত ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় সংগ্রহ করিলাম।" এই ১৮৬৫ সালে রামসদয় ভট্টাচার্য ইংরেজি থেকে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন "বামাচরিত" আর কানাই-লাল পাইন প্রণয়ন করেন 'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল'।

'হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড' ঘোষিত পুরস্কার লাভ করেছিলেন গোপীকৃষ্ণ মিত্র 'মহিলাবলী' রচনা দ্বারা (১৮৬৭)। 'অনেক উপকার দর্শিতে পারিবে' এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই বালিকা-পাঠ্য গ্রন্থখানি বচনা করেন। এখানে এলিজাবেথ ফ্রাই, শারলোট ব্রন্টি, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, অহল্যাবাঈ প্রভৃতি চরিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। নীলমণি লিখেছিলেন 'নবনারী' তাঁর অনুসরণে দুর্গাদাস লাহিড়ী রচনা করেন 'দ্বাদশ নারী' (১৮৮৫)। সেখানে তারাবাঈ, ধাত্রী পান্না, অহল্যাবাঈ, বিদুলা, বেহুলা, রাসমণি, বাণী ভবানী, লক্ষ্মীবাঈ চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ও সমকালীন চরিত্র পাশাপাশি উপস্থাপিত হয়েছে।

প্লুটার্কের 'Lives' অবলম্বনে সহজ ভাষায় স্কুল-পাঠ্য বা সাধারণ-পাঠ্য বই লেখার প্রচেষ্টা সম্পর্কে এই অধ্যায়ের প্রথমে 'সত্যইতিহাস' এবং রাধানাথ শিকদারের রচনার উল্লেখ করা হয়েছে। এই সূত্রে স্কুলপাঠ্য না হলেও ভোলানাথ চন্দ্রের (১৮২২-১৯১০) প্রচেষ্টা আলোচনার যোগ্য। ভোলানাথ হিন্দু কলেজে রিচার্ডসনের ছাত্র, মধুসূদন, ভূদেব, রাজনারায়ণ, গৌরদাসের সতীর্থ। তিনি ইতিহাস ও চরিত উভয় পর্যায়ের রচনায় নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন।

১৮৬৯ সালের 'ক্যালকাটা রেভিউ' পত্রিকাব জানুয়ারি ও এপ্রিল সংখ্যায় ভোলানাথের 'Hindu Female Celebrities' নামে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অহল্যা, দ্রৌপদী, মৈত্রেয়ী থেকে অহল্যাবাঈ, ঝাঁসীর রাণী, রাণী ভবানী এবং রাণী রাসমণির ও মতিলাল শীলের সহধর্মিণীর পরিচয় পর্যন্ত এই প্রবন্ধগুলিতে দান করা হয়েছে। এদেশেব নারী-মহিমা প্রদর্শনের পিছনে ভোলানাথের দেশগর্বী মন জাগ্রত ছিল কিশোরীচাঁদ মিত্রের ১৮৬৩ সালে 'ক্যালকাটা রেভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'Hindu Females' রচনার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ভোলানাথ 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিনে' (১৮৯০-৯২) 'Outlines of Hindu

Celebrities' নামে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি সেখানে আক্ষেপ করে লিখেছেন যে, পাশ্চাত্যে প্লুটার্ক যেমন গ্রীক ও রোমীয়, পুরাণ ও ইতিবৃত্তের চরিত্রগুলিকে অবলম্বন করে তাঁর 'Lives' লিখেছেন, ভারতবর্ষে তেমন কোনো প্লুটার্কের অতীতে আবির্ভাব না হবার ফলে প্রাচীনকালের বরণীয় ভারতবাসীর জীবনচরিত, যা আমাদের যুগপৎ শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দদায়ক হতে পারত, সকলের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। ভোলানাথ অনেকটা প্লুটার্কের পন্থাবলম্বনে রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, পৃথ্বীরাজ, শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। পূর্বে রাখালদাস হালদার 'রাম' নামে রামচন্দ্রের একখানি স্কুলপাঠ্য জীবনী লেখেন (১৮৫৪)। রাখালদাস হালদার (১৮৩২-৮৭) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন।[৮] এই বইটি সম্পর্কে লঙ্‌সাহেব মন্তব্য করেছেন: professes to separate the mythical past from the historical on a similar plan to that of a civilian R. Cust, Esq. in the N. W. P. who has just published a life of Rama on the same principle for native school in English।—[৯] অর্থাৎ রামচন্দ্রকে এখানে দেবতা বা অবতার রূপে দেখা বা দেখানো হয়নি, একজন 'আদর্শ' ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপেই তাঁর বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই সূত্রে বলা দরকার পাঞ্জাবের বিচারপতি কস্ট্ নানকের একখানি জীবনচরিত লেখেন। ঐ বইয়ের অনুবাদ করেছিলেন বামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ১৮৬৫ সালে।

বাংলা ভাষায় গদ্যরচিত চরিতগ্রন্থ তখনো maturity বা বয়ঃপ্রাপ্তি অর্জন করেনি তবে নানা পথে তার যাত্রা শুরু করেছে। সেই যাত্রার আরেকটি পথ 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' ও তার দ্বারা পরিচালিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকা। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' (Vernacular Literature Society) স্থাপিত হয়।[১০] এর কমিটিতে প্রথমে ছিলেন বেথুন, সিটন কার, হজসন প্র্যাট, উড্রো, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ। কমিটি স্থির করেন বিলেতের 'পেনি ম্যাগাজিনের' আদর্শে তাঁরা স্বল্পমূল্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে সহজবোধ্য রচনা সংবলিত একখানি পত্রিকা প্রকাশ করবেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' মাসিক পত্রিকা ঐ উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয় (১৮৫১)। রাজেন্দ্রলাল মিত্র পত্রিকার প্রথম ছয় পর্বের সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। পত্রিকার

১ম পর্বের ১ম সংখ্যায় বিজ্ঞাপনে বলা হল, এই পত্রিকায়—'জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, সাহিত্যালঙ্কারাদি সকল শাস্ত্রের মর্ম' প্রকাশিত হবে। সে প্রতিশ্রুতি পালিত হয়েছিল। ইতিবৃত্ত ও জীবনী সমার্থবোধকভাবে বাংলায় তখন প্রচলিত ছিল। সহজবোধ্য ও সাধারণ-পাঠ্য, দেশীয় ও বিদেশীয়, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের চরিত্রচিত্র যেমন এই পত্রিকায় বর্ণিত হয়েছে তেমনি কবি, ধর্মগুরু ও আবিষ্কারকদের চরিত-বৃত্তান্তও পরিবেশিত হয়েছে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন যেমন 'গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত ও দর্শনাদি শাস্ত্রের বর্ণনা' করার অভিলাষ করেছিলেন 'মনোরঞ্জক শিক্ষাবিস্তারে'র জন্য, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় সর্বজনবোধ্য তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস ও চরিত-চর্চার দিক থেকে এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মূল্য আছে :

১৭৭৩ শক ১ম পর্ব ১ম সংখ্যা। শিখ ইতিহাস।
২য় সংখ্যা। রাজপুত্র ইতিহাস। (টডের গ্রন্থ অবলম্বনে)
রাজা চন্দ্রগুপ্তের সংক্ষেপ বিবরণ।
৩য় সংখ্যা। ভীল জাতির বিবরণ।
ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইতিহাস।
৪র্থ সংখ্যা। অশোক রাজার বিবরণ।
৫ম সংখ্যা। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। (হরিমোহন সেন)
১০ম সংখ্যা। পানিপতের যুদ্ধ।
১৭৭৪ শক ২য় পর্ব ১৪শ সংখ্যা। হাইদর আলি।
১৫শ সংখ্যা। ইলোরার গুহা।
কাশীর ইতিহাস।
১৮শ সংখ্যা। আকবর বাদশাহের জীবনচরিত।
১৯শ সংখ্যা। দয়ার মাহাত্ম্য, ডেভিড হেয়ার সম্পর্কিত স্মৃতিকথা। (নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।
২৩শ সংখ্যা। সওয়াই জয়সিংহের চরিত্র।
২৭শ সংখ্যা। ভারতচন্দ্র রায়।
৩য় পর্ব ২৮শ সংখ্যা। ডেভিড হেয়ার সাহেবের গুণবর্ণন।
(শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়)

২৯শ সংখ্যা।	মোহম্মদের জীবনচরিত। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।)
	মহারাজা রঞ্জিত সিংহের জীবন বৃত্তান্ত।
১৭৭৬ শক ৩৪শ সংখ্যা।	নূরজহানের বৃত্তান্ত।
৪র্থ পর্ব ৩৮শ সংখ্যা।	তিমুর শাহের জীবনচরিত।
	শিবজীর চরিত্র।
৪০শ সংখ্যা।	হুমাউন বাদশাহের জীবনচরিত।
৪১শ সংখ্যা।	বাবর শাহের জীবনচরিত।
৪৪শ সংখ্যা।	শাক্যমুনির জীবন বৃত্তান্ত।
	টিপু সুলতানের জীবন বৃত্তান্ত।
৪৫শ সংখ্যা।	কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস। (টডের অবলম্বনে) (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।)
৪৭শ সংখ্যা।	মহাবীর।
৪৮শ সংখ্যা।	কলম্বসের জীবন বৃত্তান্ত।
৫ম পর্ব ৫০শ সংখ্যা।	সমরু বেগমের উপাখ্যান।
৫১শ সংখ্যা।	কঙ্‌ফুসে।
	রাজশাহী জেলার নাটোর রাজবংশের বিবরণ।
৫৫শ সংখ্যা।	অজন্তা নগরের বিবরণ।
৫৭শ সংখ্যা।	ওয়েলিংটনের জীবনচরিত। (মহেশচন্দ্র বসু।)
	কাপ্তেন কুকের জীবনবৃত্তান্ত।
৫৯শ সংখ্যা।	শিবজীর চরিত্র।

৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বে অওরঙ্গজেব পাদশাহ, রুশিয়াধিপতি পিটার, মঙ্গোপার্ক, জোয়ান অব আর্ক প্রভৃতির জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

উদ্ধৃত তালিকা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হবে যে 'জনপ্রিয়' (popular) ইতিহাস ও চরিত-প্রবন্ধ রচনার পরিধি কোনোক্রমেই সেদিন সংকীর্ণ ছিল না। এই রচনাগুলির মধ্যে উচ্চাঙ্গের কোনো মৌলিক গবেষণা নেই, থাকবার কথাও নয়। বেশির ভাগ রচনাই ইংরেজি বই বা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এগুলির দ্বারা ছাত্র ও সাধারণ বাঙালী পাঠকের 'ঐতিহাসিক' চরিত্র ও স্থানগুলি এবং ধর্মগুরু ও আবিষ্কারকদের সম্বন্ধে

মানসিক কৌতূহল জাগ্রত ও কথঞ্চিত তৃপ্ত হয়েছে এবং বাংলা ভাষায় চরিত-প্রবন্ধ বা চরিত-গ্রন্থ রচনার পথ সহজ হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৫ সালে (১লা আষাঢ় ১২৬২) 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। দেখা যায় তার পূর্বে এমন পূর্ণাঙ্গ, তথ্যপূর্ণ, কবিজীবনী বাংলায় প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' ১৭৭৬ শকের পৌষ (৩৪শ খণ্ড) সংখ্যায় 'ভারতচন্দ্র রায়' শীর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত রচনা (১৮৫৪) ছাপা হয়। ঐ প্রসঙ্গে লেখা হয়:

> "এ দেশের কবিদিগের জীবনচরিত প্রাপ্ত হওয়া অতি কঠিন, অতএব রায় গুণাকরের বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা লিখিতে পারিলাম না। তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত তারকানাথ রায় মহাশয় অধুনা মুলাজোড়ের গ্রামে বাস করিতেছেন।...তাঁহার স্বকরকমলাঙ্কিত রচন-রচনার প্রমাণ ও যথাশ্রুত কিম্বদন্তী অনুযায়ী এ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র লিখিতে সঙ্কল্প করিতেছি।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও তারকনাথ রায়ের সহায়তার কথা উল্লেখ করেছেন:

> "এই মহাশয়ের অপার কৃপায় তাঁহার পিতামহ রায় গুণাকরের 'জীবন-বৃত্তান্ত' এবং এই সকল অপ্রকাশিত কবিতার অধিকাংশই প্রাপ্ত হইয়াছি..."

'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার সপ্তম পর্বের অষ্টম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদনা করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪১-৭০)। ১৮৬২ সালের জানুয়ারি মাসে ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি ও স্কুল বুক সোসাইটির সম্মিলন ঘটে। তার ফলে ১৮৬৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকা বার হয়। বিবিধার্থ সংগ্রহের 'পদাঙ্কানুসরণার্থে সঙ্কলিত' পত্রিকাখানির প্রথম ছয় পর্বে রাজেন্দ্রলালের হাত ছিল। রহস্য সন্দর্ভেও সাধারণবোধ্য ও শিক্ষামূলক ইতিহাস ও চরিত-বিষয়ক অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

১ম পর্ব	১১শ	খণ্ড	অযোধ্যার ভূতপূর্ব রাজবংশ।
২য় পর্ব	১৬শ	"	উৎকলদেশীয় প্রসিদ্ধ কবি দীনবন্ধু দাস, উপেন্দ্র ভঞ্জ।
৩য় পর্ব	৩৩শ, ৩৫শ	"	ফর্দ্দুসী, সাদী, হাফেজ।
৪র্থ পর্ব	৪০শ	"	বালাজী পণ্ডিত।
	৪১শ	"	স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের জীবনবৃত্তান্ত।
	৪২শ	"	আসফদ্দৌল্লা।

৪র্থ পর্ব	৪৩শ	খণ্ড	উইলিয়ম কেবিব জীবনচরিত।
	৪৬শ	„	কর্নওয়ালিশের জীবনচবিত।
	৪৮শ	„	হেস্টিংস সাহেবেব জীবনচবিত।
৫ম পর্ব	৪৯শ	„	এলাইজ ইম্পে।
	৫৩শ	„	প্লেতোর জীবনবৃত্তান্ত।
	৫৫শ	„	মহাকবি তাসোব জীবনচবিত।
৭ম পর্ব	৬৮শ	„	পণ্ডিতবব থিয়োডোব গোল্‌ডস্টুকব।
	৭০শ	„	নিকলাস সণ্ডাবসনেব জীবনবৃত্তান্ত।
	৭১শ	„	এবিস্টটলেব জীবনবৃত্তান্ত।
	৭৫শ	„	প্রথম নেপোলিয়নেব সংক্ষেপ বিববণ।
	৭৬শ	„	জজ ওয়াশিংটনেব জীবনবৃত্তান্ত।
	৭৭শ	„	বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজেব চেষ্টায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ ও 'বহস্য সন্দভ' পত্রিকাব প্রকাশ ঘটেছিল। সাহিত্য, ইতিহাস ও চবিত বিষযক সর্বজনবোধ্য এই বচনাগুলি পাঠকদেব প্রভূত কল্যাণ সাধন কবেছিল। উক্ত অনুবাদক সমাজ জনশিক্ষা, বিশেষত বালক- ও স্ত্রীশিক্ষাব উপযোগী অনুবাদ প্রকাশেব জন্য Bengali Family Library-ব পবিকল্পনা কবেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের 'গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ' পযায়ে মধুসূদন মুখোপাধ্যায়েব 'অহল্যা হড্ডিকাব জীবন-বৃত্তান্ত', 'নূবজাহান বাজ্ঞীব জীবনবৃত্তান্ত', 'জাহানিরাব চবিত্র' (১৮৫৮) এবং বামনাবায়ণ বিদ্যাবত্নেব 'এলিজাবেথ', (১৮৬৪) 'নানকেব জীবনচরিত' (১৮৬৫) বইগুলি বাংলা চবিতসাহিত্যের দিক থেকে কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে বলা দবকাব যে 'অহল্যা হড্ডিকাব জীবনবৃত্তান্ত', 'জাহানবাব চবিত্র' বা 'এলিজাবেথ', ইংবেজি থেকে অনূদিত এই বইগুলি Fictitious Biography বা 'কাল্পনিক' জীবনচবিত। তাই অহল্যা হড্ডিকাব কাহিনীতে হুমাযুন, অহল্যা-গৌতম, গৌতমেব মৃত্যু, বৈবাম খাঁ সবই আছে। আব 'Exiles of Siberia' বই থেকে গৃহীত হয়েছিল 'এলিজাবেথ' অথবা 'এলিজাবেথ কর্তৃক পিতার বিবাসন মোচন' গ্রন্থের আখ্যান। এই গ্রন্থের অনুবাদের উদ্দেশ্য ছিল :

> "ভারতবর্ষীয় সমাজের উন্নতিসাধনের নিমিত্ত যে সমস্ত সুনিয়ম স্থাপন ও সদুপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহার মধ্যে দেশীয় নারীগণের আচার ব্যবহার মার্জিত ও শোধিত কবিবার চেষ্টা পাওয়াও এক প্রকার উপায়

বলিয়া গণ্য। সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র নারীরা অতি মহৎ সৎকার্য সমাধান করিতে যে কি পর্যন্ত ক্ষমতা প্রকাশ করে ও তাহা সমাহিত করিয়া কতদূর পর্যন্ত প্রশংসিত হয় এই 'এলিজাবেথ' ও ইহার তুল্য পুস্তক সকলই তাহার নিদর্শনস্থল।"

'জাহানিরার চরিত্রে'র 'ভূমিকা'য় বলা হয়েছে :

"এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠকবর্গ জানিতে পারিবেন স্ত্রীলোক সুশিক্ষিত হইলে কীদৃশ গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে পারে।"

বাংলা চরিত-সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি এই বইগুলির সেদিক থেকে বিশেষ মূল্য কিছু নেই। তবে নানা ধরনের জীবনী বা জীবনোপন্যাস লেখার চেষ্টা চলেছিল 'আনন্দ' ও 'শিক্ষা' দানের উদ্দেশ্য নিয়ে, এই বইগুলিতে তার নিদর্শন রয়েছে।

পাদটীকা

১। Shakespeare's Plutarch, Ed. by. C. F. Tucker Brooke, Vol. I.

২। রাধানাথ শিকদার, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা পৃঃ ২২০।

৩। 'Abridged from Bethune's Life of Galileo in the Library of Useful Knowledge. Adapted to encourage Hindus in opposing the prejudice of their age'.—Long, A descriptive catalogue of Bengali works, 1855.

৪। Long, A Return of the Names and Writings of 515 persons, 1855, p. 55.

৫। স্বর্গত কালীময় ঘটকের জীবনী, আশুতোষ ধর, ১৯০১।

৬। A Biographical Sketch of David Hare, P. C.Mittra 1877.

৭। নীলমণি বসাক, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ২৭ সংখ্যক।

৮। মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র, মন্মথনাথ ঘোষ ১৩৩১।

৯। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মচরিত, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৪০৭-০৮।

১০। Long, A descriptive catalogue of Bengali works, 1855.

১১। বাংলার নব্য সংস্কৃতি, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, পৃঃ ৪১।

প্রথম বাংলা পূর্ণাঙ্গকল্প চরিতগ্রন্থ

আমরা দেখেছি 'Biography' বা জীবনীর সংজ্ঞায় 'particular man' বা বিশেষ একটি মানুষের জীবনবৃত্তান্তের কথাই বোঝানো হয়েছে। বেকন ও ড্রাইডেন এই সূত্রকে স্বীকার করেছিলেন এবং তাঁরা ইতিবৃত্ত থেকে জীবন-বৃত্তান্তকে স্বতন্ত্র করে দেখেছিলেন। আমাদের বাংলা সাহিত্যে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বা 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' রচিত হয়েছে যথাক্রমে ১৮০১ ও ১৮০৫ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কেরী সাহেবের প্রচেষ্টায়।

বাংলাভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত সাময়িক পত্র 'সমাচার দর্পণে' বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু উপলক্ষে 'obituary' বা শোকপ্রস্তাব হিসাবে তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশের কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। রামমোহন রায়ের সহযোগী ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের (১৭৮৬-১৮৪৫) মৃত্যুর পর (২রা মার্চ) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনীবৃত্তান্ত বা biographical account প্রকাশিত হয় (১লা বৈশাখ, ১৭৬৭ শক)। দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪-১৮৪৬) মৃত্যুর পর (১ অগস্ট, ১৮৪৬) 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী বার হয়।[১] এই ধরনের রচনা সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় আরো অনেক আছে।

কিন্তু মনে হয় সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে বাংলা-ভাষায় রচিত প্রথম উল্লেখযোগ্য চরিতগ্রন্থ "ধর্মসভার অতীত সম্পাদক ৺বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনচরিত দৃষ্ট শ্রুত পবিত্র চরিত্র বিবরণ।" গ্রন্থখানি ১৮৪৯ সালের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।[২] ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) মৃত্যুর পর (২০শে ফেব্রুয়ারি, '৪৮) তাঁর পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ধর্মসভা'র সম্পাদক নির্বাচিত হন। 'ধর্মসভা'র উদ্যোগে ও তাঁর তত্ত্বাবধানে ভবানীচরণের এই জীবনীখানি সংকলিত ও প্রচারিত হয়। বস্তুতঃ এই গ্রন্থখানি নাতিদীর্ঘ হলেও আমরা তাকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রকৃত পূর্ণাঙ্গকল্প জীবনচরিত আখ্যা দিতে পারি। ভবানীচরণ উনবিংশ শতকের বাংলাদেশে একজন বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর 'ফ্রেণ্ড অব

ইণ্ডিয়া' পত্রিকা তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিল 'one of the ablest men of the age'—এবং এই মন্তব্যে অনেকেই একমত হবেন।

ভবানীচরণ হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল শাখা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মসভা'র (১৮৩০ সালের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে ধর্মসভা স্থাপিত হয়) সম্পাদক পদে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। সেই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই 'জীবনচরিত' গ্রন্থ রচিত হয়। কাজেই এ গ্রন্থে 'ধর্মসভা' ও তার মত-পথ সম্পর্কে অথবা ধর্মসভা-বিরোধীদের উদ্দেশ্যে যে সব মন্তব্য করা হয়েছে সেগুলি সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য না হলেও ভবানীচরণের জীবনচরিতের দিক থেকে গুরুত্বহীন নয়। আবার 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠান যে সব ভালো কাজ করেছে এই জীবনচরিত গ্রন্থে তারও উল্লেখ আছে। ভবানীচরণ 'ধর্মসভা'র সম্পাদক ছিলেন কাজেই তাঁর জীবনচরিত রচনায় ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের আলোচনা থাকা খুব স্বাভাবিক :

> "পাদ্রি সাহেবরা বিদ্যাদানচ্ছলে হিন্দু বালককে যে ভ্রষ্টাচারী করিতে নিতান্ত যত্নবান্ তন্নিবাবণ কারণ শীল্স ফ্রি কালেজ নামক অবৈতনিক বিদ্যালয় এই সভার অধীন স্থাপিত হয়, নগরীয় প্রধান বংশ্য বালক বৃদ্ধাতুব বিধবাদি গ্রাসাচ্ছাদনে অবসন্ন হইলে এই সভ্যদ্বারা দানপত্রী হইয়া যথাযোগ্য মাসিক বৃত্তিস্বরূপ বিত্ত পাইয়া থাকেন ইত্যাদি প্রকার দেশীয় নানা মঙ্গল এই সভা দ্বারা হইয়া থাকে, এবম্ভূত ধর্মসভার সৃষ্টিকর্তা উক্ত মহাশয় তজ্জন্য ইহার সভ্যেরা এই সভার সম্পাদকত্ব পদে তাঁহাকে অভিষিক্ত করেন ইতি।"

কিন্তু তার চেয়ে বড়োকথা, গ্রন্থখানিতে ভবানীচরণের পিতৃপরিচয়, জন্ম, বাল্যশিক্ষা, উপনয়ন, বিবাহ, পত্নীর মৃত্যু, পুনরায় দারপরিগ্রহ থেকে তাঁর কর্মজীবনের বিভিন্ন স্তর, তীর্থযাত্রা, সাময়িক পত্রিকা-সম্পাদন, সাহিত্যসৃষ্টি অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের আদ্যন্ত তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ হওয়ায় এর মূল্য বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে। গ্রন্থের শেষে বিভিন্ন সাময়িক পত্রের মতামত, ভবানীচরণের কাযাবলীব নানা সার্টিফিকেট সন্নিবেশিত হয়েছে। আমরা জানি এই পদ্ধতিতে গ্রন্থ রচনা মৌলিক কিছু নয়। কেন না আমরা দেখেছি ইংরেজি সাময়িকপত্র ও জীবনচরিত গ্রন্থ থেকে এই প্যাটার্ন বা আদর্শ পূর্বেই গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সমকালীন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনের বৃত্তান্ত অবলম্বনে বাংলায় একখানি পূর্ণাঙ্গকল্প তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী গ্রন্থ রচনা এই প্রথম। 'দৃষ্ট' ও

'শ্রুত' উভয় উপাদানই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এই জীবনী গ্রন্থখানির মধ্যে শুধু একটি মানুষের নয়, সে-যুগের কলিকাতার বাঙালী হিন্দুসমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

ভবানীচরণ একজন 'public man' ছিলেন, তিনি 'সমাচারচন্দ্রিকা'র সম্পাদক, 'ধর্মসভা'র সম্পাদক, 'নববাবুবিলাসে'র রচয়িতা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মনুসংহিতা, রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকাশক। এই ধরনের মানুষের জীবনবৃত্তান্ত কৌতূহলোদ্দীপক হওয়া স্বাভাবিক। 'সমাচার চন্দ্রিকা' রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মুখপত্র ছিল। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার ১৮২১ সালে ৪ঠা ডিসেম্বর 'সংবাদ কৌমুদী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল রামমোহন রায় এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধাদি লিখতেন। সহমরণ-বিরোধী প্রবন্ধ 'সংবাদকৌমুদী'তে প্রকাশিত হওয়ায় হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল শাখা 'সমাচারচন্দ্রিকা' নামে একখানি পাল্টা সাপ্তাহিক বার করেন ১৮২২ সালের ৫ই মার্চ তারিখে। ভবানীচরণের জীবনচরিতে ঐ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে, 'ধর্ম বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায় ঐ পত্র পরিত্যাগপূর্বক' ভবানীচরণ 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় যোগ দেন মূলতঃ সহমরণ প্রথা সমর্থনের জন্য।[৩] এই সূত্রে বলা দরকার 'ধর্মসভা' সতীদাহের পক্ষ সমর্থনের জন্য ফ্রানসিস্ বোথিকে ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিল প্রিভিকাউন্সিলে আবেদন করতে।[৪] সে আবেদন ব্যর্থ হয়। ১৮৩০ সালে ১৭ই জানুয়ারি তারিখে 'ধর্ম সভা' স্থাপিত হয়। ঢাকা, পাটনা, দানাপুর, আন্দুল, প্রভৃতি স্থানে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা ছিল। খ্রীষ্টানপাদ্রি ও 'কুপথবিহারী নাস্তিক মতাক্রান্ত হিন্দুসন্তানদিগের' হাত থেকে 'স্বদেশীয় ধর্মরক্ষার্থ' এই সভা নানারূপ চেষ্টা করেছিল। ভবানীচরণ এই সভার 'সম্পাদকত্ব পদে অভিষিক্ত' হয়েছিলেন। ব্রহ্মসভা, খ্রীষ্টসভা ও ধর্মসভার দ্বন্দ্বে উনবিংশ শতকের বাংলার প্রথমভাগ অতিমুখর। মনে রাখতে হবে ১৮৩০ সালে ২৭শে মে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ কলিকাতায় আসেন এবং তাঁর মুখ্য অভিপ্রায় ছিল শিক্ষিত বাঙালীদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা।[৫] কাজেই ভবানীচরণের জীবনচরিতখানি 'ধর্মসভা'র বক্তব্য ও ভূমিকা জানবার দিক থেকে বিশেষ উপযোগী।

তাছাড়া এই জীবনচরিতে ভবানীচরণের বাল্যজীবন, কর্মজীবন ও তীর্থ-ভ্রমণ প্রভৃতির যে তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে ভবানীচরণের

'ব্যক্তি'-মূর্তিটি কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুত্র তাঁর পিতার জীবনের তথ্য জানবার শ্রেষ্ঠাধিকারী, কাজেই পুত্র রাজকৃষ্ণ যে পিতার জীবনচরিত সংকলনে ব্রতী হয়েছিলেন, সেটাই সংগত ও স্বাভাবিক। আমরা এই 'জীবনচরিত' থেকে তাঁর জন্ম ও পিতৃপরিচয় সম্পর্কে জানতে পারি :

"১১৬৪ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নবাবের সেনা নিরাকরণপূর্বক পলাশীর প্রান্তরে জয়পতাকা উড্ডীয়মানা করিয়া বঙ্গরাজ্য আত্মসাৎ ফলতঃ কলিকাতা নগরে রাজাসন স্থাপন পুরঃসর ক্রমশঃ সৌভাগ্য সহকারে ক্বচিৎ কৌশলে ক্বচিৎ সম্প্রহারে ক্বচিদুপকারে ভারতবর্ষীয় স্বাধীন রাজ্যসমূহকে বশীভূত করিয়া বর্দ্ধিষ্ণু হইলেন···এই কালে পরগণা উখড়ার অন্তঃপাতী নারায়ণপুরনিবাসী ৺রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধনোপাজনাভিলাষে কলিকাতা নগরে সমাগত হইয়া প্রথমত টাঁকশালের পদবিশেষে নিযুক্ত থাকিয়া অল্পকাল মধ্যে স্বকীয় সদ্ব্যবহার ও শীলতা সাধুতায় সকলের নিকট গণ্যমান্য পূজ্য হইলেন।

উক্ত মহাত্মার জ্যেষ্ঠপুত্র বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯৪ সালের আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে উক্ত পরগণার উক্ত গ্রামে জন্মপরিগ্রহ করেন··· তাঁহার পিতা কলিকাতা মধ্যে কলুটোলা স্থানে একখানি বাটী ক্রয়পূর্বক তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া শুভদিনে বিদ্যারম্ভ করাইলেন, যদিচ তৎকালে এক্ষণকার ন্যায় বিদ্যাশিক্ষার সরল সরণি ছিল না সুতরাং সামান্য শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হইলেন।"

তবুও 'স্বকৃত সুকৃতিবশতঃ' ভবানীচরণ 'বঙ্গীয় পারসীয় এবং ইংলণ্ডীয় অর্থকরী বিদ্যা', অর্জন করে 'পরিবার পালনে ভারাক্রান্ত পিতার সাহায্যার্থ ষোডশ বর্ষ বয়ঃক্রমে বিষয়কর্মাভিষিক্ত হন।'

তাঁর পারিবারিক ঘটনা সম্পর্কে লেখা হয়েছে :

মান্য মহাশয় নবম বর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত ও দশম বর্ষে উদ্বাহিত হন, পরগণা উখড়ার অন্তঃপাতী মল্লিক নওয়াপাড়া গ্রামনিবাসী ৺কালীকিঙ্কর মল্লিকের কন্যার সহিত তাঁহার প্রথম পরিণয় হয়, তাঁহার বিংশ বর্ষ বয়সে প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার দুই বৎসর অন্তরে দ্বিতীয় পুত্র রাজরাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার চতুর্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে উক্ত পত্নী দৈহিক পীড়োপলক্ষে গতপ্রাণা হন···জনকের তন্নুল্লঙ্ঘ্য অনুমতিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, তৎপত্নী-

গর্ভে শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সতী নাম্নী কন্যার জন্ম পরিগ্রহ হয়।…

ভবানীচরণের কর্মজীবনের যে বিস্তৃত, তথ্যভূয়িষ্ঠ বিবরণ এই বইখানিতে দেওয়া হয়েছে তাব মধ্য দিয়ে ভবানীচরণের জীবনবৃত্তান্ত জেনে নেবার সহায়তা হয়, তেমনি তার সঙ্গে উনবিংশ শতকের প্রথম-পর্বের বাংলা দেশের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ইতিহাসের রূপ ও রূপান্তর আংশিক ধরা যায়। শহর-কলিকাতার বিস্তার, বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রসার, বেনিয়ান-মুচ্ছুদ্দী প্রভৃতির বৃত্তি-গ্রহণের মধ্যে সেকালের বাংলাদেশের ইতিহাসের বিশিষ্ট পরিচয় লভ্য। ভবানীচরণের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করলে দেখা যায় তিনি শুধু 'সমাচারচন্দ্রিকা'র সম্পাদক, 'ধর্মসভা'র নেতা, 'নববাবুবিলাসে'র রচয়িতা বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, 'প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটক' প্রভৃতির প্রকাশক মাত্র ছিলেন না। তাঁর আরো এক বিচিত্র কর্মজীবন ছিল বলে এই গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি :

"বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমত ডকেট কোম্পানীর কার্যালয়ে সরকারী [সরকার হিসাবে] কার্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পকাল মধ্যে স্বীয় পরিশ্রমে কার্যপাবদর্শিতা ও কৃতজ্ঞতা গুণদ্বারা সাহেবের অনুগ্রহ লাভ করত সদর মেটের কর্মে নিযুক্ত হন, তাহার এক বৎসর অন্তর ঐ হৌসের মুৎসুদ্দি হইলেন এইরূপে কিয়ৎকাল যাপন পরে শুভকালের উদয়ে তাঁহার হৃদয়ে দিগ্‌দর্শনের প্রবৃত্তি উদয় পাইল… তিনি পিত্রাদির প্রবোধোদয়ার্থ প্রচুরার্থ উপার্জনের প্রয়োজন জানাইয়া ১২২১ সালে সর উলিয়ম ক্যার সাহেবের সহিত পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিলেন…পরে সাহেবের সহিত মিরাটে অবস্থিত হইয়া সময়ে সময়ে তীর্থাদি ভ্রমণ করতঃ মনস্থ করিলেন যে কিঞ্চিদর্থ সংগ্রহপূর্বক বদরিকাশ্রমাদি যে সকল দূরস্থ দুর্গম তীর্থ আছে তাহা দর্শনে যাইবেন, কিন্তু এক দিবস মিরাটের মধ্যে কস্যচিৎ তীর্থাশ্রমির নিকট পুরাণ শ্রবণ কালে গার্হস্থ্যধর্ম প্রকরণে জ্ঞাতা হইলেন যে পিতৃমাতৃ সেবনে ধর্মনিষ্ঠ গৃহির সর্বতীর্থ দর্শনজাত সম্যক্ ফলোদয় হয়, পিতৃসেবাবিমুখ ব্যক্তির অনিষ্ট ব্যতীত তীর্থদর্শনে অভীষ্ট লাভ হইতে পারে না, এই পৌরাণিক উপদেশে পরিশেষে তাঁহার হৃদয়স্থা প্রগল্‌ভা আশা সংযতা হইল, পরে পঞ্চম বৎসরে স্বধামে পুনরাগত

হওত পিত্রাদির আনন্দবর্ধন হইলেন, অনন্তর সর উলিয়ম ক্যার সাহেব মিরাট হইতে আসিয়া কলিকাতা দুর্গের মেজর জেনরলী পদাভিষিক্ত হইলে উক্ত মহাত্মা তাঁহার নিজের মুৎসদ্দি হন, কিয়ৎকালাভ্যন্তরে তাঁহার বিলাতগমন প্রযুক্ত কৌন্সেলী কেম্পটন সাহেবের বাটীতে কার্যাভিষিক্ত হইলেন, কালাত্যয়ে ঐ সাহেব বোম্বাই গমন করাতে তিনি সব চারল্‌স ডাইলি সাহেবের নিকট কলিকাতা পরমিটের দারোগাগিরি কর্মে নিযুক্ত হইয়া কার্যদ্বারা সরকার বাহাদুরের অনেক ২ লাভের সোপান দর্শন করাইলে সাহেব তৎপ্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রধান কলকিউলেটরের কর্মে নিযুক্ত করিলেন, কালক্রমে ঐ সাহেবেব পাটনা গমন ও ক্যার সাহেবের বিলাত হইতে প্রত্যাগমণ প্রযুক্ত পরমিটের কর্ম পরিত্যাগপূর্বক উক্ত সাহেবের নিজকার্য করিতে লাগিলেন, তৎপরে দ্বিতীয়বার ঐ সাহেব বিলাতগামী হইলে তিনি বিশাপ মিডলটন সাহেবের কর্মে প্রবৃত্ত হন, পরে সুপ্রিম কোর্টের চিফ জুস্টিস সব হেনেরি ব্লাপেট সাহেবের নিজের মুৎসদ্দি হইলেন, এক দিবস লার্ড বিশাপ হিবর সাহেব তাঁহার কাযদক্ষতা নির্লোভিতা সত্যবাদিতাদি সদ্‌গুণের কথা শ্রবণ করিয়া আহ্বানপূর্বক নিজকাযে নিযুক্ত করেন, এবম্প্রকারে কিছুকাল গত হইলে সর ক্রাইস্টফর পুলর সাহেব চিফ জুস্টিসী পদে অভিষিক্ত হইয়া প্রসঙ্গায়ত্ত তাহার গুণানুরাগ শ্রবণে গুণগ্রাহী সাহেব লার্ড বিশাপ সাহেবকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করতঃ নিজকার্যের ভারার্পণ করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য উভয়স্থানীয় কার্যনির্বাহ করিতে হইয়াছিল, কএক মাস পরে চিফ জুস্টিস সাহেব লোকান্তরিত হইলে তিনি কেবল লার্ড বিশাপের কর্ম নির্বাহ করিতে লাগিলেন, ঐ কালে উক্ত সাহেব বিশাপ্‌স কালেজ নামক বৃহদ্বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তদধ্যক্ষতা পদে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন, কতক কাল ঐ কার্য করিয়া পরে শোলাদানার নিমক এজেণ্ট মেং জিনিং সাহেবের অধীনে শোলাদানার মধ্য ডিবিজনের সেরেস্তাদারী পদে নিযুক্ত হন [জানুয়ারি ১৮২৬], কালক্রমে তথাকার বায়ু বারি তৎসম্বন্ধে স্বাস্থ্যকারি না হওয়াতে তিনি বাটী আইসেন, পরে ঐ কাছারি এবালিস হইলে কিছুকালের জন্য হুগলির কালেক্‌টরী খাজাঞ্চীগিরি

কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তদনন্তর ইংলিসম্যান পত্রের বিখ্যাত সম্পাদক মেং ইস্টাকুইলর সাহেব তাঁহাকে নিজ আফিসের অধ্যক্ষৈকত্ব পদে নিয়োজন করেন, কএক বৎসর পরে ঐ কর্ম ত্যাগ করিয়া টেক্স আফিসের দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত হন, তদনন্তর মিং হিকি বেলি কোম্পানীর বাণিজ্যালয়ে প্রধান পদস্থ হইয়া কার্য করিতে ২ তাঁহার জীবন ও কার্যালয় সমকালেই কাল কর্তৃক অবকলিত হয়।…”

ভবানীচরণের কর্মজীবনের এই তথ্যগুলির অভ্রান্ততা প্রমাণের জন্য ‘তিনি যে যে স্থানে কার্য করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেক স্থানীয় কর্তাদিগের স্বাক্ষরিত প্রশংসা-পত্র’গুলি এই জীবনচরিতের শেষ পাঁচ পৃষ্ঠায় (৩৫-৪০) মুদ্রিত হয়েছে।

ভবানীচরণের সারা উত্তর ভারতে তীর্থযাত্রার যে-বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে সেও বেশ কৌতূহল জাগাবার মতো। ভবানীচরণের কর্মজীবনের বিবরণ থেকে কর্মী-ভবানীচরণের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি ভবানীচরণের ব্যক্তিগত ঘরোয়া পরিচয়ও এই জীবনবৃত্তান্ত গ্রন্থখানিতে অলভ্য নয় :

“কথিত মহাশয় অতি সদাশয় ও নির্মলাশয় ছিলেন দেবদ্বিজ পূজনে স্বধর্মযজনে তাঁহার নিশ্চলা মতি ছিল, তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করত প্রাতঃকৃত্য সমাপণ পূর্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাধানান্তে তৈল গ্রহণ সময়ে সমাগত পরিচিতাপরিচিত শিষ্ট সাম্প্রদায়িক জনগণের সহিত ইষ্ট মিষ্টালাপ করতঃ স্নান তর্পণ দেবপূজনাদি নিত্যকর্মাবসানে ভোজনোত্তর বিষয়কার্য পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, অবকাশ মতে আত্মীয় সজ্জনের সহিত সদালাপ করিতেন নিরালম্বে তাঁহার বৃথা কালযাপন হইত না, নিকটে জনশূন্য হইলে পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, প্রায় দিবসে নিদ্রা যাইতেন না, বিষয় কর্মে আবৃত থাকিলেও নিকটে মনুষ্য আগত হইলে সমাদরের সহিত তৎসহ কিয়ৎকাল কথোপকথন করিতেন…পরোক্ষে প্রিয়জনের প্রশংসা করা তাঁহার স্বাভাবিক কার্য ছিল, পরনিন্দা শ্রবণে অসহিষ্ণু ছিলেন, তন্নিকট বা তাঁহার সমক্ষে অন্যের নিকট কেহ পরদূষণে প্রবৃত্ত হইলে তিনি প্রতিবাদ করিয়া যদ্বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ হইত তাঁহার গুণানুবাদে নিন্দককে নতশিরা করিতেন, তাঁহার এই গুণে কোন ২ বিপক্ষ সপক্ষ হইয়াছিল, তিনি আত্মীয় স্বজনের ও প্রতিবাসিগণের পীড়া সংবাদ পাইলে কর্মান্তর পরিত্যাগ পূর্বক পীড়িতজনের ঔষধপথ্য প্রদান বা প্রদানীয় উপদেশ দান করিতেন…

এতদ্দেশীয় মনুষ্যকে স্বধর্ম ও স্বভাষানুরাগী করিতে তাঁহার বিলক্ষণ উদ্‌যোগ ছিল, ধর্মদ্বেষি দেবনিন্দক নাস্তিকাদির সহিত তিনি আলাপও করিতেন না…"

এই বর্ণনার মধ্যে অতিরঞ্জন বা অতিভক্তি প্রদর্শন বেশি আছে বলে মনে হয় না। ভবানীচরণের চরিত্রের আরেকটি দিক চরিতকার ধরে দিয়েছেন নিম্নলিখিত বর্ণনাটিতে :

"অধিক সুখসম্ভোগের কথা কহিলে তিনি হাস্য করিয়া কহিতেন যে—"সুখের কারণ ধন নহে কেবল নির্বিকল্প মনোমাত্র, শান্তচিত্ত লোকেরা সন্তোষামৃত পানে যেরূপ তৃপ্ত ও সুখী হইয়া থাকেন, সেরূপ ধনলুব্ধ চঞ্চলমনা মনুষ্যেরা ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াও হইতে পারেন না যেহেতু আশার পার নাই' এই কথা কহিয়া মৌনী হইতেন ইতি।"

এই সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত খানিতে একটি চমৎকার বিবরণ আছে ভবানীচরণের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে গঙ্গাতীরে যাত্রা ও মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা প্রসঙ্গে :

"পরে ৮ ফাল্গুন ক্রমশঃ তাঁহার শক্তি হ্রাস হইতে লাগিল ঐ দিবস তিনি মেং বেলি সাহেবকে স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা আপন আসন্নকাল প্রাপ্তির সংবাদ বিজ্ঞাপন করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত বিদায় প্রার্থনা করিলেন, ঐ দিবস তাঁহার পরম বান্ধব শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে দর্শনের অভিলাষ করাতে তন্নিকট সংবাদ প্রদত্ত হয়, পরে মহারাজের আগমন হইলে তিনি আহ্লাদে আবিষ্ট হইয়া সবলের ন্যায় তাঁহার সহিত প্রিয়ালাপ করিলেন তৎকালে বহুদর্শী বিদ্বদ্বর রাজা মহোদয় তাঁহার আসন্নকাল বুঝিতে পারিলেন না, ঐ দিবস সায়াহ্নে ডাক্তার স্ট্রাং সাহেব আগত হইয়া ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিয়া যান তিনিও নিকট মৃত্যুর অনুমান করিতে পারেন নাই, অনন্তর রাত্রি দশদণ্ড সময়ে তিনি স্বেচ্ছাধাম তেতালা গৃহ হইতে পূজার দালানে আসিয়া শয়ন করিলেন, পরে রাত্রি দেড় প্রহরের পর পরিবার সকলের সান্ত্বনা করিয়া গঙ্গাদর্শনার্থ যাত্রা করেন ও গমন কালে পর্যঙ্কোপরি উপবেশন পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে ভগবান্নামোচ্চারণ করিতে ২ তীরস্থ হইয়া ভাগীরথীর জলে হস্ত বিস্তার পূর্বক বারম্বার মুক্তি প্রার্থনা করিয়া স্বহস্তে কিঞ্চিৎ জলপান করিলেন, অনন্তর বন্ধুবান্ধবগণের সহিত প্রিয়ালাপ করত রাত্রি দুই প্রহর

সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বৈতরণী করিতে আজ্ঞা দেন, তদনন্তর রাত্রি সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর সময়ে আপনাকে মল্লিকের ঘাট হইতে নিমতলার নিকটস্থ করিতে কহেন, তৎপরে তথায় উপস্থিত হইয়া আত্মীয়জনকে সংবাদ পাঠাইতে কহিলেন, ৯ ফাল্গুন প্রাতে আত্মীয়গণ আগমন করিতে লাগিলেন ঐ কালে তিনি ইষ্টমন্ত্র মননে নিমগ্ন হইয়া আত্মীয়গণের সহিত আকার ইঙ্গিতে হস্তভঙ্গীতে স্বকীয়াবস্থা জানাইলেন কিন্তু শক্তি সত্বেও বাক্য কহিলেন না…"

ভবানীচরণের সাংবাদিকতা সাহিত্যচর্চা সম্পর্কিত নানা মূল্যবান তথ্যও "জীবনচরিত" খানিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও 'নববাবু বিলাস' সম্পর্কিত মন্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পাবে। 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পর্কে লেখা হয়েছে :

"সুদীর্ঘকাল এই বঙ্গরাজ্য যবনাধীন প্রযুক্ত দেশীয় ভাষা যাবনিক ভাষার সহিত মিশ্রিতা হইয়া যায় পরে চন্দ্রিকায় গৌড়ীয় সুকোমল সাধু ভাষা বিন্যস্তা হওয়াতে বিদ্যানুরাগিগণের হৃদয়ে সাধুভাষা শিক্ষার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অতএব ঐ পত্রকে এতদ্দেশীয় ভাষা পবিবর্ত্তনেব মূলসূত্র বলিতে হয়, ইহা ভিন্ন ঐ পত্রে ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ প্রস্তাব প্রকাশ দ্বারা স্বদেশের যে কি পর্যন্ত উপকার হইয়াছে তাহা বিদ্বান লোকেরাই বিশেষরূপে জানিয়াছেন…"

'নববাবু বিলাস' প্রসঙ্গে ঐ গ্রন্থের কল্যাণকর প্রভাব উল্লেখিত হয়েছে :

"তিনি আত্মীয়গণের অনুরোধে গদ্য পদ্য রচনায় প্রথমত নববাবুবিলাসাখ্য এক পুস্তক রচনা করেন ঐ পুস্তক সাধারণের কৌতুকজনক ফলতঃ তদ্দ্বারা কৌশলে এতন্নগরীয় ভাগ্যবান সন্তানদিগের কটাক্ষ করাতে তদানীং অনেকে তদ্দৃষ্টে কুকার্য পরিহার করিয়া সৎপথাবলম্বন করেন।"

প্রয়োজনবোধে সংকলকেরা সমকালীন অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় ভবানীচরণ সম্পর্কিত যে-সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির সদ্ব্যবহাব করেছেন। কাজেই সর্বদিক থেকে বিচার করে বলতে হয় নাতিদীর্ঘ হলেও আলোচ্য গ্রন্থখানিতে আমরা সেকালের বাংলা দেশের একজন বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির বিচিত্র জীবনের তথ্যবহুল পরিচয় পেলাম। একজন 'individual'-এর 'history'-কে জীবনচরিত বা biography আখ্যা দেওয়া হয়, সেদিক থেকে ভবানীচরণের এই জীবন বৃত্তান্ত ১৮৪৯ সালের রচনা হিসাবে

বাংলা চরিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে মূল্যবান বই বলা চলে। গ্রন্থখানির আরেকটি বৈশিষ্ট্য পরিশিষ্ট অংশে গৌরীশঙ্কর (গুড়গুড়ে) ভট্টাচার্য ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত শোকোচ্ছ্বাস দুটি।

১। 'দ্বারকানাথবাবুর জৈবনিক বিষয় আমরা সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছি তাহাতেই শেষ আর কেহ বিস্তারিত লেখেন নাই।"—'সম্বাদ ভাস্কর', ২৭শে মার্চ, ১৮৫১।

২। লঙ্ সাহেব ভবানীচরণের এই কাব্য-চরিতখানির প্রকাশের তারিখ ধরেছেন ১৮৫০, (Catalogue of The Vernacular Literature Committee's Library) কিন্তু ঐ তারিখ ঠিক নয়, কেননা দেখা যায় ১৮৪৯ সালের ১৪ এপ্রিল তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর' জানিয়েছে "গত বৃহস্পতিবাসরীয়া চন্দ্রিকার সহিত আমাদিগের নিকট এক পুস্তক আসিয়াছে ··তাহাতে ৺বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।"

৩। রামমোহন রায় রচিত, 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯) গ্রন্থে প্রকাশিত মতের সঙ্গে ভবানীচরণের মতপার্থক্য ছিল। 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রের প্রধান সম্পাদক হরিহর দত্ত রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন, তিনি 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকায় রামমোহন রায়ের মত ও পথকেই অনুসরণ করতেন। ভবানীচরণ "সতী সহমরণধর্ম্ম" পন্থী ছিলেন, কাজেই 'সংবাদ কৌমুদী'র সংশ্রব ত্যাগ তাঁর পক্ষে অনিবার্য ছিল।

৪। "The Sova sent Mr. Francis Bathie to England as their representative"—Sanyal R. G., Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India, Vol. II, 1895.

৫। "His chief object in setting up this institution [General Assembly] was to instruct Hindu youths in the principles of Christian religion."—Recollections of Alexander Duff, Lalbehari Day, p. 45.

॥ 'সম্বাদ ভাস্কর' ॥ জীবনী রচনায় উৎসাহ সঞ্চার ॥

বাংলাভাষায় চরিত-প্রবন্ধ বা চরিত গ্রন্থের অভাব সম্পর্কে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (১৭৯৯-১৮৫৯)। সাধারণের কাছে তিনি 'গুড়গুড়ে ভটচাজ' নামে অভিহিত হতেন। তিনি দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'জ্ঞানান্বেষণ (প্রথম প্রকাশ ১৮৩১) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষণ কবিতাটি তাঁরই রচিত। ১৮৩৯ সালে মার্চ মাসের প্রথম ভাগে 'সম্বাদ ভাস্কর' সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়। শ্রীনাথ রায় নামে সম্পাদক ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে এর পবিচালক ছিলেন গৌবীশঙ্কর তর্কবাগীশ।[১]

১৮৩৬ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা' নামে একটি সভা গঠিত হয়। গৌরীশঙ্করের সঙ্গে এই সভার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি কয়েকবার ঐ সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন। এই সূত্রে উল্লেখ করা অবান্তর হবে না যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও ঐ সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঈশ্বরগুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর উভয়েই বাংলা সাময়িক পত্রের সম্পাদক, উভয়েই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব উন্নতির জন্য কাজ করেছেন। উভয়েই দেশপ্রীতি বর্ধন করেছেন। উভয়েই দেশের ইতিহাস ও চরিত গ্রন্থের অভাব সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। গৌরীশঙ্কর এ সম্পর্কে লিখেছেন যে সমকালীন কলিকাতার ও পার্শ্বস্থ অঞ্চলেব বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ও ধনীব্যক্তিদের "এক এক ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্তে এক ২ ইতিহাস-পুস্তক হয় কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ সকল মহাপুরুষগণের বংশাবলীর নিকট প্রার্থনা করিলে তাঁহারা এমত চতুরঙ্গুলী পরিমিতি পত্রও দেখাইতে পারিবেন না তাহাতে কোন মহাজনের জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও লিখেছেন "এদেশ-মধ্যে মহল্লোকদিগের জীবনবৃত্তান্ত লিখিবাব নিয়ম না থাকাতে" তাঁকে কী অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী সংকলন-কালে।[২]

গৌরীশঙ্কর 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় আমাদের দেশের অতীত ও সমকালীন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জীবনচরিত রচনায় উৎসাহের অভাব দেখে যে দীর্ঘ

সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন (২৭ মে, ১৮৫১) সেটি প্রায় পুরোপুরি উৎকলন করে দেওয়া সংগত বলে মনে করি :

"বিলাতী ভাষায় লিখিত তদ্দেশীয় লোকেদের জীবনবৃত্তান্ত যাহা বঙ্গভাষায় সংগৃহীত হইতেছে আমারদিগেব দেশস্থ লোকেরা ঐ সকল সংগ্রহগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন দয়ার কর্ম করিয়াছেন, কেহ বাহুবলে রাজা হইয়াছিলেন, কেহ বিদ্যাদ্বারা স্বদেশস্থ সমুদায় মনুষ্যকে সদুপদেশ দিয়াছেন, কেহ বা পুণ্যবলে তাবৎকে পুণ্যাত্মা করিয়াছেন, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরা উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু আমরা কি দুর্ভাগ্য এই সুফল কালেও আমারদিগের দেশস্থ মান্য লোকদিগের জীবনবৃত্তান্ত দেখাইয়া উত্তব প্রদান করিতে পারিলাম না…

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডীয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত বিচারকালে আমরা নবদ্বীপের মহারাজগোষ্ঠীর জীবনবৃত্তান্ত চাহিয়াছিলাম রাজবাটী হইতে প্রত্যুত্তর আসিল আমরা যাহা জানি তাহাই লিখিয়া উত্তর দিব তাহাতেই অনুভব হইল রাজপরিবারেরা আমারদিগের অপেক্ষা তাঁহারদিগের বংশাবলীর বিষয় অধিকানুসন্ধান করেন নাই, সুতরাং আমারদিগের জ্ঞাত বিষয়মাত্রই লিখিতে হইল আমরা তাহাতেই ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডীয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত বিচারে জয়ী হইয়াছি, নাটোর পুঁঠিয়া রাজবংশ্যদিগের পূর্বপুরুষীয় কাণ্ডও এই প্রকার গোলযোগে রহিয়াছে, কলিকাতা নগরীয় রাজগণ ও ধনিগণ কেহ পূর্বপুরুষদিগের জীবনবৃত্তান্ত লেখেন নাই, কেবল শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহার পূর্ব পুরুষীয় কার্যচরিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন আর রাজা রামমোহন রায়ের জীবনবিবরণ প্রকাশ হইয়াছে, দ্বারকানাথবাবুর [ঠাকুরের] জৈবনিক বিষয় আমরা সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছি তাহাতেই শেষ আর কেহ বিস্তারিত বিবরণ লেখেন নাই, কিন্তু প্রকৃতরূপে তাহা লিখিলে এক বৃহৎ পুস্তক হয় এবং সাধারণ লোকেরাও তাহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন…"

এর পর গৌরীশঙ্কর অষ্টাদশ শতকের শেষে ও ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে যে-সব বিশিষ্ট বাঙালী তাঁদের কীর্তিকলাপের জন্য খ্যাতনামা হয়ে

আছেন, অথচ যাঁদের জীবনবৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে জানবার উপায় নেই তাঁদের নাম উল্লেখ করে লিখেছেন :

> "দর্পনারায়ণ ঠাকুর,গোপীমোহন ঠাকুর,হরিমোহন ঠাকুর, মোহিনীমোহন ঠাকুর, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রাজা রাজবল্লভ রায়বাহাদুর, শান্তিরাম সিংহ, প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রামদুলাল দেব, রামলোচন ঘোষ, নিমাইচরণ মল্লিক, গৌরচরণ মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর, অক্রূরচন্দ্র দত্ত, দেওয়ান কাশীনাথ মল্লিক, দেওয়ান রামসেবক মল্লিক ইত্যাদি মহামহিম ব্যক্তিগণ···বিবিধকর্ম করিয়া পৃথিবী হইতে গিয়াছেন তাঁহারদিগের এক এক ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্তে এক ২ ইতিহাস পুস্তক হয়।"

কিন্তু পূর্বেই লিখেছি যে গৌরীশঙ্কর গভীর নৈবাশ্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন ঐ সব মহৎ ব্যক্তিদের বংশধরেরা "এমত চতুরঙ্গুলী পরিমিত পত্রও দেখাইতে পারিবেন না তাহাতে কোন মহাজনের জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।"

স্বদেশেব কৃতবিদ্য ও খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনচবিত পাঠের ফলে বাংলাদেশের ছাত্রেরা জীবনের প্রারম্ভ থেকে নিজেদের দেশ, ধর্ম, সমাজ সম্পর্কে অনুরক্ত হতে পারত। কিন্তু ঐ ধরনের জীবনচরিতের অভাব থাকায় গৌরীশঙ্করের আশঙ্কা হয়েছিল যে বাংলাভাষায় রচিত য়ুরোপীয়দের জীবনচরিত পড়ে বাঙালী ছাত্রেরা তাদের প্রতি তথা খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে এবং তার সামাজিক ফল মারাত্মক হবে। গৌরীশঙ্কর এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "যে সকল মহামহিমেরা বর্তমান আছেন, ইঁহারাও অনেক সৎকর্ম করিয়াছেন ইঁহারদিগের জীবনবৃত্তান্তই বা কোথায় লিখিত হইল, আর একশত বৎসর পরে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, গোপাললাল ঠাকুর, উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ, শিবনারায়ণ ঘোষ, রামনারায়ণ দত্ত, দুর্গাচরণ দত্ত, দেবনারায়ণ দেব, আশুতোষ দেব, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর, মতিলাল শীল, প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক, গুরুদাস দত্ত ইত্যাদি ধনিলোকেরা কি কি সৎকর্ম করিয়াছিলেন তবে এই সকল মহাশয়দিগের কর্মের

বিষয় কেহ বলিতে পারিবেন না অথচ অনেকেই বলিয়া থাকেন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এস্থলে মহাজন বাক্যার্থ-পূর্বপুরুষগণ, তাঁহারা যে পথে চলিয়াছেন সেই পথই পথ, কিন্তু পূর্বপুরুষেরা কি কি সৎকর্ম করিয়াছিলেন কেহ তাহা বলিতে পারেন না, ভিন্নদেশীয় লোকেরা হিন্দুজাতিব ভাষায় তাঁহারদিগের পূর্বপুরুষগণের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ কবিতেছেন হিন্দু বালকেরা ঐ সকল লোকের জীবনবৃত্তান্ত দেখিয়া তাঁহারদিগের কার্যের অনুগমন করিবে, ইহাতে কেন খ্রীষ্টীয়ান হইবেক না, অতএব আমরা পরামর্শ বলি ধনি হিন্দু মহাশয়েবা আপনারদিগের মধ্যে চাঁদা করিয়া টাকা সংগ্রহ করুন, সেই টাকাতে পূর্বপুরুষগণের জীবনবৃত্তান্ত লিখিত পুস্তক হউক এবং আপনারদিগের জীবনের কার্যও লেখা হইতে থাকুক, এই সকল পুস্তক দেখিয়া উত্তরকালীন বংশাবলী পৈত্রিক পথে চলিবেন এবং ধনি মহাশয়দিগের নাম কর্ম লিখিত পুস্তক সকল পৃথিবীর ক্রোড়ে থাকিয়া সহস্র সহস্র বৎসর পরেও তাঁহারদিগের পরিচয় দিবে"—

এই সূত্রে গৌরীশঙ্কর বিশেষ করে নাটোরের বিখ্যাত শাক্ত-সাধক মহারাজ রামকৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্তের অভাবের কথা উল্লেখ কবে লিখেছেন :

"বায়ান্ন লক্ষ রাজস্বের মহীশ্বর 'মহারাজাধিরাজ রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুর' কত সৎকর্ম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কি প্রকার জ্ঞানমৃত্যু হয় কোন পুস্তকে তাহা লেখা নাই, কেবল মহারাজের মৃত্যুকালের একটা ভাষা গান যাহা ভদ্রেতর সাধারণ লোকমুখে শুনিতে পাই এই স্থলে তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করি, ঐ মহারাজ গঙ্গাতীরে দেহ স্থাপন করিয়া গান স্বরে তাঁহার ভোলানাথ নামক ভৃত্যকে বলিয়াছিলেন "আমার মন যদিরে ভুলে, বালির শয্যায় কালীর নাম বলিও কর্ণমূলে" এই গান করিতে করিতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, অতএব অনিত্য ধনের ও দেহের অভিমান মিথ্যা, ধন দেহ সঙ্গে যায় না, জীবনে যিনি যাহা করেন তাহা লিপিবদ্ধ হইলে বহুকাল থাকে, এতদ্দেশীয় মান্য মহাশয়েরা ইহা বিবেচনা করিবেন ॥"

গৌরীশঙ্করের এই আবেদন একেবারে ব্যর্থ হয়নি, বাংলা ভাষায় না হলেও ইংরেজি ভাষায় কিছু বিলম্বে জীবনী রচনার বা বংশাবলী প্রকাশের চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। কিশোরীচাঁদ মিত্র এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে অগ্রণী হয়েছিলেন সেকথা আমরা

পূর্বে দেখেছি। কালীকৃষ্ণ দেব 'কালীকৃষ্ণ বংশাবলী' প্রকাশ করেন (১৮৪১)। রামমোহন সম্পর্কিত কিশোরীচাঁদ মিত্রের ইংরেজি রচনা প্রথম ১৮৪৫ সালে বার হয়। রাধাকান্তদেবের মৃত্যুর পূর্বেই 'Life of Rajah Radhacaunt Dev Bahadoor' (১৮৫৯) প্রকাশিত হয়। ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস লিখেছিলেন James W. Furrell, বইখানির নাম 'The Tagore Family' (প্রথম, সং ১৮৬৮ দ্বি-সং ১৮৯২)। পরে এ ধরণের আরো অনেক বই ও প্রবন্ধ বেরিয়েছিল।[৩]

পাদটীকা

১। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সাহিত্যসাধক চরিতমালা), পৃঃ ১৪।

২। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, দ্বিতীয় পর্যায়, সংবাদ প্রভাকর, শুক্রবার ১ মাঘ, ১২৬০ (১৩ জানুয়ারি, ১৮৫৪)।

৩। কিশোরী চাঁদ মিত্র 'ক্যালকাটা রেভিউ' পত্রিকায় 'The Territorial Aristocracy of Bengal' (১৮৭২-৭৪) নামে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। লোকনাথ ঘোষের 'The Modern History of Indian Chiefs' (১৮৮১), রামগোপাল সান্ন্যালের 'General Biography of Bengal Celebrities, both Living and Dead (১৮৮৯), বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের 'Dictionary of Indian Biography' (১৯০৬), বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়ের 'A short sketch of Maharaja Sukhomoy Ray Bahadur and his family (১৯১০), 'A short sketch of Rajendra Mullick Bahadur and his family'(১৯১৭) শোভাবাজার রাজবংশীয় 'Raja Kalikissen Deb Bahadur' (compiled under the auspices of the late Raja's Memorial Committee, ১৮৭৫), এন্. এন্. ঘোষের 'Memoirs of Maharaja Nabakissen Deb Bahadur' (১৯০১), 'Rajah Sir Radhakanto Deb Bahadur, K. C. S. I.—A brief account of his life and character,' (১৮৮০), বংশাবলী (মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশ বৃত্তান্ত, ১৮৫৫), কেদারনাথ দত্তের 'দত্ত বংশমালা' (১৮৭৬),

অবিনাশচন্দ্র দাসের 'নাহার বংশ বৃত্তান্ত', (১৮৯৫), প্যারীলাল সোমের 'আমার ও আমার পূর্বপুরুষদিগের জীবনী, (১৮৯৪), হেমচন্দ্র দত্তের 'মহৎ জীবন' (১ম খণ্ড, ১৮৯৩) ইত্যাদি। শেষোক্ত খানিতে কাশিম-বাজার রাজবংশ, পাথুরিয়াঘাটা-জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশ, শোভাবাজার রাজবংশের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছিল 'কয়েকজন কৃতবিদ্য ও মহানুভব মহারাজা ও রাজা বাহাদুরের আনুকূল্যে'। 'বংশ বৃত্তান্ত' বা Genealogical accountও বহু বেরিয়েছিল যেমন, 'হোগলকুড়িয়া মিত্র পরিবার, or A Genealogical table of the Mitra family of Hogolkuria'। ঐগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক সততার অভাব দেখা যায়। 'বিশ্বকোষ' খ্যাত নগেন্দ্রনাথ বসুর বহু খণ্ডে সংকলিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' তথ্যগত দিক থেকে মূল্যবান।

॥ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও কবিজীবনী ॥

"এতদ্দেশীয় পূর্বতন কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত পূর্বে কেহ লিখিয়া রাখেন নাই, এবং সেই সেই কবি মহাশয়েরাও আপনাপন বিরচিত প্রবন্ধ প্রকরণ প্রকটন পুরঃসর তন্মধ্যে স্ব স্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন নাই, সুতরাং এইক্ষণে তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া সর্বলোকের সুগোচর করা যদ্রূপ কঠিন ব্যাপার হইয়াছে তাহা বিজ্ঞজনেরাই বিবেচনা করুন।

আশা ও সাহসের আশ্রয় লইয়া অনুরাগ সহযোগে চেষ্টা এবং যত্ন না করিয়া যদিস্যাৎ আর পাঁচ বৎসর আলস্যের ক্রীতদাস হইয়া পূর্বের ন্যায় বৃথা কালযাপন করিতাম, তবে এই দেশে ঐ সমস্ত কবিদিগের কবিতা ও সর্ববিষয়ের পরিচয়াদি প্রকাশ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারদিগের নাম পর্যন্ত একেবারে লোপ হইয়া যাইত, যুবকেরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতেন না।"

কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত, ভূমিকা।[১]

'পূর্বতন কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত' এবং তাঁদের রচিত কাব্য, কবিতা ও গীত সংগ্রহ ও সংকলন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-৫৯) উল্লেখযোগ্য কাজ। তাঁর এই ধরণের কবিতাসংগ্রহ প্রকাশ ও তার প্রারম্ভে কবির সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত যোজনা নিঃসন্দেহে একটি 'আধুনিক' প্রবণতা। সপ্তদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে এই ধরণের 'Prefatory biography' রচনাপদ্ধতি প্রথম দেখা দেয়। ওয়াল্টন, ড্রাইডেন, জনসন এই ধারা বহন করেন। ঈশ্বর গুপ্ত 'অনুরাগ সহযোগে চেষ্টা' করেছিলেন বলেই আমরা ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, রামনিধি গুপ্ত ও কবিওয়ালাদের এবং বিখ্যাত পাঁচালী গায়ক লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের কাব্য, কবিতা, গীত এবং জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে এত বেশি তথ্য জানতে পেরেছি। সে যুগের সামাজিক ও সাহিত্যিক ইতিহাসের দিক থেকেও এই রচনাগুলির মূল্য রয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এগুলি কেন সংগ্রহ করেছিলেন তার কারণ ভেবে দেখা যেতে পারে। তিনি নিজে কবিওয়ালাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের গান

বেঁধে দিতেন, কাজেই অনিবার্য মমত্ববশতঃ কবিওয়ালাদের জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁদের রচিত গীতগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তাহলেই ঈশ্বর গুপ্তের শ্রম, নিষ্ঠা ও অনুরাগের সম্পূর্ণ মর্যাদা বোধ করি দেওয়া হয় না। তিনি ঐ কবিদের জীবনীবিষয়ক একটি তথ্য বা লুপ্তপ্রায় কোনো গানের প্রকৃত পাঠ উদ্ধারের জন্য অনেক দুর্ভোগ সহ্য করেছেন। কবি-ওয়ালা রাম বসুর একটি গীতের 'পাল্‌টা' অংশ উত্তম, কিন্তু—

> "অনেক যত্ন করিয়া তাহা সংগ্রহ করণে অক্ষম হইলাম। এজন্য আমরা নৌকাপথে বহুদূর পর্যন্ত গমন করিয়া বহুজনের উপাসনা করিয়াছি, যে মহাশয় জ্ঞাত আছেন কোনক্রমেই তাঁহাব সহিত সাক্ষাতের সংযোগ হইল না।"[২]

অথবা

> "আমরা বহুদিন পর্যন্ত বহু পরিশ্রম ও বহু কষ্ট ভোগ করিয়া বহু স্থান হইতে বহুলোকের উপাসনাপূর্বক নিতাই দাস বাবাজীর দলের কয়েকটি সংপূর্ণ ও অসংপূর্ণ গীত সংগ্রহ করতঃ নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম—"[৩]

অথবা

> "হরু ঠাকুরের গানের নিমিত্ত আমরা কত যত্ন, কত চেষ্টা ও কত পরিশ্রম করিয়াছি এবং কত স্থানে ভ্রমণ করিয়া কত লোকের উপাসনা করিয়াছি ও যে পর্যন্ত করিতেছি তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব?"[৪]

—এ ধরণের উক্তি অধিক উদ্‌ধৃত করে বিশেষ লাভ নেই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শুধু যে কবি-আখড়াই গানের রচয়িতাদের জীবনী ও গীত সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছিলেন তাই নয়। তিনি মোটামুটিভাবে মধ্যযুগের বাংলার কবি ও কাব্যসাহিত্যের লুপ্তরত্নোদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁব আকাংক্ষা ছিল কৃত্তিবাস থেকে রাধামোহন সেন পর্যন্ত বাংলার খ্যাতনামা কবিদের জীবনবৃত্তান্ত ও কবিতাবলী সংগ্রহ করে প্রকাশ করা। এই ধারায়, সর্বাগ্রে "অদ্বিতীয় মহাকবি কবিরঞ্জন—রামপ্রসাদ সেনের জীবনবৃত্তান্ত এবং তাঁহার প্রণীত 'কালীকীর্তন' ও কৃষ্ণকীর্তনাভিধান—ভক্তিরস প্রধান মধুর গান' ...১২৬০ সালের পৌষ মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকরে" প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে 'সংবাদ প্রভাকরে' মাসপয়লার কাগজগুলিতে ক্রমান্বয়ে নিধুবাবু থেকে শুরু করে কবিওয়ালা ও পাঁচালীকারদের 'জীবন চরিত ও কবিতাকলাপ' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র ইতিহাসপ্রিয় সাংবাদিক ছিলেন, স্বদেশকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নিজে পদব্রজে,নৌকাযোগে ভ্রমণ করেন এবং অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 'ভ্রমণকারি বন্ধু'র ছদ্ম নামে 'সংবাদ প্রভাকরে' বিবৃত করেন। এই পর্যায়ের বিবরণ সংগ্রহের জন্য তিনি 'বিদ্যোৎসাহী দেশহিতৈষী' ব্যক্তিদের অনুরোধ জানান। প্রকাশিত বিবরণগুলি পড়লে দেখা যাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অবজেক্‌টিভ, তথ্যবহুল পরিচয় ঐ পত্রগুলির মধ্যে জীবন্ত হয়ে আছে। ইতিহাসপ্রীতি ও সাংবাদিক-সুলভ তথ্যনিষ্ঠ দৃষ্টি উভয়ের যোগে ঈশ্বর গুপ্তের বর্ণনাগুলি আজ সমাজতত্ত্বের ছাত্রের কাছে মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। দেশের অতীত গৌরবের প্রতি প্রাণের মমতা ঈশ্বর গুপ্তের ছিল, ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ অথবা নিধুবাবু প্রভৃতিদের জীবনের বৃত্তান্ত ও কবিতাসংগ্রহ তারই অপর নিদর্শন।

কবি-জীবনী রচনায় দেখা যায় তিনি প্রত্যেক বর্ণনীয় ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা কালে সন-তারিখের দিক থেকে বিস্ময়কর আগ্রহ দেখিয়েছেন, এটি তাঁর ঐতিহাসিক ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টির পরিচয়বাহী। তিনি যে সব কবিদের 'জীবনবৃত্তান্ত' বা 'জীবন চরিত' প্রকাশ করেছেন সেগুলি অনিবার্যভাবেই হয়েছে অনেকটা তথ্য সংকলন পর্যায়ের। এই তথ্যসংকলনের জন্য তাঁকে বহুক্ষেত্রে লোকমুখে প্রচারিত গল্প বা জনশ্রুতির উপর বাধ্য হয়ে নির্ভর করতে হয়েছে। কেন না—

> "এতদ্দেশীয় পূর্বতন কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত পূর্বে কেহ লিখিয়া রাখেন নাই, এবং সেই সেই কবি মহাশয়েরাও আপনাপন বিরচিত প্রবন্ধ প্রকরণ প্রকটন পুরঃসর তন্মধ্যে স্ব স্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন নাই,"—

কাজেই তাঁর পক্ষে অন্য পথ কিছু ছিল না। তবে ঈশ্বর গুপ্ত জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীকে নির্বিচারে গ্রহণ করেন নি, অকারণে বর্জনও করেন নি। তাঁর বিচারপ্রকরণ দৃষ্টির একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁর সভাকবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রকে মুলাজোড় গ্রামটি ৬০০৲ টাকা, বার্ষিক খাজনায় ইজারা দিয়েছিলেন এবং রামপ্রসাদকে চোদ্দবিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন বলে জানা যায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ঈশ্বর গুপ্ত তৎসম্পর্কিত দলিল বা সনন্দের সাহায্যে ঐ তথ্য সমর্থন করেছেন, নিছক জনশ্রুতি দ্বারা নয়।

ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্তের অধিকাংশ তথ্য তিনি ভারতচন্দ্রের মধ্যম পুত্র রামতনু রায়ের পুত্র তারকনাথ রায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

ভারতচন্দ্রের জীবনের বৃত্তান্ত সংগ্রহে তাঁর পৌত্রই প্রধান সহায়ক জেনে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। ইতিহাস বা জীবনচরিত উভয় ক্ষেত্রেই জন্ম-মৃত্যুর সাল-তারিখযুক্ত ব্যক্তি-বিশেষের কালানুক্রমিক বিবরণ দান প্রকৃষ্ট রীতি। অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তের এই সব রচনার পূর্ব থেকে ইংরেজি ও বাংলায় জীবনবৃত্তান্ত রচনার রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত হয়েছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর বাংলা ভাষায় যে জীবনী-প্রবন্ধ বা জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছিল,[৫] তারা পূর্বোক্ত মন্তব্য সমর্থন করে। তবুও ঈশ্বর গুপ্তের কৃতিত্ব আদৌ কমে না। জানা যায় তিনি দশ বৎসর ধরে ভারতচন্দ্রের 'জীবন বৃত্তান্ত' ও কাব্যবিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং "এমত মহাপুরুষের 'জীবন চরিত' অপ্রকাশ থাকাতে" অনেকেই ক্ষুব্ধ আছেন জেনে "এই মহাত্মা যে যে সময়ে যে যে স্থানে যে যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ" করেছেন "তদ্বিশেষ সংগ্রহ করতঃ মহানন্দে প্রকটন" ব্যাপারে যত্নবান হয়েছিলেন। স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ অবজেক্টিভ ছিল পূর্বের পংক্তিটি তার দৃষ্টান্ত। তাছাড়া তিনি ভারতচন্দ্রের 'সত্যপীরের ব্রতকথা'য় উল্লেখিত 'সনে রুদ্র চৌগুণা' অংশটির বিশ্লেষণ দ্বারা ভারতচন্দ্রের কালনির্ণয়ে তৎপর হয়েছেন। এ সবই তাঁর ইতিহাস-সম্মত রীতির প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত। তিনি জানিয়েছেন ভারতচন্দ্রের 'জীবনচরিত' রচনাসূত্রে তিনি রায়গুণাকরের পাণ্ডিত্য কবিত্ব-বিদ্যা প্রভৃতির পরিচয় দিতে চেয়েছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়েছে। ভারতচন্দ্রের 'ব্যক্তি'-রূপ, তাঁর তেজস্বিতা, রসিকতাও বেশ ফুটেছে।

রামপ্রসাদ সেন সম্পর্কে ক্রমিক তিনটি রচনা 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১ পৌষ, ১ মাঘ ও ১ চৈত্র, ১২৬০)। রামপ্রসাদের 'জীবন বৃত্তান্ত' প্রথমে ঈশ্বর গুপ্ত নানা কিংবদন্তী ও লোকশ্রুতির সাহায্যে ও তাঁর রচিত গানের সঙ্গে মিল রেখে রচনা করেন। তিনি তাঁর পত্রিকার পাঠকদের কাছে রামপ্রসাদ সম্পর্কিত নতুন তথ্য পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন। তার উত্তরে জনৈক পাঠক তাঁকে জানান যে রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতশ্রবণে নবাব সিরাজদৌল্লা নাকি 'নয়ন নীর নিবারণে অক্ষম' হয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত জানতেন "এদেশ মধ্যে মহল্লোকদিগের জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার নিয়ম না থাকাতে"[৬] তাঁদের জীবন-

চরিত রচনায় মুখ্যতঃ জনশ্রুতি-কিংবদন্তীর আশ্রয় নিতে হয়। তাঁর সংগৃহীত কিংবদন্তীগুলি কবি-সাধক রামপ্রসাদকে জানতে সহায়তা করেছে।

এর পর ঈশ্বরচন্দ্র রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর জীবনচরিত ও তাঁর রচনাবলী দুটি প্রবন্ধে (১ শ্রাবণ ও ১ ভাদ্র, ১২৬১) প্রকাশ করেন। তিনি নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপাল গুপ্তের (ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন জয়চন্দ্রের) কাছ থেকে তাঁর পিতার জীবনের বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৮৩৯ সালে নিধুবাবু পরলোকগত হন, তার আট বৎসর পূর্বে ১৮৩১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের মতো নিধুবাবু তাঁর কাছে দূরের মানুষ নন। কিন্তু তিনি দেখেছিলেন ১৮৫৪ সালের বহু বাঙালীই নিধুবাবুর পবিচয় জানতেন না :

> "অনেকেই 'নিধু' 'নিধু' নহেন, কিন্তু নিধু শব্দটি কি অর্থাৎ এই নিধু, কি গীতের নাম কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম কি কি ? তাহা জ্ঞাত নহেন।"

তিনি 'রামনিধি গুপ্ত' প্রবন্ধে নিধুবাবুর জন্ম, শিক্ষা, বিবাহাদি, চাকরি, সংগীত-শিক্ষা, কর্মত্যাগ, কলিকাতায় আগমন, আখড়াই গান রচনা প্রভৃতি ঘটনা কালানুক্রমিক রীতিতে বর্ণনা করেছেন। সমকালীন পৃষ্ঠপোষক ও সংগীতের অবস্থা, 'পক্ষীর দল', আখড়াই গানের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ও এই সূত্রে স্বভাবতঃই আলোচিত হয়েছে। নিধুবাবুর ব্যক্তি-জীবনের গোপনীয় তথ্যকেও তিনি বর্জন করেন নি। মহারাজ নন্দকুমারের ভাগিনেয় মহানন্দ রায়ের অনুগৃহীতা 'রূপবতী গুণবতী বুদ্ধিশালিনী বারাঙ্গনা' শ্রীমতীর প্রতি নিধুবাবুর অনুরাগ-প্রসঙ্গ ঈশ্বর গুপ্ত অস্বীকার করেন নি :

> "তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিয়া প্রায় প্রতি রজনীতেই তাহার গৃহে গমন করিতেন, এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্য পরিহাস, কাব্য-আলাপ ও গীতবাদ্য করিয়া আসিতেন এবং সেখানে বসিয়া মনেব মধ্যে যখন যেরূপ ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ রাগ সুরবদ্ধ করিয়া তাহারি এক এক টপ্পা রচনা করিতেন।"

—এই ধরণের তথ্যের দ্বারা নিধুবাবুর 'ব্যক্তি'-রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিধুবাবুর স্বাধীনচিত্ততার সাক্ষ্যবহ ঘটনারও উল্লেখ করেছেন ঈশ্বর গুপ্ত। ছোট-খাটো ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষের চরিত্রবৈশিষ্ট্য অনেক বেশি উদ্‌ঘাটিত হয়। ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালা হরু ঠাকুরের বর্ণনাকালে হরু কর্তৃক মহারাজ

নবকৃষ্ণ প্রদত্ত জোড়া শাল চুলিকে দানের মধ্যে হরুর তেজস্বিতা ও গর্ববোধকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তেমনি লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের বাক্‌পটুতা ও পরিহাস-প্রিয়তার দৃষ্টান্ত দিয়ে ঐ মানুষটিকে পাঠকদের সামনে সহজরূপে ধরে দিয়েছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে কবিজীবনী ও গীতাবলী প্রকাশ করেছিলেন সেগুলির মধ্যে স্বভাবতই তথ্যগত কিছু কিছু ভুলের সন্ধান পববর্তীকালে মিলেছে।

ঈশ্বর গুপ্তের এই প্রচেষ্টার বৈশিষ্ট্য তিনি কোনো রাজা-মহারাজা বা ধনী জমিদারের জীবনী বচনা না করে লুপ্তপ্রায় কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী ও গীত সংকলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি অর্থ বা যশ কোনোকিছু প্রাপ্তির আশায় এই কর্মে ব্রতী হননি, দেশের ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ এ কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[৭] তাঁর মৃত্যুর পর বহু গীতসংকলন প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির কোনো-কোনোটিতে কবি বা গায়কদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাই ঈশ্বর গুপ্তের প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে সার্থক হয়েছে।

ঈশ্বর গুপ্ত স্যর চার্লস্ মেট্‌কাফের (১৮৩৫ সালে মুদ্রাযন্ত্রেব স্বাধীনতা প্রদাতা) একটি সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য সংবাদ প্রভাকরে (১ মাঘ, ১২৬১) প্রকাশ করেন। তিনি যেমন সংবাদ প্রভাকরে 'কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ' পরিচালনা করতেন, তেমনি তরুণ ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন জীবনবৃত্তান্ত রচনায়। তাঁর তরুণ শিষ্য চন্দ্রকালী দাস ঘোষ তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'সংবাদ প্রভাকরে' 'মিল্টন সাহেবের জীবনবৃত্তান্ত' (৩০ শ্রাবণ, ১২৬৪) ও 'টাইটলার সাহেবের জীবনবৃত্তান্ত' (১২ আষাঢ়, ১২৬৪) নামক দুটি রচনা প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র দেব ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর পদ্যবন্ধ শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। 'গিরিশচন্দ্র দেব' সম্পর্কিত রচনাটি ১২৫৫ সালের প্রভাকর পত্রেব সাম্বৎসরিক সভায় পঠিত হয়। রচনা দুটি অতি কৃত্রিম।

পাদটীকা

১। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত এই গ্রন্থ ১২৬২ সালেব ১ আষাঢ় তারিখে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

২। রামবসু, সংবাদ প্রভাকর, সোমবার, ১ কার্ত্তিক ১২৬১, ১৬ অক্টোবর ১৮৫৪, ('গত আশ্বিনের প্রকাশিত পত্রের শেষ')।

৩। ৺নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, সংবাদ প্রভাকর, বুধবার, ১ অগ্রহায়ণ, ১২৬১, ১৫ নভেম্বর ১৮৫৪।

৪। ৺হরু ঠাকুর, সংবাদ প্রভাকর, শুক্রবার ১ পৌষ ১২৬১। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৪।

৫। "৺ধর্মসভার অতীত সম্পাদক ৺বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনচরিত দৃষ্ট শ্রুত পবিত্রচরিত্র বিবরণ" (১৮৪৯), 'মহাত্মা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবন বৃত্তান্ত', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ বৈশাখ, ১৭৬৭ শক [১৮৪৫] 'দ্বারকানাথ বাবুর জৈবনিক বিষয় আমরা সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছি'—সম্বাদ ভাস্কর, ২৭মে, ১৮৫১।

৬। সংবাদ প্রভাকর, শুক্রবার, ১ মাঘ ১২৬০, ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৪।

৭। "এদেশের প্রাচীন যে যে মহাশয় বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করতঃ বিখ্যাত হইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহারদিগের তাবতেরি জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করণের মানস করিয়াছি, কিন্তু ইহা সুসিদ্ধ করা সুকঠিন হইয়াছে···যাহা হউক মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' এইরূপ করিয়া দেখিতে হইবে।—সংবাদ প্রভাকর, ১ পৌষ ১২৬০ সাল।

৮। লর্ড বেণ্টিকের পর কোম্পানীর প্রবীণ কর্মচারী স্যর চার্লস্ মেটকাফ অস্থায়ীভাবে বড়লাট নিযুক্ত হন (১৮৩৫-৩৬)। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর সম্পর্কে লেখেন—'পরন্তু তিনি ভারতবর্ষের ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করাতে এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিশেষ স্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার প্রসাদেই আমরা স্বাধীনরূপে সকল বিষয়ে অভিপ্রায় লেখনে সমর্থ হইয়াছি।' মেটকাফের পূর্ণাঙ্গ বৃহৎ জীবনী পরে লেখেন চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬), "মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা লর্ড মেটকাফের সংক্ষিপ্ত জীবনী" (১৮৮৭)।

।। ব্রাহ্মসমাজ ও চরিতসাহিত্য ।।

ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় চরিত-সাহিত্য রচনার পথনির্দেশ করেন চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব সমাজ। মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর লিখেছিলেন চৈতন্য-চরিত কাব্য ও -চরিতনাট্য সংস্কৃত ভাষায়। বৃন্দাবন, জয়ানন্দ, লোচন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চূড়ামণি দাস প্রভৃতি ভক্ত বৈষ্ণবেরা চৈতন্যচরিতকাব্য রচনা করেন বাংলা ভাষায়। 'অদ্বৈত প্রকাশ', 'নরোত্তম বিলাস', 'প্রেমবিলাস', 'ভক্তি-রত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থের কথা এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়। বৈষ্ণব জীবনী কাব্য সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এ প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচনা করার দরকার নেই। বৈষ্ণব সমাজ ষোড়শ শতকে চরিত-সাহিত্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যে 'a new genre' আনয়ন করেছিলেন। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ বাংলা সাহিত্যের জীবনী ও আত্ম-জীবনী শাখাকে পুষ্ট করে তোলেন।

ত্রয়োদশ শতকের জন্মলগ্নে তুর্কি-আক্রমণের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের অগ্রগতি ঘটতে থাকে। সেই সামাজিক সংকটকালে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়ে একদিকে ইসলামের অপর দিকে কঠোর রক্ষণশীল সমাজের হাত থেকে হিন্দু জনসাধারণের মুক্তির চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মমতে ভক্তিতেই মুক্তি, ঈশ্বর অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তি। হিন্দু সমাজের কুকর্মবৃত্তিমূলক কঠোরতায় বহু জনগোষ্ঠী তৎপূর্বে পতিত বলে ঘোষিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের মধ্যে দেখা গেল, 'পতিত হেরিয়া কান্দে' এবং 'আচণ্ডালে ধরি দেই কোল' এবং তাঁর ধর্মমতে ভাগবতের ভক্তিধর্মের সঙ্গে সুফীমতের সূক্ষ্ম সমন্বয় ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

বাংলাদেশে উনবিংশ শতকের সুরু থেকে খ্রীষ্টান ধর্মের পদক্ষেপ হিন্দুসমাজের আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। ইসলাম ও হিন্দু সমাজের সংঘাতের কালে যেমন চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়, খ্রীষ্টানধর্ম ও হিন্দুসমাজের মধ্যেকার সংঘর্ষের সময়ে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের অভ্যুত্থান কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। চৈতন্য-আন্দোলন হিন্দুসমাজের আচারমূলক কঠোরতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজস্ব বৈষ্ণব সমাজ গঠন করেছিল। ব্রাহ্ম-আন্দোলনও মূলতঃ

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন। ব্রাহ্ম সমাজের গঠন তার সাক্ষ্য দেয়। এই দুটি আন্দোলন বাংলার তথা ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজগত সংকটকালে ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করেছে বললে অযৌক্তিক হয়না। বাংলা চরিতসাহিত্য আলোচনায় এই ঐতিহাসিক ভূমিকা আলোচনার কিছু প্রয়োজন আছে। কবীর, নানক, দাদু ভারতে মধ্যযুগের এই ধর্মসংস্কারকদের জীবন ও ধর্মমত সম্পর্কে নতুন করে রচনা প্রকাশে ব্রাহ্মসমাজ অগ্রণী হয়েছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই প্রথাগত ধর্মের গোঁড়ামি ও সামাজিক কঠোরতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, জাতি বর্ণ সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধিকে সবলে পরিহার করেছেন। মধ্যযুগের এই 'সন্ত্'দের নিয়ে আধুনিক যুগে চরিতপ্রবন্ধ রচিত হল কেন, এ প্রশ্ন সহজেই ওঠে। তার কারণ ব্রাহ্মসমাজ মধ্যযুগের এই 'সন্ত্'দের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন নিরাকার ঈশ্বরোপাসনা বা নির্গুণভক্তি, ধর্ম সম্পর্কে সেই উদার দৃষ্টি, যাকে তাঁরা বরণীয় আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহন রায় প্রথম্ এই পথ প্রদর্শন করেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গে খ্রীষ্টান পাদ্রিদের খ্রীষ্টানধর্ম, যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তীব্র বাদানুবাদ হয়েছিল। ১৮২৩ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামে প্রকাশিত (প্রকৃতপক্ষে রামমোহনেব রচনা) 'Humble Suggestions to his countrymen who believe in the One True God' রচনাটি সেই বাদানুবাদের পরিণত ফল।[১] রামমোহন এই রচনাটিতে লিখেছেন—'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মের উপলব্ধি, বেদাধ্যয়ন করেননি এমন সাধক-ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভব। তিনি ঐ সূত্রে নানক, দাদূ ও কবীরের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন :

> "Many among the ten classes of Sunnyasees, and all the followers of Gooroo Nanuk, of Dadoo, and Kubeer, as well as of Santa &c, profess the religious sentiments above mentioned. 'God is One only, without an equal'. It is our unquestionable duty invariably to treat them as brethren. No doubt should be entertained of their future salvation, merely because they receive instructions, and practise their sacred music in the Vernacular dialect."

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে দেখি গুরু নানকের বাণী তাঁর অন্তরকে

গভীরভাবে স্পর্শ 'করেছিল।[২] একই প্রভাব রবীন্দ্রমানসে নব প্রেরণা দান করেছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' ১৮৫০-১৮৫১ সালে ধারাবাহিকরূপে 'নানক পন্থি' নামে রচনাটি প্রকাশিত হয়। গুরু নানক থেকে গুরুগোবিন্দ পর্যন্ত শিখধর্ম ও ধর্মগুরুদের কালানুক্রমিক বিবরণ সেখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই সূত্রে বলা দরকার 'কবিরের জীবনচরিত' (১৮৬৭) মহেন্দ্রনাথ বসুর 'নানক প্রকাশ' (১৮৮৫), যোগেন্দ্রনাথ সরকারের 'কবীর' (১৮৯৩) প্রভৃতি গ্রন্থ বচনাব পিছনে বয়েছে ব্রাহ্মসমাজের প্রেবণা। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'মহাত্মা থিওডোর পার্কাবেব জীবনচবিত' (১৮৮৫) গ্রন্থেব প্রাবম্ভে লিখেছেন, "নানক কবীব চৈতন্য, লুথব অদ্যাপি জীবিত থাকিয়া ভগবানের পবিত্র কায সম্পন্ন ক'বিতেছেন।" দেখা যাচ্ছে পশ্চিম ইউরোপে বিশেষতঃ জার্মানিতে মার্টিন লুথাব (১৪৮৩-১৫৪৬) যে বিফর্‌মেশন আন্দোলন সৃষ্টি কবেন, ব্রাহ্মসমাজ তাবই সঙ্গে তুলনা কবছেন নানক, কবীব, চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তি আন্দোলনকে[৩]। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কবা যেতে পাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত "শঙ্করাচার্যেব জীবনবৃত্ত ও দিগ্বিজয়" (১৮৭৭-৭৮) বচনাটি। ব্রাহ্মসমাজ শঙ্কবাচার্যের জীবনী প্রকাশ কবছেন ভাবতে যেন কিছুটা বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু রচনাটি পড়লে দেখা যাবে শঙ্কবাচার্যকে লেখক দেখেছেন ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে ধর্মগত বিপর্যয়েব যুগে অন্যতম রক্ষাকর্তারূপে। বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, মার্টিন লুথার সকলেই 'ধর্মস্য গ্লানি' মোচনেব জন্য বিশেষ বিশেষ কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এই সিদ্ধান্তে এসে লেখক মন্তব্য কবেছেন :

> "হিউ লার্টিমাব, টমাস ক্রন্‌মার, জন কালবিন্ ইগ্‌নেটিয়স্ লয়োলা প্রভৃতি ইউরোপীয় সংস্কারকগণেব আবির্ভাব ঠিক উপযুক্ত কালেই হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও বামানুজ, কবীর, দাদু, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি কত সম্প্রদায়-প্রবর্তক মহাপুরুষ উদিত হইয়াছেন।"

লেখক বামমোহন রায়কে এঁদেবই ধারায় আধুনিক কালের মহান 'ধর্মসংস্কাবক' রূপে দেখেছেন। শঙ্করাচার্য অদ্বৈতমতের প্রবক্তা, ব্রহ্মই একমাত্র 'সত্য'। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শঙ্কর-মতের বিশেষতঃ ব্রহ্ম-জীব ব্যাখ্যা সমর্থন করেননি।[৪] তবু 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' প্রকাশিত এই প্রবন্ধে শঙ্করাচার্যকে সমাজের উদ্ধারকর্তা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে :

> "ভারতবর্ষের দুইটি বিশেষ গৌরবের সময়। প্রথমটি, যখন বুদ্ধদেব প্রথম বুদ্ধিবিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়টি, যখন শঙ্করাচার্য অদ্বৈত

মতের প্রচার করিয়া সমাজের উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই নাস্তিকত্রাস প্রাতঃস্মরণীয় পূজনীয় শঙ্করাচার্যের জীবন চরিত লিখিবার জন্যই আমরা এত কথা লিখিলাম। ইনি অদ্বৈতমতের প্রচারক। ইনি মঠাশ্রমের প্রবর্ত্তয়িতা। ইনি ভারতবর্ষের সর্বত্র দেবতা বলিয়া মান্য, গণ্য এবং আদরণীয়। ভারতের সর্বত্র ইঁহাকে শৈব বলিয়া লোকে পূজা করে কিন্তু ইনি শৈবমত খণ্ডন পূর্বক অদ্বৈতমত প্রচার করেন।"

ব্রাহ্মসমাজ এই পর্যায়ের সাধু চরিতবৃত্তান্ত প্রকাশ তাঁদের অবশ্য করণীয় কার্য বলে মনে করেছিলেন। পূর্বোক্ত রচনাটির গোড়ায় লেখা হয়েছে :

"জীবনচরিত পাঠ করিতে সকলেই ভালবাসেন। ইহার হেতু এই জীবনচরিত দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হইয়া থাকে। যাঁহার জীবনী লিখিত হয় তিনি কিরূপে জীবনযাপন করিয়াছিলেন, কিরূপেই বা সমাজের কোন উন্নতি বা পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন, কিরূপে বিবিধ মতাবলম্বী লোকদিগের সহিত ব্যবহার করিতেন, কিরূপেই বা সংসারের নানা প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, কিরূপেই বা সাধারণ জনগণের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন ইত্যাদি বিষয় জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত বিশেষ কৌতূহল উপস্থিত হয় এবং আগ্রহ জন্মে। জীবনবৃত্ত পাঠে অনেকে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন কারণ তদ্দ্বারা তাঁহারা নিজের দোষ প্রভৃতি সংশোধন পূর্বক স্ব স্ব উন্নতি বিধান করিয়াছেন এবং সমাজে প্রশংসনীয় ও গমনীয় হইয়াছেন। অতএব জীবনচরিতের উপকারিত্ব প্রভূত। আবার যদি এই জীবনচরিত কোন মহাপুরুষের জীবনচরিত হয়, তাহা হইলে ত সর্বাংশেই ঔৎসুক্য-জনক হয়। মহাপুরুষের নামশ্রবণে হৃদয়ে একটি ভয়ভক্তি সম্বলিত প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়। পৃথিবীর সর্বত্র মহাপুরুষদিগের সম্মান, আদর ও পূজা দৃষ্ট হয়"।

মহাপুরুষ চরিত, সন্ত চরিত, ভক্ত চরিত রচনা ব্রাহ্ম আন্দোলনের একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ। এগুলি হল আধুনিককালের hagiography। 'রিফরমেশন' আন্দোলনের ফলে যে 'প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় তাঁরা 'চার্চের ইতিহাস' রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন, অনুরূপ ভাবে ব্রাহ্ম সমাজও তাঁদের নিজস্ব ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন।[৫] বাংলা দেশের ইতিহাসের মধ্যযুগে বৈষ্ণব সমাজ তাঁদের ধর্মগুরুদের জীবনীকাব্য রচনা করেন। ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ প্রচেষ্টা দেখতে পাই

রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র মুখ্যতঃ ব্রাহ্মসমাজের এই তিন প্রধান ব্যক্তির জীবন এবং ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য চরিতগ্রন্থ রচনা। কিন্তু শুধু ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ব্যক্তিদের জীবনী নয়, ব্রাহ্মভক্ত ও প্রচারকদের জীবনীও অনেকগুলি লেখা হয়। যতীন্দ্রমোহন বসুর 'স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী' (১৮৮৯), শশিভূষণ বসুর 'সাধু গিরীন্দ্রমোহন' (১৮৮৯), চিরঞ্জীব শর্মার [ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল] 'সাধু অঘোর নাথের [গুপ্ত] জীবনচরিত' (১৮৮৫), বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবনচরিত' (১৮৮২), হারমোহন ঘোষালের 'সাধুজীবন' [নবীনচন্দ্র রায় ও শিবচন্দ্র দেব] (১৮৯১), প্রভৃতি গ্রন্থ তার নিদর্শন। কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫) মত ও পথের বিচ্ছেদ ঘটা অনিবার্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিরোধী এবং অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র সমাজ গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন না। 'ব্রাহ্মেরা হিন্দু নয়' এ মনোভাবও তাঁর পক্ষে অসহনীয় ছিল। তিনি খ্রীষ্টীয় মত ও পথের একান্ত বিরোধী ছিলেন।[৬] ব্রাহ্মসমাজে খ্রীষ্টধর্মের সাধনাদর্শ, পাপবোধ, অনুতাপী ক্রন্দন, করুণাতত্ত্ব, সেবাধর্ম, প্রত্যাদেশ কেশবচন্দ্রই আনয়ন করেন।[৭] 'Reason' ও 'Faith' এর দ্বন্দ্বে কেশবচন্দ্র বাংলাদেশে উনবিংশ শতকের নব-জাগরণের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ 'Reason'-এর পরিবর্তে 'Faith'-কেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞানপ্রধান ব্রহ্মসাধনা থেকে ক্রমে খ্রীষ্টীয়-ও পরে বৈষ্ণব-ভক্তিবাদের দিকে ঝুঁকলেন। তিনি বেন্থামের 'উপযোগবাদ' (utilitarianism) ও কঁতের 'প্রত্যক্ষবাদ' (positivism) উভয়েরই বিরোধী ছিলেন এ তথ্য কেশব-প্রসঙ্গে সর্বদা স্মরণীয়।[৮] ১৮৬৬ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ ১৮৬৮ সালের পৌষমাস থেকে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নাম গ্রহণ করে। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের মূল বেদান্ত বা উপনিষদে, কেশবচন্দ্রের বাইবেলে। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের মতো ভিক্তর কুঁজা বা উইলিয়ম হ্যামিল্টনের দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় আনন্দ পেতেন, কিন্তু তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব ও সাধন পদ্ধতির অনুকরণের বিরোধী ছিলেন।

১৮৮১ সালে কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'কে 'নববিধান সমাজে' [The New Dispensation] রূপান্তরিত করেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন :

> "হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম এখন সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন, বেদান্তের সঙ্গে এখন বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তর প্রভৃতি সমুদায় ধর্মশাস্ত্র মিলিল। নববিধানের বেদের অন্ত নাই, কেননা 'সত্য'ই ইহার বেদ। ইনি দেশকালে বদ্ধ নহেন, সমুদায় বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত"।

সেজন্য কেশবচন্দ্রের নির্দেশে, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত ও গিরিশচন্দ্র সেন যথাক্রমে খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, ইসলাম ধর্ম তথা শাস্ত্র আলোচনায় ব্রতী হন। অঘোরনাথের 'শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব.' (১৮৮৩) গিরিশচন্দ্রের কোরাণ অনুবাদ ও 'মহাপুরুষ মহম্মদের জীবনচরিত' (১৮৮৬) তার দৃষ্টান্ত। 'নববিধানের'র অনুগামী ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালের 'ঈশা চরিতামৃত' (১ম পর্ব, ১৮৮৩) ও ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা' (১৮৭৮) গ্রন্থদ্বয় উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় লেখক জানিয়েছেন "জড়বাদী ভক্তিবিদ্বেষী জ্ঞানী"দের জন্য "ভক্তিরসময় গৌরচন্দ্রের জীবনচরিত" লিখিত হয়নি, "তত্ত্বপিপাসু বিবেকী ব্যক্তিদের" জন্য লেখা হয়েছে। অবশ্য তিনি চৈতন্যদেবকেও 'ঈশ্বরপ্রিয় সন্তান' বলে অভিহিত করেছেন খ্রীষ্টতত্ত্ব অনুসরণে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধরণের বিভিন্ন মত-সমন্বয়ের কোনো সার্থকতা দেখতে পাননি। কেশবচন্দ্র ১৮৭৫ সালের প্রথমদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্রবে আসেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৮৮৪) পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁর ধর্মাদর্শগত যোগ অব্যাহত ছিল। তিনি পরমহংসদেবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সেজন্য 'হিন্দু পৌত্তলিকতা'র নব-ব্যাখ্যাদান তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।[৯] ভক্তিপিপাসু বৈষ্ণবধর্ম তাঁর কুলধর্ম। চৈতন্যদেবের প্রতি তাঁর গভীর ভক্তি। তিনি চৈতন্যদেবের পদাঙ্ক অনুসরণে নগর সংকীর্তনের আয়োজন করেন, তার গান হল, 'যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার'। সেজন্য 'সাধু সমাগম' পর্যায়ে তিনি 'চৈতন্য সমাগম' সম্পর্কেও ভাষণ দিয়েছেন।

খ্রীষ্টভক্তেরা যেমন 'Lives of the Saints' সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন, অথবা কোয়েকার এবং মেথডিষ্ট-পন্থীরা যে ধরণের ভক্ত-চরিত রচনা করেন, বৈষ্ণবদের যেমন 'ভক্তমাল' তারই অনুসরণে কেশবচন্দ্র পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত হয় গিরিশচন্দ্র সেনের 'তাপসমালা' (১ম পর্ব, ১৮৮১,)

'মহাপুরুষ চরিত' (১ম পর্ব ১৮৮১, ২য় পর্ব, ১৮৮৩)। এই পর্যায়ে আরো অনেক বই বার হয়।

খ্রীষ্টসেবিকাদের জীবনীর অনুসরণে সমকালীন ব্রাহ্মিকাদের জীবনী প্রকাশ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক চরিত গ্রন্থ রচনার আরেকটি দিক। 'জীবনালেখ্য' [দুর্গামোহন দাসের সহধর্মিণী ব্রহ্মময়ী] (১৮৭৬), ক্ষেত্রমোহন দত্তের 'কুমুদিনী চরিত্র' (দ্বি-সং ১৮৭২), প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্যের 'মুক্তকেশীর চরিতামৃত' (১৮৯১), রজনীকান্ত দে-র 'চরিত মাধুরী' (১ম ভাগ ১৯১৯) প্রভৃতি চরিতালেখ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থখানিতে যোগমায়া দেবী [বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহধর্মিণী], গিরিজাকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় [শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী], কৈলাসকামিনী দত্ত [উমেশচন্দ্র দত্তের সহধর্মিণী], প্রসন্নময়ী ভট্টাচার্য [শিবনাথ শাস্ত্রীর সহধর্মিণী], স্বর্ণপ্রভা বসু [আনন্দমোহন বসুর সহধর্মিণী] ও নিস্তারিণী বসুর [রাজনারায়ণ বসুর সহধর্মিণী] জীবনকথা বিবৃত হয়েছে।

এই পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হল, ব্রাহ্মসমাজ যে-সব চরিত-প্রসঙ্গ বা চরিত-বৃত্তান্ত প্রকাশ করেছিলেন তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ পর্যায় আছে। ভারতবর্ষে যাঁরা মধ্যযুগে সাধক ছিলেন, যাঁরা প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যস্মৃতি-শাসিত ধর্ম অস্বীকার করেছিলেন, তাঁদের চরিত-প্রসঙ্গ প্রকাশ করা দরকার হল। মধ্যযুগের 'সন্ত্'দের আধুনিক যুগের দৃষ্টিতে দেখার পিছনে ছিল তাঁদের ধর্ম-মতের 'মানবিক' দিকটিকে, উদার ভক্তির দৃষ্টিকে ফুটিয়ে তোলা, অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। কেশবচন্দ্র সেনের ব্যাখ্যাত ধর্মমতে একদিকে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব, অপরদিকে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব খুব বেশি, দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাত ঔপনিষদিক ধর্মের প্রভাব সুলক্ষিত নয়। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশব-চন্দ্রের প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছেদ ঘটে যায় ১৮৬৬ সালের ১১ই নভেম্বর থেকে। এর পূর্বেই তিনি 'Jesus Christ, Europe and Asia' (৫ মে, ১৮৬৬) নামক বিখ্যাত বক্তৃতা দেন। খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি গভীর ভক্তিভাব তিনি যেমন তাঁর প্রচারিত ধর্মমতে আনয়ন করেন, অন্যদিকে অদ্বৈতাচার্যের বংশধর, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ-ত্যাগী, কেশবচন্দ্রের প্রধান সহযোগী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ভক্তিবাদ, তথা সংকীর্তন, মহোৎসব প্রভৃতিকে তাঁর ধর্মান্দোলনের অঙ্গীভূত করেন।[10] তারই

ফল চিরঞ্জী র্মার 'ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা' ও 'ঈশাচরিতামৃত'। ১৮৭৭ সাল থেকে দেখা যায় কেশব গৌরগোবিন্দ রায়, অঘোরনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মশাস্ত্র আলোচনায় অনুপ্রাণিত করেন। এরই পরিণতি তাঁর 'নববিধান' বা 'The New Dispensation'। 'মহম্মদ চরিত', 'মহাপুরুষ চরিত', 'তাপসমালা' প্রভৃতি সর্ব ধর্মের ভক্তজীবনী পর্যায়ের গ্রন্থগুলি তারই ফল। এ পর্যায়ের গ্রন্থগুলি বাংলা চরিত সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেছে বলা যায় না, তবে ব্রাহ্মসমাজ কেন ও কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই গ্রন্থগুলি রচনা করিয়েছিলেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যদিকে 'সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিত', 'কমলাকান্তের জীবনচরিত', 'সাধু গিরীন্দ্রমোহন', 'সাধুজীবন' (নবীনচন্দ্র রায় ও শিবচন্দ্র দেব), 'ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের জীবনী', 'ভক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী' প্রভৃতি চরিত-গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য হল, বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ মধ্যযুগের 'সাধু' নন, এযুগের ব্রাহ্মভক্ত, প্রচারক বা কেশবচন্দ্রের মতে 'প্রেরিত পুরুষ'। এঁদের যে জীবনবৃত্তান্ত সংকলন বা প্রণয়ন করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য ছিল এঁদের জীবনের কার্যাবলী প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা। এঁরা কি ভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেছেন, পদে-পদে কত সামাজিক, আর্থিক ও মানসিক বাধার মুখোমুখি হয়েছেন, কি ভাবে ত্যাগ ও বৈরাগ্যব্রত পালন করেছেন—সেই ইতিহাসটি প্রকাশ করা এবং মৃত ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা এই জীবনবৃত্তান্তগুলি রচনার কারণ।

এই জীবনবৃত্তান্তগুলির ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য যথেষ্ট। কেশবচন্দ্র সেনের প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পর থেকে (১৮৫৮) ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলন অভাবনীয় ব্যাপকরূপ লাভ করে। সেই আন্দোলনের নানা পর্বে যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁদের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও ঐ বিশেষ যুগের ধর্মান্দোলনের ইতিহাসকে বুঝতে সহায়তা করে। রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তেরা একদা নিজেদের প্রভূত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি-আন্দোলনের দুর্বার টানে চলে এসেছিলেন। বহু সাধারণ মানুষ ভক্তিধর্মের আহ্বানে ছুটে গিয়েছিল। ব্রাহ্মধর্মের আহ্বানও বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই আহ্বানে বহু ব্যক্তি সাড়া দিয়েছিলেন। ব্রহ্মোপাসনা, প্রতিমাপূজা অস্বীকার, উপবীত-ত্যাগ, আহারে জাতি ও বর্ণগত বিধিনিষেধ ভঙ্গ প্রভৃতি কারণে নিজেদের পরিবার ও

সমাজ উভয়ের হাতে ব্রাহ্মভক্তেরা নির্মম নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। কিন্তু তাঁরা সকল দুঃখ বরণ করেছেন, নিজেদের বিশ্বাস বা 'Faith'-কে রক্ষা করবার জন্য। তাঁদের জীবনের কথা, অবশ্যই বাংলা চরিতসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা তাঁরা এযুগেরই বিশেষ লোক বা 'particular man'। তবে তাঁরা ভক্ত, প্রচারক বা সাধক—তাঁদের জীবন অন্য আর পাঁচজনের বা বিষয়ী লোকের জীবনবৃত্ত থেকে পৃথক। কাজেই তাঁদের জীবন-কথাও অন্য ধরণের হতে বাধ্য কেননা, তাঁরা 'not an author's puppet, like the hero of a novel'।[১১] একথা স্বীকায যে, খ্রীষ্টান ভক্তদের যেমন ধর্মের জন্য আত্মদানকারী, 'Persecuted, বা 'Martyr' রূপে চিত্রিত করা হয়, ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের ভক্ত ও প্রচারকদের যে জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করেছিলেন তাদের অনেকগুলিতে ঐ 'martyr'-ধর্মী প্রভাব আছে (বিশেষতঃ কেশবচন্দ্র সেন-পন্থীদের জীবনীগুলি)। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর 'নববিধান সমাজের' পতাকার ব্যাখ্যায় বলেছিলেন 'The silken flag is crimson with the blood of the martyrs'.

প্রটেস্‌টাণ্ট খ্রীষ্টানদের মধ্যে যাঁরা 'পিউরিটান্' তাঁরা নীতিগত বিশুদ্ধি ও ব্যক্তিগত চরিত্রে পবিত্রতার পর অত্যন্ত বেশি জোর দিতেন। তাঁরা মনে করতেন এলিজাবেথীয় যুগের 'রিফর্‌মেশন' আন্দোলন খ্রীষ্টধর্মের আদর্শ-পবিত্রতা জনমানসে সঞ্চার কবতে পারেনি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় থেকে (১৮৪৩) ব্রাহ্মসমাজও তাঁদের ধর্মান্দোলনে পিউরিটান মনোভাবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পিউরিটানেরা যেমন ডায়েরি রাখতেন, নিজেদের দোষ-ক্রটি লিখতেন, ঈশ্বরের কাছে পাপের মার্জনা ভিক্ষা করতেন, ব্রাহ্মসমাজের ভক্তেরা প্রধানতঃ কেশবচন্দ্র সেনের যোগদানের পর থেকে দিনলিপি রাখা, নিজেদের বাসনা-ভাবনাকে, পাপ-পুণ্য চিন্তাকে নিয়মিত লিপিবদ্ধ করাকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে স্বীকার করেছিলেন। খ্রীষ্টান সাধকদের 'কন্‌ফেসন' ('Confession') পর্যায়ের রচনা (যেমন 'Confessions of St. Augustine') ব্রাহ্মভক্তদের আত্মজীবনী রচনার প্রেরণা যুগিয়েছিল। 'আত্মচরিত' সাহিত্যের দিক থেকে এগুলির বিশেষ মূল্য আছে। ব্রাহ্মভক্তদের জীবনকথা রচনায় তাঁদের আত্মজীবনী, ডায়েরি, স্মৃতিলিপি প্রভৃতির সাহায্য বহুলভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্রাহ্মিকাদের কয়েকখানি জীবনবৃত্তান্তের উল্লেখ পুর্বে করা হয়েছে। ১৮৮১

সাল থেকে কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' মতে দেখতে পাই খ্রীষ্টান দীক্ষাপদ্ধতিকে দেশীয় আবরণে প্রচলনের চেষ্টা। এর পূর্বেই খ্রীষ্টান সমাজের আদর্শে তিনি নববিধান সমাজে 'প্রেরিত পুরুষ দল' গঠন করেন (১৮৭৯)। তেমনি খ্রীষ্টান সাধিকাদের অনুসরণে তিনি নববিধান সমাজে 'ব্রাহ্মিকা দলে'র সৃষ্টি করেন (এপ্রিল, ১৮৮১)। এই প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র লেখেন :

> "The Church is incomplete till it has formed a Sisterhood. Numerous are the agencies at work for the elevation and reformation of man. But the daughter of God is as much in need of discipline and training as the son of God. Our Church is therefore striving after female edification.··· On Tuesday last eleven ladies were solemnly initiated into different holy orders."

সেজন্য ব্রাহ্মিকাদের চরিত-বৃত্তান্ত রচনার প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল।

চরিত সাহিত্যের দিক থেকে না হলেও 'আত্মচরিত' সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম-সমাজের দান বিশেষভাবে মূল্যবান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' (১৮৯৮), কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদ' (১৮৮৩), শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' (১৯১৮), রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' [মৃত্যুর পর ১৯০৯ সালে প্রকাশিত) শ্রীনাথ চন্দের 'ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর' (১৯১৩) সুদক্ষিণা সেনের 'জীবনস্মৃতি' (১৯৩২) প্রভৃতি রচনাগুলি সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও বাংলাদেশের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। তেমনি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র বা শিবনাথ শাস্ত্রীর মত ব্যক্তিগণের মনোজগতের তথা অধ্যাত্ম-জগতের বহু রেখায়িত মানচিত্রটি আমাদের চোখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এই পরিচ্ছেদে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র বা শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি মহৎ জীবনের অধিকারী ব্যক্তিদের জীবন অবলম্বনে যে গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল সেগুলি আলোচিত হল না। ব্রাহ্মসমাজ ও চরিতসাহিত্য প্রসঙ্গে উক্ত জীবনী গ্রন্থগুলি আলোচনা না করে যেখানে বঙ্গদেশের অন্যান্য যুগন্ধর পুরুষদের জীবনী গ্রন্থগুলির বিচার করা হয়েছে, সেখানে তাদের মূল্যনির্ণয়ের প্রয়াস করা হবে।

পাদটীকা

১। Collet, S. D., The Life and Letters of Raja Rammohun Roy, pp. 143-144, Ed. by Dilip kumar Biswas and P. C. Ganguly, 1962.

২। 'নানক বলিয়া গিয়াছেন যে: থাপিয়া ন জাই, কীতা ন হোই, আপে আপ্ নিরঞ্জন সোই।'—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, পৃঃ ১৮৬, বিশ্বভারতী। নানকের 'গগনমৈ থাল রবিচন্দ্র দীপক বনে' গানটি দেবেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল, তদেব, পৃঃ ১৮৫।

৩। বেথুন সোসাইটির ১৮৬৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বরের অধিবেশনে কেশবচন্দ্র সেন 'A Visit to the Punjab' নামে একটি বক্তৃতা দেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি নানক, চৈতন্য প্রসঙ্গে মার্টিন লুথাবের উল্লেখ করেন।—বেথুন সোসাইটি, যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃঃ ৯৭

৪। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃঃ ৩৭-৩৮

৫। Leonard G. S., History of the Brahmo Samaj.
Shastri, Sibnath, History of the Brahmo Samaj, Vols.1, II (1911-12)

৬। "হিন্দুসমাজে যাহাতে কোন প্রকার বিপ্লব উপস্থিত না হয় তাহার জন্য সাবধানতা অবলম্বন" দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা ছিল।—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী, সংকলক প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, ভূমিকা।

'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির' উদ্‌বোধনে আপত্তি জানিয়ে দেবেন্দ্রনাথ লেখেন, "সে সংশয় এই যে ব্রহ্মমন্দিরে প্রিয়তম ব্রহ্মের সহিত খ্রীষ্ট ও চৈতন্য প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর ভ্রান্ত অবতারদিগেরও আরাধনা হইতে পারে! এই সংশয়ের প্রবল হেতু মুঙ্গেরের ব্রাহ্মসমাজে খ্রীষ্টের উপাসনা।"—পত্রাবলী, ২১শে শ্রাবণ, ১৭৯১ সন।

অপিচ,

"আমরা কেবল এক জন্মভূমির অনুরাগে ঋষিদিগের বাক্যেই জ্ঞানতৃপ্ত হইয়াছি—তিনি [কেশব] অসাধারণ উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদিদিগের সঙ্গে পালেস্তাইন ও আরববাসী ব্রহ্মবাদিদিগের সমন্বয় করিতে উন্নত হইয়াছেন—ইহা অতি কষ্টকল্পনা।"

—পত্রাবলী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্র।

৭। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, ১১শ পরিচ্ছেদ, পৃ: ২৪৫-৪৬। The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen, P. C. Mozoomdar, ch. VI, 1887, দ্বি-সং 1891.

৮। কেশবচন্দ্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন—'The politics of the age is Benthamism, its ethics utilitarianism, its religion rationalism, its philosophy positivism'. Basu, P. S.—Life and works of Brahmananda Keshab p. 106.

৯। "ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন বলিলেন সকল ধর্মই সত্য এবং সর্বধর্মসমন্বয় দেখাইবার জন্য হিন্দুর দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির ব্যাখ্যা এবং হোম ও আহুতি, খ্রীষ্টীয়ের জলাভিষেক প্রভৃতি অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন" —মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী (১৯১০)।

কেশবচন্দ্রের নিজের উক্তি :

"কখনো লক্ষ্মী, কখনো সরস্বতী, কখনো মহাদেব, কখনো জগদ্ধাত্রী—এই নানাভাবে কখনো এক নামে কখনো অন্য নামে হরিকে নিত্য নবীন বেশে দেখিব।"

১০। Mozoomdar P. C., The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen, ch. VI.

১১। 'Biography and Hagiography', E. E. Reynolds. 'The Month' Vol. 28. No. 1.

॥ বঙ্কিমচন্দ্র ও চরিতসাহিত্য ॥

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে (১৮৩৮-৯৪) 'শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ' সম্বোধন দ্বারা তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের শেষার্ধ বঙ্কিম-প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। ক্ষুরধার মননের চর্চার সঙ্গে সৃষ্টিশীল উদার কল্পনার এমন পরিপূর্ণ সার্থক প্রকাশ ঐ শতকে আর কারো মধ্যেই ঘটেনি।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একক প্রয়াসে, আমাদের উপন্যাস সাহিত্যকে, শতবর্ষের সাধনায় যা হতে পারত, সেই সমৃদ্ধিমণ্ডিত করেছেন। তিনি নরনারী জীবনের বিচিত্র রস ও রহস্যকে, তার ভালো-মন্দকে নিজের মনোদর্পণে ধারণ করেছেন, শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টিতে তাদের পর্যবেক্ষণ করেছেন, কল্পনাশক্তিতে তাদের নতুন করে নির্মাণ করেছেন। তিনিই আমাদের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রথম উপন্যাস-বর্ণিত নরনারীর 'অন্তর্জীবন প্রকটনে যত্নবান' হয়েছিলেন। ইহলোকের মানবজীবন ও মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণে দুর্লভ দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

সেজন্য পরলোকতত্ত্ব, ভক্তি-বিহ্বলতা, সংসার-বিচ্যুত অধ্যাত্ম-সাধনা, অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি প্রভৃতির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের ভক্তিবিহ্বলতা, পাপবোধতত্ত্ব, প্রত্যাদেশ প্রভৃতির বিরোধী ছিলেন। খ্রীষ্টভক্ত নিউম্যান বা থিওডোর পার্কার, যাঁদের রচনার ভক্ত ছিলেন কেশবচন্দ্র, তাঁদের লেখা বঙ্কিমকে আকৃষ্ট করেনি।[১] সাধু পরমহংসদেবের কথাবার্তায় বা আচার-আচরণে তিনি কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন, গভীর শ্রদ্ধা তাঁর মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ। 'শ্রীম' অবশ্য লিখেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের শেষাংশ, (নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব আলোচনা) পরমহংসদেবকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। এই উক্তির সত্যতা আরো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। চৈতন্যদেবের ভক্তি-আন্দোলনের প্রতিও বঙ্কিমচন্দ্র প্রসন্ন ছিলেন না। কেন না, সেখানে 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'। মনন-চর্চানিষ্ঠ বঙ্কিম-মানস যুক্তিবিস্মৃত ভক্তিকে স্বীকার করতে পারেনি। অন্যদিকে নব্য-হিন্দুত্ব আন্দোলনের নেতা পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির প্রতি প্রথম দিকে অনুকূল থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র অচিরে তর্ক-চূড়ামণির যুক্তির অন্তঃসার-শূন্যতা উপলব্ধি করে তাঁর মতের বিরোধিতা করেছেন। যেখানে বুদ্ধি, যুক্তি ও মননের প্রকৃষ্ট চর্চা অনুপস্থিত সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র অসহিষ্ণু।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগী কালিদাস দত্ত দুঃখ করে লিখেছেন, "যে শক্তি শুদ্ধ Rationalism-এর, বৌদ্ধভাবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহাই কেবল তাঁহার সহায় ছিল।"[২] মর্ত্য-সংসার ও মানবজীবনের প্রতি গভীর অনুরাগ বঙ্কিমচন্দ্র বহন করেছেন। সেই অনুরাগে আজীবন তিনি ইতিহাসের নিষ্ঠাবান ছাত্র। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন :

> "কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশী সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ফ্লরেন্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। রিণাইসেন্সের ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গালারও যাহাতে আবার নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল তিনি বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" বলিয়া 'বঙ্গদর্শনে' সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।"[৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চর্চার পিছনে তাঁর প্রদীপ্ত স্বাদেশিক ও জাতিগর্বী-চেতনা সমভাবে কার্যকরী ছিল। 'ইয়ং বেঙ্গল'-গোষ্ঠী 'Reason'কে তাঁদের চিন্তা-ভাবনায় মুখ্য স্থান দিয়েছিলেন, তাঁদের ইতিহাস চর্চায় তার প্রমাণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের ঐ সাধুপ্রচেষ্টাকে আরো উন্নত করেছেন। ইংলণ্ডে উনবিংশ শতকে ইতিহাস চর্চায় 'জাতিত্ববোধ' বা 'idea of nationality' বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছিল। টার্নারের (১৭৬৮-১৮৪৭) 'History of the Anglo-Saxons', কেম্‌ব্লের (১৮০৭-৫৭) 'The Saxons in England' গ্রন্থগুলি তারই সাক্ষ্য দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রও 'বাঙ্গলার ইতিহাস,' 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার', 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেন। পাশ্চাত্যে উনবিংশ শতকের ইতিহাস চর্চায় নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্যে ইতিহাসের আলোচনায় সেই দায়িত্ব পালন করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিচারধর্মী তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসপ্রীতি শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের আলোচনায় প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু শুধু ইতিহাসপ্রীতি নয়, বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের উনবিংশ শতকের দার্শনিক চিন্তার দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বেন্থাম্ (১৮২০-১৯০৩), হার্বার্ট স্পেনসার (১৭৪৮-১৮৩২), কঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭) ও স্টুয়ার্ট মিলের (১৮০৬-৭৩) রচনা দ্বারা তাঁর চিন্তা পরিমার্জিত হয়েছিল। তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনাকালে আমাদের প্রচলিত ধারণা, সংস্কার ও সিদ্ধান্ত

থেকে শত যোজন দূরে অগ্রসর হয়েছিলেন, না হলে তাঁর পক্ষে লেখা কি সম্ভব ছিল :

"ধর্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম।'—এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ। কথাটায় এখনকার Herbert Spencer, Bentham, Mill ইতি সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ কোন প্রকারে অমত করিবেন না জানি। কিন্তু অনেকে বলিবেন এ যে ঘোরতর হিতবাদ—বড় Utilitarian রকমের ধর্ম। বড় Utilitarian রকম বটে, কিন্তু আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাইয়াছি যে, ধর্মতত্ত্ব হিতবাদ হইতে বিযুক্ত করা যায় না।…সঙ্কীর্ণ খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে হিন্দুধর্মে বলে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, হিতবাদ সে ধর্মের প্রকৃত অংশ। এই কৃষ্ণ বাক্যই যথার্থ লক্ষণ।"[৪]

এই পরিচ্ছেদের শেষে বঙ্কিম আরো লিখেছেন :

"আমরা মহতী কৃষ্ণকথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব প্রভৃতি আটাইশ তত্ত্বের কচকচিতে মন্ত্রমুগ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে ত কোন জাতি অধঃপাতে যাইবে ?"

এবং মন্তব্য করেছেন ঃ

"বেন্থামের কথা ইংলণ্ড শুনিল—কৃষ্ণের কথা ভারতবর্ষ শুনিবে না ?"

প্রত্যক্ষবাদী কঁৎ ও 'হিতবাদী' বেন্থামের অনুরাগী বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে কৃষ্ণচরিত্রকে মানবপন্থী দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হয়েছিল। কৃষ্ণচরিত্র রচনায় তিনি রবার্ট সীলির (১৮৩৪-৯৫) Ecce Homo (১৮৬৬) গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন মনে করা সঙ্গত।[৫] এই গ্রন্থে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খ্রীষ্টকে ঘিরে যে অলৌকিক ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছে তার থেকে স্বতন্ত্র করে 'মানব'রূপে তাঁকে দেখবার ও দেখাবার প্রয়াস করেন সীলি। তাঁর Natural Religion[৬] (১৮৮২) গ্রন্থে ব্যাখ্যাত 'culture' তত্ত্ব, "The substance of religion is culture and the fruit of it higher life'—বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী'র আখ্যাপত্রে উৎকলন করেন। তার কারণ ঐ 'culture' বা 'অনুশীলন' বঙ্কিমচন্দ্রের কাম্য আদর্শ। খ্রীষ্ট সম্পর্কে Dr. Brookly-র প্রদত্ত একটি ভাষণও উদ্ধৃত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ঐ ভাষণে বলা হয়েছিল :

"Let no fear of losing the dear great truth of divinity of

Jesus make you lose the dear great truth of the humanity of Jesus. He took upon himself our nature, as a man of the like passions, he fought that terrible fight in the wilderness year by year as an innocent man, was he persecuted by narrow-hearted Jews; and his was a humanity whose virtue was pressed by all the needs of the multitude and yet kept its richness of nature."

ঐ সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন 'শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি ঠিক এই কথা বলি।' বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমর্থন থেকে তাঁর যুক্তিবাদী মানবপন্থী দৃষ্টির পরিচয় মেলে। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থেব দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনেব শেষে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন :

"কৃষ্ণের ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানব-চরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য।"

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রকে 'মনুষ্যচরিত্র'রূপে গ্রহণ করে তাকে প্রতিষ্ঠিত কবতে চেয়েছিলেন, সেজন্য তিনি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নিন্দাভাজন হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি 'অনুসন্ধান দ্বারা সত্যেব দিকে' ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে কৃষ্ণচবিত্রের বিচার করেছিলেন, ভক্তের দৃষ্টিতে নয়। সেজন্য তাঁর কৃষ্ণচরিত্র সাধারণের মনে প্রেম বা ভক্তিসঞ্চারক্ষম নয় বলে অনেকে সমালোচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সত্য-সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশংসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ :

"কৃষ্ণচরিত্রে উদ্দাম ভাবেব আবেগে তাঁহার কল্পনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি পদে পদে আত্মসম্বরণপূর্বক যুক্তির সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন কবিয়া চলিয়াছেন।"[৭]

বাংলা চরিত সাহিত্যের আলোচনায় 'কৃষ্ণচরিত্রে'র বিশিষ্ট স্থান আছে। কেন না বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে 'মনুষ্যচরিত্র'রূপে দেখিয়েছেন এবং 'প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথক্ করণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ' নিঃসংকোচে করেছেন, খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে কৃষ্ণচরিত্রের আদ্যন্ত ইতিহাস রচনা করেছেন। রেণাঁ যে 'Life of Jesus' (১৮৬৩) লিখেছিলেন তার মধ্যে তিনি ঘোষণা করেছিলেন 'it is to make the observation of facts

our groundwork. We banish miracle from history'।[৮] বঙ্কিমচন্দ্রও দৃঢ়কণ্ঠে বলেন : 'যাহা অতিপ্রকৃত, তাহা পরিত্যাগ করিব'।

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রকে 'অপ্রকৃত' বা অলৌকিক বেষ্টনী থেকে উদ্ধার করে তাকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দিলেন এবং ঘোষণা করলেন কৃষ্ণ 'মনুষ্যচরিত্র'। কিন্তু এর কি প্রয়োজন ছিল? বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে নিশ্চয়ই ছিল। কেননা এই সময় যীশু, বুদ্ধ ও চৈতন্য সম্পর্কে ব্রাহ্মসমাজ যে মতামত পোষণ করতেন, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি তার থেকে পৃথক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যীশু, শাক্যসিংহ, চৈতন্যকে 'মনুষ্যশ্রেষ্ঠ' বলতে সম্মত ছিলেন কিন্তু 'আদর্শ পুরুষ' বলে স্বীকার করেন নি। তিনি প্রশ্ন করেছেন পতিতোদ্ধার বা "Christian Ideal কি যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ?' এই সূত্রে তিনি 'Hindu Ideal'-র কথা তুলেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন 'যথার্থ হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ—খ্রীষ্ট প্রভৃতিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার সম্ভাবনা নাই।' 'মনুষ্যত্ব' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি নিজস্ব বিশিষ্ট ধারণা ছিল। তাঁর মতে :

> "মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব। যাঁহাতে সে সকলের চরম স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মনুষ্য। খ্রীষ্টে তাহা নাই—শ্রীকৃষ্ণে তাহা আছে। ...কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মনুষ্য—'Christian Ideal' অপেক্ষা 'Hindu Ideal' শ্রেষ্ঠ।"[৯]

বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যদেশ ও ভারতবর্ষ উভয় দেশেব সমকালীন অবস্থা বিচার করে দেখিয়েছেন যে পাশ্চাত্যে খ্রীষ্টেব আদর্শ এবং ভারতে কৃষ্ণের আদর্শ উভয়ই কার্যতঃ লুপ্ত হয়েছে। তিনি গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন, 'হিন্দু ধর্মের আদর্শ পুরুষ [শ্রীকৃষ্ণ] সর্বকর্মকৃৎ,—এখনকার হিন্দু সর্ব কর্মে অকর্মা'। সেজন্যই ভারতবর্ষের সামাজিক অবনতি ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল :

> "জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না।
>
> এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে। ভরসা করি এই কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় সে কার্যের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবে।"[১০]

বঙ্কিমচন্দ্র 'মানুষের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্যে'র ধারণা মূলতঃ

পেয়েছিলেন মানবপন্থী দার্শনিক কঁতের রচনা থেকে। কঁতের এই মতবাদ হার্বার্ট স্পেনসর ও স্টুয়ার্ট মিলের রচনায় পরে ব্যাখ্যাত হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন'-তত্ত্বের সূত্রগুলি কৃষ্ণ চরিত্রে প্রত্যক্ষ মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

> "অনুশীলন ধর্মে যাহা তত্ত্বমাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ।"[১১]

এই কারণে রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণচরিত্রে'র সমালোচনায় বঙ্কিম ব্যাখ্যাত কৃষ্ণকে 'মূর্তিমান থিওরি' বলেছেন। ঐতিহাসিক ও মানবিক দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনা করেছিলেন বলেই চরিত সাহিত্যের আলোচনায় 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থকে অন্তর্ভুক্ত করা হল। এই 'Secular' ও 'human' দৃষ্টি উনবিংশ শতকের বাংলার রেনেসাঁসের দান। সাম্প্রতিক কালের জনৈক সমালোচক 'কৃষ্ণচরিত্র' বিচারে মন্তব্য করেছেন :

> "বঙ্কিমের মধ্যে প্লুটার্কীয় কল্পনা-উজ্জীবন ও বিবেক-বিশ্লেষণ পদ্ধতির সঙ্গে একেবারে আধুনিক তথ্য সংকলন রীতি ও পরীক্ষা প্রমাণের সমস্ত কৌশলের সমন্বয় দেখা যায়। তিনি নিজেই তাঁর কৃষ্ণচরিত্র রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন : 'সমালোচকের [এ ক্ষেত্রে জীবনীকারের] কার্য প্রয়োজনানুসারে দ্বিবিধ : এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস, অপর সত্যের সংগঠন'। এই প্রক্রিয়া প্রয়োগের দ্বারা যে শেষ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হলেন তা তাঁরই ভাষায় : 'কৃষ্ণ সর্বত্র সর্ব সময়ে সর্ব-গুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল ; তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্মনির্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অমানুষ।' শুধু আমাদের জীবনী সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর জীবনীসাহিত্যে বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র একটি সম্মানের স্থান পাবার যোগ্য।"[১২]

এই মন্তব্য সর্বথামান্য।

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে কর্মীরূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, ভক্ততারণ বা পতিতোদ্ধারী রূপ নয়।[১৩] বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে কেশবচন্দ্রের শিষ্য উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনী লিখেছিলেন। কেশবচন্দ্রের অপর শিষ্য চিরঞ্জীব শর্মা [ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল] 'ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা' লেখেন। তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে 'ভক্তি'র ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

। আমি এ মহাত্মার [শ্রীকৃষ্ণের] জীবনচরিত আলোচনা করিয়া তৎপরে তাঁহার উপর সচরাচর যে সকল গুরুতর দোষ আরোপিত হয়, তদ্বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত মত প্রকাশ করিব।”

এ দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকে দেখেছিলেন বলেই তিনি রাসলীলার ব্যাখ্যায় বলেন: ‘এই রাসলীলা যদি একটি নির্দোষ বাল্যক্রীড়া হয় তাহা হইলে এই ভদ্রসন্তানের অপরাধ কি?’ কিন্তু গৌরগোবিন্দ ও ত্রৈলোক্যনাথ যাঁরা কেশবচন্দ্রের ভক্ত-শিষ্য, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত বর্ণিত কর্মীশ্রেষ্ঠ রূপ নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। কেশবচন্দ্র ‘Reason’-এর বিরোধী ছিলেন, আর বঙ্কিমচন্দ্র তার পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রাসলীলায় ‘আদর্শ মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি’গুলির মধ্যে শেষোক্তটির প্রকাশ বলে ঘোষণা করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দও (১৮৬৩-১৯০২) শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের সমালোচনায় লিখেছেন:

“শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে অনেক অনিশ্চিত বিষয় জড়িত হইয়া তাঁহার মূলচরিত্রকে এরূপ কুজ্ঝটিকাবৃত করিয়াছে যে তাঁহার জীবন হইতে জীবনপ্রদ উদ্দীপনা লাভ করা বর্তমানকালে অসম্ভব।”[১৪]

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু ‘জীবনপ্রদ উদ্দীপনা’ লাভ করা যাতে জাতির পক্ষে সম্ভব হয়, সেই মহৎ কাজই করেছিলেন। নবীনচন্দ্র সেন স্ব-কল্পিত শ্রীকৃষ্ণের জীবন অবলম্বনে ‘রৈবতক’, ‘কুরুক্ষেত্র’, ‘প্রভাস’ ত্রয়ী কাব্য রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন: “to keep clear of history, but I cannot advise you to run counter to history.”—নবীনচন্দ্রে ও বঙ্কিমচন্দ্রে এইখানেই পার্থক্য। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক জ্ঞান ও দৃষ্টি নবীনচন্দ্রের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের জীবনের আদি-মধ্য-অন্ত্যপর্বের কালানুক্রমিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ গ্রথিত করেছেন মানবিক দৃষ্টিতে। সেজন্য ‘কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থ বাংলা চরিত সাহিত্যালোচনায় অন্তর্ভুক্তির বিশেষ দাবি রাখে।

বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে নানা ভ্রান্তি ও সংস্কারের কুজ্ঝটিকা জাল থেকে কৃষ্ণ-চরিত্রকে মুক্ত করে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। অন্যদিকে সমসাময়িক দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯), ও সঞ্জীবচন্দ্রের (১৮৩৪-৮৯) জীবনচিত্র রচনায়ও তিনি চরিতসাহিত্যের ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-৮৩) কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রলাল মিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশে পিতার রচনাবলী প্রকাশ করেন। তার নাম 'লুপ্তরত্নোদ্ধার'। এই গ্রন্থাবলীর ভূমিকা স্বরূপ রচিত তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' (১৮৯২) প্রবন্ধটি এই আলোচনার মধ্যে ঠিক পড়ে না। কেননা, ঐ রচনাটিতে লেখকের জীবনবৃত্তান্তমূলক কোনো পরিচয় নেই। বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের দুটি অক্ষয় কীর্তি সম্পর্কেই তিনি আলোচনা করেছেন,—প্রথমতঃ "বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ", দ্বিতীয়তঃ "প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল"'। কিন্তু প্যারীচাঁদের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে তিনি কিছু লেখেন নি।

দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রবন্ধগুলি লেখেন, সেগুলি কিছুটা প্রয়োজনের অনুরোধে। দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী সর্বপ্রথম ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধুর অকালমৃত্যু হয় ১৮৭৩ সালে। এই গ্রন্থাবলীর জন্য বঙ্কিমচন্দ্র 'রায় দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী' লিখে দেন। দশ বছর পরে (১৮৮৭) দীনবন্ধুর 'বাল্যরচনা সম্বলিত গ্রন্থাবলী'র যে সংস্করণ প্রকাশিত হয় তার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র 'দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব' শীর্ষক আলোচনাটি লেখেন। এই দুটি রচনা মিলিয়ে পড়লে তবেই বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধুর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণার পূর্ণ পরিচয় মিলবে।

'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' রচনাটি ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী' ঐ সালে প্রকাশ করেন। এই কবিতার নির্বাচন ও সম্পাদনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক রামচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক "মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সার সংগ্রহ' খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে থাকে। এর প্রথম তিন সংখ্যা বার হয় ১৮৬২ সালে, আর অষ্টম সংখ্যা বার হয়েছিল ১৮৭৪ সালে। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলীর প্রথম খণ্ড সম্পাদনকালে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেন। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী ১৮৯৩ সালে রচিত। মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর রচনাসংকলন বঙ্কিমচন্দ্র "সঞ্জীবনী সুধা" নামে প্রকাশ করেন। জীবনবৃত্তান্তমূলক রচনাটি তারই ভূমিকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনবৃত্তান্ত সহ তাঁদের কাব্য ও গীত প্রকাশে অগ্রণী হয়েছিলেন। আমরা পূর্বে দেখিয়েছি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কি উদ্দেশ্য নিয়ে কবিজীবনী রচনায় ব্রতী হন। তাঁর হৃদয়ে প্রাচীন ধারার কবিতার প্রতি অনুরাগ ছিল, সেই অনুরাগের বশবর্তী হয়েই তিনি কবিদের জীবনের বিবিধ তথ্য ও তাঁদের রচিত কবিতা ও গীত সংগ্রহে তৎপর হয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ন্যায় সংগ্রাহক বা সংকলক মাত্র নন, তিনি আলোচ্য শিল্পীদের জীবন ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাখ্যাতা বা 'interpreter'। একথা মনে করা সংগত যে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিজীবনী প্রকাশের দ্বারা প্রভাবিত হন নি। তিনি এ ক্ষেত্রে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন বোধ করি অষ্টাদশ শতকের সাহিত্যরথী স্যামুয়েল জনসন্‌কে। জনসনের (১৭০৯-৮৪) জীবনের শেষ স্মরণীয় কর্ম তাঁর 'The Lives of the Poets' সিরিজ রচনা। অবশ্য মূলতঃ প্রকাশকদের তাড়নায় ও নির্দেশে বাহান্ন জন ইংরেজ কবিকে তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত ও কাব্যরচনা সহ পাঠক-সাধারণের কাছে নতুন করে পরিচিত করাবার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই কর্মে হস্তক্ষেপ করেন। জনসন্‌ এই 'preface'-গুলি লিখেছিলেন নির্বাচিত কবিদের কবিতা-সংকলনের পুরোভাগে স্থাপনার জন্য। দশ খণ্ডে সমাপ্ত এই কাব্যসংকলনের কাজ জনসন্‌ করেন ১৭৭৯-৮১ সালের মধ্যে। এই 'preface' গুলি স্বতন্ত্র ভাবে মুদ্রিত হয় 'The Lives of the English Poets' নামে চারখণ্ডে, ১৭৮১ সালে।

বঙ্কিমচন্দ্র অনুরূপভাবে দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী (১৮৭৭) প্রথম প্রকাশের সময় রচিত 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী' প্রবন্ধটি দীনবন্ধুর পুত্রদের স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশের অনুমতি দেন। ১৮৭৭ সালেই এই জীবনীটি স্বতন্ত্র ভাবে বার হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী "সঞ্জীবনী সুধাও" স্বতন্ত্র পুস্তিকা রূপে ১৮৯৩ সালে বেরিয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে বঙ্কিমের রচনাটি পৃথক ভাবে মুদ্রিত হয়নি। জনসন্‌ 'Lives of The Poets' লিখবার সময়ে প্রথমে আলোচ্য কবির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত দিয়ে পরে 'critical examination of his genius and works' লিপিবদ্ধ করেছেন। জনসন্‌ জীবনীসাহিত্যের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। বেইলি যে 'অভিধান' সংকলন করেন তার মধ্যেকার জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ক রচনাগুলির তিনি প্রশংসা করেছেন। নিজে ড্রাইডেনের জীবনী লিখতে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহে ব্যর্থকাম হওয়ায়

ঐ প্রচেষ্টা ত্যাগ করেন। আইজাক ওয়াল্টনের 'Lives' তাঁর প্রিয় গ্রন্থ ছিল। ঐ গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশের সংবাদে তিনি আনন্দপ্রকাশ করেছিলেন। জনসন্ যে সকল কবিজীবনী রচনা করেছিলেন তাদেব মধ্যে দেখা যায়, তিনি কবি বা লেখকের জীবনের জ্ঞাত ছোট-বড়ো নানা তথ্য ও তাঁব চরিত্রেব সহায়তায় তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে ব্যাখ্যা বা 'interpret' কবেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র জনসনের মতোই দেখতে পাই কাব্যের সঙ্গে কবিকে মিলিয়ে-মিশিয়ে দেখিয়েছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আলোচনায় জীবনবৃত্তান্ত ও চবিত্রের সহযোগে কাব্য ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উত্থাপন কবেন। বঙ্কিম ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁব পাবিবাবিক জীবনের ইতিহাস জ্ঞাত ছিলেন না। কবিতা পড়ে বুঝেছিলেন কবি 'মেকিব শত্রু' এবং একথাও বুঝেছিলেন যে ঈশ্বরগুপ্তের রচনায় ব্যঙ্গের ঝাঁঝ সহানুভূতি-হীন। যখন বঙ্কিমচন্দ্র কবিব 'জনৈক বাল্যসঙ্গীর স্মৃতিকথা'[১৫] থেকে জানতে পারলেন বাল্যে তাঁর মাতৃবিয়োগ, পিতার পুনবায় দারপরিগ্রহ, সৎমায়েব প্রতি 'রুল' নিক্ষেপ প্রভৃতি সংবাদ এবং পবে গোপালবাবুব নোট থেকে তাঁর দাম্পত্য জীবনের বিষণ্ণ অধ্যায়,—তখন তাঁর কাছে ঈশ্বরগুপ্তের অন্তর্জীবনেব সমস্ত ক্ষোভ, জ্বালা যেভাবে তাঁর কবিতায় ফেটে পড়েছে তাব উৎস খুঁজে পেলেন। বঙ্কিম ঠিকই লিখেছেন: 'যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই। স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গেব পাত্র'। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব রচনাটির প্রথম অংশে ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁব জীবনের নানা তথ্য (যেগুলি প্রধানতঃ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংগ্রহ কবে দিয়েছিলেন) বিন্যাস করে লিখেছেন:

> "এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্রেব চবিত্র সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ কবিব। ঈশ্বরচন্দ্রেব ভাগ্য তাঁহার স্বহস্ত গঠিত।"

"স্বহস্তগঠিত' মানুষ হিসাবে 'নিজের প্রতিভাগুণে' ঈশ্বরগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রেব শ্রদ্ধাব পাত্র হয়েছিলেন। কবিকে না জানলে কাব্যকে পরিপূর্ণভাবে জানা যায় না, এই দৃষ্টিভঙ্গি তিনি পাশ্চাত্য সমালোচনা সাহিত্য থেকে পেয়েছিলেন। ব্যক্তি-কবি ও সৃষ্ট-কাব্য উভয়ের পাবস্পরিক সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন:

> "কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা

কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণমাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।”[১৬]

বঙ্কিমচন্দ্র যে কথা ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কে বলেছেন, দীনবন্ধু মিত্রের আলোচনায়ও সেকথা সত্য। উভয় ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা যথার্থ ‘সামাজিক’ মানুষ। তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির পরিচয় যখন বঙ্কিম দিতে চেয়েছেন তিনি তাঁদের ব্যক্তিজীবন ও তৎকালীন সমাজ-জীবনকে জ্ঞাত তথ্যের সাহায্যে পর্যালোচনা করেছেন এবং বহুলাংশে তারই সাহায্যে তাঁদের শিল্পী মনের বিশিষ্ট চেহারাটিকে ধরবাব প্রয়াস পেয়েছেন। শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নও সেই মানদণ্ডে বিচার করেছেন। কাজেই ব্যক্তি-জীবন, সমাজ-জীবন ও তাদের সংঘাত-সমন্বয়ে প্রভাবিত কাব্য ও কবির যে সমালোচনা-পদ্ধতি বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থাপিত করলেন তাকে বাংলা সাহিত্যে যুগান্তকারী বলতে হয়। কিন্তু শুধু যদি পৃথক ভাবে ‘জীবনবৃত্তান্ত’ অংশটুকুকে ধরি তাহলেও দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্র সেখানেও প্রশংসনীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখে গেছেন। জনসন্ বলেছিলেন ‘lives can only be written from personal knowledge’, বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ঈশ্বরচন্দ্র, দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী-প্রবন্ধগুলি পূর্ণাঙ্গ ‘Life’ না হলেও এঁদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘personal knowledge’ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কৈশোব জীবনের সাহিত্যগুরু, দীনবন্ধু তাঁর সমপ্রাণ সখা, সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর মধ্যমাগ্রজ। সেজন্য এই তিনজনের যে-জীবনী-প্রবন্ধ বঙ্কিম লিখেছেন তার মধ্যে বর্ণিত ব্যক্তিরা জীবন্ত ও অন্তরঙ্গ (intimate) হয়ে উঠেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী রচনায় মুখ্যতঃ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘নোট’গুলি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে নিজের ব্যক্তিগত পরিচয়জাত অভিজ্ঞতাও এই সূত্রে কি লিপিবদ্ধ করেন নি? ঈশ্বর গুপ্ত যে ‘কতকগুলা নন্দী-ভৃঙ্গীদ্বারা পরিবৃত’ থাকতেন, সেখানে ‘রসাভাস’ প্রবল হত, তিনি

'স্বপ্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভালোবাসিতেন', 'হেমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার আবৃত্তিশক্তি পরিমার্জিত ছিল না' ওদিকে 'চরিত্রটি নির্মল ছিল না' পানদোষ ছিল, 'যে সময়ে তিনি সুরাপান করিতেন, সে সময়ে লেখনী অনর্গল প্রসব করিত', কেউ 'ঋণ পরিশোধ না করিলে তাহা আদায় জন্য' চেষ্টা করিতেন না—এ সব তথ্য বঙ্কিম নিজে জানতেন। জনসন্ বলেছেন—তুচ্ছ ঘটনা বা চকিত-পরিহাসের মধ্য দিয়ে একটি লোকের অন্তরকে অনেক বেশি জানা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় তার পরিচয় আছে। জনসন্ দেখিয়েছেন, অ্যাডিসন্ তাঁর রচিত ট্রাজিডি 'কেটো'র (১৭১৩) প্রথম রাত্রির অভিনয়কালে কী দারুণ অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, অথবা স্যাভেজ নিজের কবিতা পড়তে পড়তে চুপি চুপি চোখ তুলে দেখে নিচ্ছেন শ্রোতারা তাঁর কবিতার বিশেষ-বিশেষ স্থলগুলি কেমন উপভোগ করছে, অথবা প্রিন্সেস্ অব ওয়েলস্-এর সামনে 'দি ক্যাপটিভস্' কাব্য পড়তে গিয়ে কবি গে কেমন নার্ভাস হয়ে যান, এমনি কত ঘটনা। এই ঘটনাগুলির বর্ণনা দ্বারা জনসনের আলোচিত কবিরা পাঠকের সামনে সহজ চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র জনসনের পন্থাকেই অবলম্বনের চেষ্টা করেছিলেন।

দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে তিনি যে-বেদনা বোধ করেছেন, এমন আর কারো ক্ষেত্রে করেছেন বলে জানা যায় না। 'বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ' রচনাটিতে (১৮৭৬) তিনি দীনবন্ধুর মৃত্যু স্মরণ করে লিখেছিলেন যে 'তিনি সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখদুঃখের ভাগী ছিলেন', এবং 'অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক—আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু। জনসন্ তাঁরবন্ধু রিচার্ড স্যাভেজের জীবনী লিখেছিলেন (১৭৪৪), বঙ্কিমও তাঁর বন্ধুত্তম দীনবন্ধুর জীবনী রচনা করেন। এই সাদৃশ্য দেখাবার উদ্দেশ্য দীনবন্ধু ও স্যাভেজের তুলনা করা নয়। স্যাভেজ দীনবন্ধুর ন্যায় উন্নত চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট ছিলেন না, উভয়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবেরা লিখেছেন এইটুকু বলাই উদ্দেশ্য।

১৭৭২ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে জনসন্ বসওয়েলকে বলেছিলেন :

"nobody can write the life of a man but those who have eat and drunk and lived in social intercourse with him."

দীনবন্ধুর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধরণের ঘনিষ্ঠতাই ছিল। দীনবন্ধুর জীবনী লেখার তিনিই ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু কতকগুলি বাধা ছিল। তার

বিষয় বঙ্কিম নিজেই বলেছেন। যিনি 'সম্প্রতি মাত্র অন্তর্হিত' হয়েছেন তাঁর জীবনী রচনা করতে গেলে সমসাময়িক জীবিত অনেক ব্যক্তি সম্পর্কে বহু অপ্রিয়, গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটিত করার প্রয়োজন হত, বঙ্কিম সে-পথ পছন্দ করেন নি। তাছাড়া জীবনচরিতের উদ্দেশ্য যদি শিক্ষাদান হয় তাহলে 'বর্ণনীয় ব্যক্তির দোষ-গুণ উভয়েরই সবিস্তার বর্ণনা করিতে হয়। কেন না 'দোষশূন্য মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই,—দীনবন্ধুরও যে কোন দোষ ছিল না ইহা কোন সাহসে বলিব ?'—সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন "এক্ষণে দীনবন্ধুর প্রকৃত জীবনচরিত লিখিব না। যাহা লিখিব, তাহা পক্ষপাতশূন্য হইয়া লিখিতে যত্ন করিব। দীনবন্ধুর স্নেহ ঋণে আমি ঋণী, কিন্তু তাই বলিয়া আমি মিথ্যা প্রশংসার দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ করিবার যত্ন করিব না।"

জীবনচরিত রচনা সম্পর্কে এই হল খাঁটি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি। পূর্বে কিশোরীচাঁদ মিত্রের রচনায় এই দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। বন্ধুর জীবনচরিত প্রণয়নের চেয়ে নিজের মধ্যমাগ্রজের চরিত-প্রবন্ধ রচনা করা আরো কঠিন বা 'delicate' ব্যাপার। বঙ্কিমচন্দ্র সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। কেননা কোনো অন্যায় মোহ বা অহেতুক ভক্তিপোষণ ঋজু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বঙ্কিমের পক্ষে অসম্ভব ছিল। বঙ্কিমের বক্তব্য উদ্‌ধৃত করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে :

> "৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার সহোদর। আমি ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ তাঁহার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্য যাহা করিয়াছি, আমার অগ্রজের জন্য তাহাই করিতেছি। তবে ভ্রাতৃস্নেহসুলভ পক্ষপাতের পরিবাদ ভয়ে তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনার ভার আমি গ্রহণ করিলাম না।
>
> জীবনী লিখিবারও আমি উপযুক্ত পাত্র নহি। যাঁহার জীবনী লেখা যায় তাঁহার দোষগুণ উভয়ই কীর্তন না করিলে, জীবনী লোকশিক্ষার উপযোগী হয় না—জীবনী লেখার উদ্দেশ্য সফল হয় না। সকল মানুষের দোষগুণ দু-ই থাকে; আমার অগ্রজেরও ছিল।
>
> "কিন্তু তাঁহার দোষ কীর্তনে আমার প্রবৃত্তি হইতে পারে না; আমি তাঁহার গুণ কীর্তন করিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, ভ্রাতৃস্নেহজনিত পক্ষপাতের ভিতর ফেলিবে। কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনা সকল আমি ভিন্ন আর কেহ সবিশেষ জানে না—সুতরাং আমিই লিখিতে বাধ্য। লিখিতে গেলে তাঁহার দোষগুণের কথা কিছুই বলিব না, এমন প্রতিজ্ঞা

রক্ষা করা যায় না, কেন না, কিছু কিছু দোষগুণের কথা না বলিলে ঘটনা-গুলি বুঝান যায় না। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার দোষে বা তাঁহাব গুণে ঘটিয়াছিল। কি দোষে কি গুণে ঘটিয়া-ছিল তাহা বলিতে হইবে। তবে যাহাতে গুণ দোষের কথা খুব কম বলিতে হয়, সে চেষ্টা করিব।”

এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের ‘art of biography’র ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান রেখে গেছেন। দীনবন্ধুর, যাঁব ‘অন্তঃকরণের মত অন্তঃকরণের অভাব বঙ্গদেশে কেন—মনুষ্যলোকে চিরকাল থাকিবে’—সেই দীনবন্ধু সম্পর্কেও তিনি ইঙ্গিতে জানিয়েছেন, ‘রোগাক্রান্ত হইয়া অবধি দীনবন্ধু অতি সাবধান এবং অবিহিতাচারবর্জিত হইয়াছিলেন’। অন্যত্র স্পষ্টই লিখেছেন :

“বন্ধুব অনুরোধে বা সংসর্গদোষে নিন্দনীয় কার্যের কিঞ্চিৎ সংস্পর্শ তিনি সকল সময়ে এড়াইতে পারিতেন না।”

এবং যে দীনবন্ধুর ‘হৃদয়েব অসাধাবণ গুণ এই ছিল, যে, ‘যাঁহাব দুঃখ, সে যেরূপ কাতর হইত, দীনবন্ধু তদ্রূপ বা ততোধিক কাতব হইতেন’ তিনিই কিন্তু ‘ক্যালকাটা রেভিউ’ পত্রিকায় ‘সুরধুনী কাব্যেব’ ও ‘সধবার একাদশী’ নাটকের সমালোচনায় ক্রুদ্ধ হয়ে সমালোচককে ব্যঙ্গ করে পরে ‘ভোঁতারাম ভাট’ চরিত্র সৃষ্টি করেন।[১৭] বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর এই আচরণ সমর্থন করেন নি,—“ভোঁতারাম ভাট’ দীনবন্ধুর চরিত্রে ক্ষুদ্র কলঙ্ক।”

বঙ্কিম স্বীকার কবেছেন “তাঁহাব [দীনবন্ধু] প্রকৃত হাস্যপটুতার শতাংশেব পবিচয় তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না”। বঙ্কিম দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা বা মুখোক্তির উল্লেখ করলে ভালো করতেন। কিন্তু তাঁব সেই সরস উক্তিটি ‘ফোঁড়া এখন আমার পায়ে ধরিয়াছে’—চমৎকাব wit। দীনবন্ধুর অকুণ্ঠ বাস্তবধর্মিতা, হাস্যরস সৃষ্টি, সমাজাভিজ্ঞতা, অকৃত্রিম উদার সহানুভূতি, কালজয়ী চরিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে বঙ্কিম যে বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য করে গেছেন তার চেয়ে নতুন কথা আজ পর্যন্ত বিশেষ কেউ বলেন নি। ‘ব্যক্তি’ দীনবন্ধুকে জেনেছিলেন বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা এত সার্থক হতে পেরেছে। দীনবন্ধুর জীবনের ‘অভিজ্ঞতা’ ও হৃদয়ের ‘সহানুভূতি’—এই দুই গুণের সমন্বয়ের ফলে দীনবন্ধু রচিত সাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করেছে। ‘ব্যক্তি’ দীনবন্ধু ও ‘শিল্পী’ দীনবন্ধুর সমন্বয়-সূত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের প্রথম নির্ণয় করে দেন। বঙ্কিম লিখেছেন :

“গ্রন্থকারের হৃদয় আমি বিশেষ জানিতাম, তাই একথা বলিয়াছি ও

বলিতে পারিয়াছি বলিয়া এ কথা বলিলাম। দীনবন্ধুর স্নেহ ও প্রীতি ঋণের যতটুকু পারি পরিশোধ করিব, এই বাসনা ছিল। তাই, এই সমালোচনা লিখিবার জন্য আমি তাঁহার পুত্রদিগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই অসাধারণ মনুষ্য কিসে অসাধারণ ছিলেন তাহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য।"

দীনবন্ধু সাধারণ মানুষের মধ্যে যথার্থই অসাধারণ ছিলেন। বঙ্কিম দীনবন্ধু সম্পর্কে অযৌক্তিক স্তুতি বা অহেতুক ভক্তি প্রকাশ করেননি। জনসন্ যার আখ্যা দিয়েছেন 'sincere admiration' দীনবন্ধু চরিত্রে তার পরিচয় আছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যালোচনা বঙ্কিম করেননি, তার কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত চরিত-প্রবন্ধটির মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের অন্তঃস্থ ব্যক্তি-পুরুষটি ধরা পড়েছে। একদিকে অসাধারণ প্রতিভাবান অথচ আঘাত বিনা সে প্রতিভার চর্চায় ও অনুশীলনে একান্ত উদাসীন—এই দ্বৈত-সত্তাব যে করুণ দ্বন্দ্ব সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনকে গড়েছে ভেঙেছে তার সার্থক ইতিহাস বঙ্কিম রচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মধ্যমাগ্রজেব জীবন পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে তাঁর 'প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখনও ভস্মাচ্ছন্ন, কখন প্রদীপ্ত'। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রেব জীবন চরিত রচনার প্রারম্ভে লিখেছিলেন 'কোন ব্যক্তির জীবনের ঘটনা পরম্পরার বিবৃতিমাত্র জীবনচরিতের উদ্দেশ্য নহে।' বঙ্কিমচন্দ্রের এ পর্যায়ের কোন রচনাই 'ঘটনা-পরম্পরার বিবৃতিমাত্র' নহে। ঈশ্বরচন্দ্র, দীনবন্ধু বা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে সংঘটিত কোনো কোনো ঘটনা তাঁদের জীবনের চাকাকে কী ভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছে জীবনের রহস্য-সন্ধানী দ্রষ্টা রূপে বঙ্কিম সেগুলির তাৎপর্য খুঁজেছেন। এবং এই বিরল দৃষ্টি থাকার জন্যই তিনি তাঁদের জীবন-ভাষ্য রচনাক্ষম হয়েছেন। সঞ্জীব-চন্দ্রের চরিত্রের মৌলিক ত্রুটি নির্দেশ করতে বঙ্কিম দ্বিধা করেননি তেমনি তাঁর প্রতিভার দীপ্তিকে ন্যায্য মূল্যও দিয়েছেন। গভীর বেদনার সঙ্গে তিনি লক্ষ করেছিলেন শেষ জীবনে :

"সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়িতে বসিয়া রহিলেন। কয়েক বৎসর কেবল বসিয়াই রহিলেন। কোন মতে কোন কার্যে কেহ প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। সে জ্বালাময়ী প্রতিভা আর জ্বলিল না।"

সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনের এই ট্রাজিডি বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর কারো পক্ষে দেখানো সম্ভব হত না।

ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু, সঞ্জীবচন্দ্র তিনজনই দোষ-গুণে মানুষ। সকলেই করুণা-প্রবণ হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত বহু লোককে অন্ন দিতেন, দীনবন্ধু পরদুঃখকাতর ছিলেন, সঞ্জীবচন্দ্র 'আশ্রিত অনুগত ব্যক্তি কুস্বভাবাপন্ন হইলেও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিতেন না।' এঁরা সকলেই অ-সাধারণ ব্যক্তি, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র না চিনিয়ে দিলে সে পরিচয় অজ্ঞাত থেকে যেত। জীবনী সাহিত্যের অন্যতম গুণ 'faithfulness of representation', বঙ্কিমের রচনা সেই গুণান্বিত। ঔপন্যাসিকের একটি বড়ো ধর্ম স্বষ্ট চরিত্রগুলির প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে 'detachment' বা 'দূরাবস্থান' রক্ষা করা। সে ধর্ম চরিতগ্রন্থ রচয়িতারও। বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিকের আচরিত সেই ধর্ম তাঁর চরিত-প্রবন্ধগুলিতে সঞ্চার করেছেন। সেজন্য এই জীবনবৃত্তান্তগুলি উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণাঙ্গ কোনো জীবনী লেখেননি। লিখলে বাংলা চরিতসাহিত্যের সমৃদ্ধি সহজেই ঘটত। ইতিহাস-বোধ ও ঐতিহাসিক কল্পনায় বঙ্কিমের সমকক্ষ শিল্পী আজও কেউ হন নি বঙ্গসাহিত্যে। তিনি একবার ভেবেছিলেন ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈকে নিয়ে লিখবেন, লিখলে আমাদের দেশে ইতিহাসাশ্রিত জীবনীর একটা standard বা মান তৈরী হয়ে যেত। কিন্তু বঙ্কিম লিখলেন না। ঠাট্টা করে বলেছিলেন, আনন্দমঠ পড়ে ইংরেজরা চটে গেছে, ঝান্সীর রাণীকে নিয়ে লিখলে কি আর রক্ষা থাকবে। আসলে বঙ্কিমের তখন আর দুরূহ শ্রম করবার মতো অবস্থা ছিল না, মনও ছিল না।

বঙ্কিম যদি আত্মজীবনী লিখতেন সেও বাংলা সাহিত্যে উচ্চাসন লাভ করত। যিনি ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য নির্ণয়ে 'চরিত্র'গুলির "অন্তর্জীবন প্রকটনে যত্নবান" হতে বলেন, লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী শিল্পীশ্রেষ্ঠ বঙ্কিম যদি 'আত্মচরিত' লিখতেন, তাহলে বাংলা সাহিত্যে বিস্ময়কর শিল্প সৃষ্ট হত। কিন্তু তিনি লিখলেন না, বললেন :

> "আমার জীবন অসার, তা লিখিয়া কি হইবে? সকল কথা বলা সহজ নহে, জীবনে অনেক ভ্রম-প্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। সে সব বলিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড়ো বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে

হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। ...চাকরী আমার জীবনের অভিশাপ আর স্ত্রীই আমার কল্যাণস্বরূপা।"

বঙ্কিমচন্দ্র রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১২৮১) পড়ে লিখলেন 'মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি।' বঙ্কিমচন্দ্র চরিতসাহিত্যের ক্ষেত্রে যে নাতিদীর্ঘ চরিত-প্রবন্ধগুলি রচনা করেছেন সেগুলি সম্পর্কে উক্ত মন্তব্যই প্রযোজ্য।

পাদটীকা

১. বঙ্কিম প্রসঙ্গ, পৃঃ ২২০, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্তৃক সংকলিত।

২. তদেব, কালিদাস দত্ত বর্ণিত স্মৃতিকথা।

৩. তদেব, 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায়', হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৪. কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬, দ্বি সং ১৮৯২) ষষ্ঠ খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, 'কৃষ্ণকথিত ধর্মতত্ত্ব'।

৫. 'Ecce Homo—Behold the Man', বইখানি প্রথম যখন প্রকাশিত হয় তখন গ্রন্থকর্তার নাম ছিল না। কেশবচন্দ্র সেনও গ্রন্থখানি পাঠ করে মুগ্ধ হন। 'Friend of India' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক জর্জ স্মিথ তাঁকে বইখানি পডতে দেন। কেশব বইখানি পড়ে এর 'enthusiastic admirer' হয়েছিলেন।—Life and Teachings of K. C. Sen, P. C. Mozoomdar, ch. vi 'Devotional and Missionary Excitement', p. 115.

৬. 'Natural Religion' শব্দটি কিশোরীচাঁদ মিত্র ব্যবহার করেন, মেরি কার্পেণ্টার সম্পাদিত 'The Last Days in England of Raja Rammohun Roy (১৮৬৬) গ্রন্থের সমালোচনায়। তিনি লকের (Locke) 'natural rights'-এর মতো 'natural religion' ব্যাখ্যা করেছিলেন। সম্পাদিকা রামমোহনকে খ্রীষ্টান সংজ্ঞা দেওয়ায় কিশোরীচাঁদ বিরক্ত হয়েছিলেন। তাঁর মতে রামমোহন ছিলেন প্রকৃতপক্ষে 'a religious Benthamite' এবং তাঁর ধর্ম 'Natural Religion'.—Cal. Review, 1867, vol. XLIV, p. 219.-33. তখনো সীলির গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। কেশবচন্দ্র সেনও 'Natural Religion'-এর কথা বলেছেন। মানুষের অন্তর্নিহিত

বৃত্তিগুলির পূর্ণ স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য চেয়েছিলেন. বঙ্কিমচন্দ্র। কেশবচন্দ্র যখন 'নববিধান মত' বা 'The New Dispensation' গড়তে যান (১৮৭৯-৮৩) তখন 'he felt he must establish a 'Natural Religion'—অর্থাৎ সকল ধর্মমতের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন ও তার অনুশীলন।—The Life and Teachings of K. C. Sen, P. C. Mozoomdar. ch. xi.

৭. বঙ্কিমচন্দ্র, আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ।

৮. Life of Jesus, Author's Introduction. রেঁণা ঐ সূত্রে লেখেন, "Up to this time a miracle has never been proved."

৯. কৃষ্ণচরিত্র, চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ, 'কৃষ্ণ-জরাসন্ধ সংবাদ'।

১০. তদেব। বঙ্কিম লিখেছেন, "যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে মদন ধর্মোৎসব। এতকাল আমাদের জন্মভূমি সেই মদন ধর্মোৎসব ভাবাক্রান্ত। তাই কৃষ্ণচরিত্রের অভিনব ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে"। দ্বিতীয় খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

১১. কৃষ্ণচরিত্র, প্রথম বারের বিজ্ঞাপন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।

১২ 'আমাদের জীবনী সাহিত্য' সুনীলচন্দ্র সরকার, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১২৬৯ শকাব্দ।

১৩. "যীশু বা বুদ্ধের জীবনীতে যতটা পতিতোদ্ধারের চেষ্টা দেখি, কৃষ্ণের জীবনে ততটা দেখি না, ইহা স্বীকার্য"। চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম পরিঃ। কেশবচন্দ্র সেন বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যার প্রশংসা করেন নি। কৃষ্ণ অপেক্ষা চৈতন্যদেব তাঁর কাছে অধিকতর প্রিয়—"Krishna preached the religion of the politician and warrior, while Chaitanya inculcated and practised asceticism and went about as a missionary vairagi"—The Indian Mirror, Jan. 28, 1877.

১৪. পত্রাবলী, ১৮৯৭।

১৫. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'জনৈক বাল্যসঙ্গীর স্মৃতিকথা', সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ, ১২১৬।

১৬. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব (১২৯১), পৃঃ ১৩১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।

১৭. এই সমালোচক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে (১৮২৪-৯৪)।

।। বঙ্কিম-সমসাময়িক প্রচেষ্টার একদিক ।।

স্বাদেশিক চেতনা : ইতিহাস চর্চা ও ইতিহাসাশ্রিত চরিত

'বঙ্গদর্শনে' বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধগুলিকে বঙ্কিম বিনীতভাবে 'কুলি মজুরের কাজ' বলে আখ্যাত করেন।[১] বাংলা ভাষায় তাঁর ইতিহাস সম্পর্কিত রচনাগুলির পূর্বে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'History of Bengal' (১৮৩৯) গ্রন্থের বিভিন্ন ভাগের অনুবাদ প্রচলিত ছিল।[২] মার্শম্যানের বই বা স্টুয়ার্টের History of Bengal (১৮১৩) গ্রন্থের প্রতি বঙ্কিম অপ্রসন্ন ছিলেন।[৩] এই অপ্রসন্নতার প্রধান কারণ তিনি বাংলার ইতিহাস অনুসন্ধান করে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন স্টুয়ার্ট ও মার্শম্যানের গ্রন্থে তার বিপরীত মন্তব্য দেখে অথবা সে প্রসঙ্গগুলির সম্পূর্ণ অনুল্লেখে ক্ষুব্ধ হন :

> "যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশে উদয়নাচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি সে দেশের ইতিহাস নাই।"[৪]

সেজন্যই বঙ্কিম জোর দিয়ে বলেছিলেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে ভরসা নাই।' 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'মিথ্যা' ইতিহাস ও 'প্রকৃত' ইতিহাস সম্পর্কে জোরালো অথচ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। বাংলার প্রকৃত ইতিহাস লিখতে গেলে কোন পথে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য তিনি তার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নৃতত্ব, সমাজতত্ব, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদান প্রভৃতির সম্যক্ বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের পর গুরুত্ব দিয়েছেন। আর ঐ সূত্রে বাংলার ইতিহাসে যাঁরা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দান রেখে গেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "কোন্ কোন্ কবি, কে কে দার্শনিক,—স্মার্ত, নৈয়ায়িক, জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন? তাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি?"[৫]

তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত জানবার ও জানাবার ইচ্ছা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের চতুর্দশ-ষোড়শ শতকের রেণেসাঁসের প্রতিরূপ বাংলাদেশে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকদ্বয়ে লক্ষ করেছিলেন :

"আজ পেত্রার্ক, কাল লুথর, আজ গেলিলিও, কাল বেকন, ইউরোপের এইরূপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইল। আমাদিগেরও একবার সেই দিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়; তারপর রূপ সনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। এদিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ, স্মৃতিতে রঘুনন্দন এবং তৎপরগামিগণ।...

আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে? ...এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল? ধর্মবেত্তা কে? শাস্ত্রবেত্তা কে? দর্শনবেত্তা কে? ন্যায়বেত্তা কে?...কাহার জীবন চরিত কি?"[৬]

শুধু রাজবৃত্ত নয়, 'কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকামাত্র' নয়, যাঁরা দেশের মানুষের মানসিক সম্পদ বৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক দৈন্য মোচন করেছেন তাঁদের 'জীবনবৃত্তান্ত' বা 'জীবন চরিত' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কৌতূহল প্রকাশ করেন।

ভারত-ও বঙ্গসংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনা ও অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছেন। অতীত ও বর্তমান উভয় যুগ সম্পর্কে বঙ্কিম-মানস কৌতূহলী। বৈদিক বিষয় বিচার, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার টীকা রচনা, কৃষ্ণচরিত্র-নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, সমকালীন বাংলার সাহিত্যিকদের সমালোচনাও বঙ্কিম করেছেন। ভারতের প্রাচীন, বাংলার মধ্যযুগ ও সমকালীন 'বঙ্গদেশীয় কৃষক' সবই বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনায় গৃহীত।

ইতিহাস ও জীবনবৃত্তান্ত উভয় ক্ষেত্রেই বঙ্কিমের দান স্মরণীয়। তাঁর সমকালীন ও ঈষৎ পরবর্তীকালে দুটি ধারাই গুরুত্ব লাভ করেছে। তবে মনে রাখতে হবে ঊনবিংশ শতকে ইতিহাস-চর্চার পিছনে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধই ছিল প্রবল। বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙালীর অতীতের জন্য গর্ব, বর্তমানের জন্য ক্ষোভ ও ভবিষ্যতের জন্য আশা ছিল। তাঁর ইতিহাস-চর্চায় যুক্তি, তথ্য, প্রমাণ, বিচার সবই প্রযুক্ত হয়েছে কিন্তু সর্বোপরি ছিল তাঁর জাতি-গর্বী মন।

১৮৬৭ সাল থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির প্রচেষ্টায়, নবগোপাল মিত্র রাজনারায়ণ বসুর সহযোগিতায় এবং বঙ্কিমচন্দ্রের যোগদানে 'চৈত্র মেলা' বা 'হিন্দুমেলা' জাতীয়তাবাদ সঞ্চারে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' উপন্যাস (১৮৬৯) ও হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' রচনা (১৮৬৯), রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয় গৌরব সঞ্চারিণী সভা' স্থাপন (১৮৬৬), নবগোপাল

মিত্রের 'ন্যাশনাল পেপার' প্রকাশ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত পুরুবিক্রম, সরোজিনী, অশ্রুমতী নাটক রচনা—সবই জাতীয়তাবাদের প্রকাশ। বিলাত-প্রত্যাগত আনন্দমোহন বসু ও সিভিল সার্ভিস থেকে পদচ্যুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জোরদার করেন। ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভা তারই ফল। সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রসভায় প্রদত্ত ভাষণগুলিতে ইতালির ঐক্যস্রষ্টা ও মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা ম্যাট্সিনি ও গ্যারীবল্ডির চরিত্র ও কর্মপদ্ধতিতে তুলে ধরেন (তবে স্মরণীয় যে সুরেন্দ্রনাথ সাহংস বিদ্রোহের বা বিপ্লবাত্মক পন্থার বিরোধী ছিলেন।)[৭] ম্যাট্সিনি, গ্যারীবল্ডির পূর্ণাঙ্গ জীবনী বাংলায় লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেন সুরেন্দ্রনাথের সহযোগী যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪)।[৮]
বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছেন :

> 'শ্রদ্ধেয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালাতেন।...তিনি ম্যাট্সিনি, গ্যারীবল্ডির জীবন আদর্শস্বরূপ ছাত্রদের সামনে রাখতেন। আত্মোৎসর্গের পথে স্বাধীনতা আনার জন্য যুব ও ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে পরামর্শ দিতেন। ১৯০৩ সালে অরবিন্দ কলিকাতায় বিপ্লবভাব-প্রচারক যোগেন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শ্যামপুকুরস্থ বাসভবনে এসে ওঠেন।'[৯]

যোগেন্দ্রনাথের সময়ে ম্যাট্সিনি বা গ্যারীবল্ডি ইতিহাসের 'বিষয়' হন নি, তাঁরা উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের বীরপুরুষ। তাঁদের 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত' ইতালিকে একটি বিদেশী শাসনমুক্ত স্বাধীন রাজ্যপাশে বাঁধবার চেষ্টা সফল হয়েছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বাধীনতাকামী সকল দেশই অন্যান্য দেশের ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করে। উনবিংশ শতকের বাংলা দেশের শেষ তিন দশক জাতীয়-গৌরব প্রতিষ্ঠার পর্ব। যোগেন্দ্রনাথ ইতালির 'জনগণঐক্যবিধায়ক' নায়কদ্বয়ের জীবনচরিত রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন, তার কারণ—

> "যে যে প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত মহাত্মাগণের নিরন্তর যত্নে ও অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের মোহিনী শক্তিতে দাসত্বপ্রপীড়িত জাতিসকল আত্ম ভুলিয়া জন্মভূমির চরণে আত্মবিসর্জন করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবিতমালা জাতীয় ভাষায় গ্রথিত করা আমার জীবনের একটি-প্রধান ব্রত।"[১০]

যোগেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন 'অধুনা শতধা বিচ্ছিন্ন বহুভাষা-কথনশীল ভিন্ন-ধর্মাক্রান্ত ভারত কালে একটি প্রকাণ্ড রাজনৈতিক জাতিরূপে পরিণত হইবে'— এ কল্পনা আর হেসে উড়িয়ে দেবার নয়, কেননা ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারীবল্‌ডি তাঁদের ইতালীয় ঐক্যের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন। 'জোসেফ গ্যারী-বলডির জীবনবৃত্ত' রচনার কারণ স্বরূপ লেখক জানিয়েছেন :

> "স্বদেশানুরাগে উদ্দীপিত দেশবাসিগণের প্রতি অত্যাচারে মর্মপীড়িত, সাধু সঙ্কল্পের জ্ঞানে দুষ্প্রধর্ষ—একটিমাত্র ব্যক্তিও ন্যায় ও প্রাকৃতিক স্বত্ব উদ্ধার করিবার জন্য বার বার উদ্দণ্ড হইলে, কি অসাধ্যই না সাধিত হইতে পারে—গ্যারীবল্‌ডির জীবনী তাহার দৃষ্টান্তস্থল"।[১১]

'গ্যারীবল্‌ডি পত্নী আনিটা'র জীবনবৃত্তান্ত যোগেন্দ্রনাথ রচনা করেন 'বীরাঙ্গনা' নামে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বীরনারী আনিটার দৃষ্টান্তে ভারতের রমণীকুল 'জাতীয় ব্রতে সেইরূপ জীবন আহুতি ও পাতিব্রত্য ধর্মের উদ্‌যাপনায় সেইরূপ আত্মবলি' দিতে পারবেন। স্বদেশের যুব ও ছাত্রদের মনে স্বাধীনতা-স্পৃহা ও আত্মবলি-দানের ভাবটিকে উদ্দীপ্ত করবার জন্য যোগেন্দ্রনাথ ম্যাট্‌সিনি গ্যারীবল্‌ডির চরিতেতিহাস বর্ণনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর 'জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত' (১৮৭৭) রচনার কারণ, দেশবাসীর মননে কঁৎ ও মিলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ অনুপ্রবেশ করিয়ে দেওয়া। বঙ্কিমচন্দ্র কঁৎ ও মিলের চিন্তার দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ কঁৎ ও মিলের ভাবাদর্শের প্রতি কতদূর শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়েছিলেন নিচে উৎকলিত অংশটিতে তার পরিচয় মিলবে :

> "মিল ও কম্‌ট—উনবিংশ শতাব্দীর দুই প্রদীপ্ত সূর্য—আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাস্রোতের নেতা।…বৃহস্পতি ও কপিলের ন্যায় ইঁহারা উভয়েই আমাদের আদরের ধন।…আমাদিগের বিশ্বাস, যদি কখন মানবজাতির উপকর্তাদিগের পূজা জগতে প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহা হইলে সেই দেব তালিকা হইতে কম্‌ট ও মিলের নাম কখনই পরিত্যক্ত হইবে না।"[১২]

ম্যাট্‌সিনি, গ্যারীবল্‌ডির সমগ্র জীবন নাটকীয় ঘটনায় পরিপূর্ণ। যোগেন্দ্রনাথ সেই পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর নাটকীয়তা পূর্বাপর তাঁর বর্ণনায় রক্ষা করেছেন। বিদেশীকে নিয়ে রচিত হলেও এগুলি আমাদের চরিত সাহিত্যে ইতিহাসাশ্রিত রাজনৈতিক জীবনী হিসাবে গ্রহণীয়। এই যুগে বাঙালী নেপোলিয়নের

শৌর্যে ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিল। শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবনচরিত' (১৮৬৯), বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ীর 'বীরকিশোরী নেপোলিয়ন বোনাপার্ট' (১৮৯৮) তারই সাক্ষ্য দেয়। বৃটিশ অধিকার থেকে নব্য আমেরিকার মুক্তিদাতা জর্জ ওয়াশিংটনও বাঙালীদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। বহু গ্রন্থের মধ্যে ঈশানচন্দ্র ঘোষের 'মহাপুরুষ চরিত বা জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থ (১৮৯৯) তার দৃষ্টান্ত। লেখকের 'জীবনবৃত্তান্ত' পদটি ব্যবহারে বোঝা যায় 'বীর'-চরিতের ক্ষেত্রে ইতিহাস ও চরিতের মিলন স্বাভাবিক। নেপোলিয়ন, ওয়াশিংটন বা ম্যাট্‌সিনি সকলেই বীর নায়ক। কার্‌লাইল যে 'Hero-worship and the Heroic in History'-এর কথা বলেছেন যোগেন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলিতে তার বিশেষ পরিচয় আছে। কার্‌লাইল (১৭৯৫-১৮৮১) তাঁর 'হিরো'দের (Hero) বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত করেছেন, মহম্মদ, দান্তে-সেক্সপীয়র, লুথার-নক্স, জনসন্-রুশো-বার্ণস্, ক্রমওয়েল-নেপোলিয়ন ইত্যাদি। তিনি ইতিহাসকে 'Biography of Great Men' বা 'essence of innumerable biographies' বলেছেন।

এই 'Great Men'রাই তাঁর কাছে 'Hero'। কার্‌লাইল ভাববাদী, (Idealist) অথবা বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিবর্তে জর্মান দার্শনিক ফিক্‌টের (১৭৬২-১৮১৪) 'Divine Idea' তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। ফিক্‌টের সিদ্ধান্ত—"The Divine Idea of the world that which lies at the bottom of Appearance' কার্‌লাইলকে প্রভাবিত করেছিল। এবং তাঁর মতে এক উদ্দেশ্যময় দৈবসত্তা মানবেতিহাসের মূল ভাগ্যবিধাতা, 'Hero' সেই সত্তার শক্তিসম্পন্ন, তাঁর কার্যনির্বাহক। ফিকটে 'Ego' বা 'অহং'কে 'পরম সত্য' বা 'ultimate reality' বলেছেন, কারলাইল তাকে রূপায়িত করেছেন।

যোগেন্দ্রনাথও লিখেছেন 'বড় বড় ঘটনা বড় বড় লোক প্রস্তুত করে' এবং "তাঁহারা কেবল সেই সর্বদ্রষ্টা ও সর্বনিয়ন্তা ভগবানের করযন্ত্র মাত্র। বিধাতা যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা তাহাই করাইয়া লন মাত্র। তাঁহারা সমকালীন ভাব ও ঘটনার স্রোতের মধ্যে আসিয়া এরূপ বিঘূর্ণিত হন যে তাঁহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি, সাহস ও প্রভাবের বীজ পরিপুষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।"

যোগেন্দ্রনাথ 'বীর পূজা' (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব, ১৯০০) গ্রন্থের নামকরণে কার্‌লাইলের দ্বারা প্রভাবিত হন। কার্‌লাইল সুলভ বর্ণনার

নাটকীয়তা ম্যাটসিনি গ্যারীবল্ডি ও আনিটার চরিত বর্ণনায় যথোপযুক্ত হয়েছে। 'বীরপূজা'র প্রথম পর্বে রামতনু লাহিড়ী ও রাজনারায়ণ বসু এবং দ্বিতীয়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত; প্যারীচরণ সরকার ও প্রসন্নকুমার অধিকারী; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সম্পর্কে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত স্মৃতিবহুল জীবনকথা সশ্রদ্ধভাবে বিবৃত করেছেন। নিজের অভিজ্ঞতা জড়িত বলে ঐ সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্রগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছে সত্যের দাবিও লঙ্ঘিত হয়নি।

বঙ্কিমের সমকালীন রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' (১ম-৫ম ভাগ ১৮৭৯-১৯০০) রচনা করেন। বঙ্কিম ঝান্সীর রাণীকে নিয়ে লিখতে চেয়েছিলেন। রজনীকান্তের সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস রচনায় সেই ত্রুটি ঘুচে গেল। এই গ্রন্থের রচনার পিছনে জাতীয়তাবাদী প্রেরণা সুস্পষ্ট। তাঁর 'আর্যকীর্তি' (১৮৮৩-৮৫) স্কুল-পাঠ্য রচনা। ছাত্রদের মনে স্বদেশগর্ব জাগ্রত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সম-উদ্দেশ্য প্রণোদিত তাঁর অপর রচনা 'বীরমহিমা' (১৮৮৬) গ্রন্থে 'যুদ্ধবীর-চরিত' পর্যায়ে, প্রতাপসিংহ, গোবিন্দ-সিংহ, শিবাজী, রণজিৎ সিংহ, কুমার সিংহ এবং 'নারীচরিত' পর্যায়ে, মীরাবাই, সংযুক্তা, দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাঈ-চরিত্র আলোচিত হয়েছে। রজনীকান্তের অপর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'প্রতিভা' গ্রন্থখানি (১৮৯৬)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই পাঁচজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত চরিত-প্রসঙ্গ তিনি রচনা করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ম্যাট্‌সিনির জীবনী লিখতে বলেছিলেন, কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ঐ কর্মে ব্রতী হওয়ায় তিনি আর অগ্রসর হন নি।

'আদর্শ' প্রচার করতে গেলে 'অ-সাধারণ মানুষ'কে গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ-সংস্কারের চেয়ে 'নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনর্জীবন' (Moral and Political Regeneration) বড়ো বলে মানতেন। সেজন্য তাঁর আদর্শ মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের 'ধর্মপ্রচার এবং ধর্মরাজ্য সংস্থাপন উদ্দেশ্য'।[১৩] ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে দেশপ্রেম প্রবল হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে তার প্রকাশ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র স্থাপন করলেন 'রাজসিংহ'কে রমেশচন্দ্র 'প্রতাপসিংহ' ও 'শিবাজী'কে। রমেশচন্দ্র 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ১৮৭৮) ও 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' (১৮৭৯) রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখেন:

"পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে এই অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি।"[১৪]

'প্রাচীন গৌরবের কথা' সেদিনকার ইতিহাস-চর্চায় বড়ো হয়ে উঠেছিল। 'জাতীয় বীর' বা 'National Hero'-র সন্ধানও চলছিল জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারের প্রয়োজনে। মুসলমান ও ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা সীতারাম, সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাশিম, তিতুমীর, লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত করে গেছেন তার প্রতিবাদের প্রয়োজন অনুভূত হল। এ বিষয়ে অগ্রণী হলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০)। তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা' (১৮৯৭), সীতারাম (১৮৯৮), মীরকাসিম (১৯০৬) তারই দৃষ্টান্ত। মেকলের ক্লাইভ ও হেস্‌টিংস সম্পর্কিত ধারণার প্রতিবাদ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। জীবনচরিতের মাধ্যমে ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেয়েছিলেন অক্ষয়কুমার, "ইতিহাস লিখিবার সময় আসে নাই বলিয়া, রাণী ভবানীর জীবনচরিত উপলক্ষ করিয়া ঐ সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করি।"[১৫] Historical Biography বা ইতিহাস-ভিত্তিক জীবনী রচনায় অক্ষয়কুমারের দক্ষতা ছিল। নিখিলনাথ রায় (১৮৬৫-১৯৩২), বিহারীলাল সরকার ঐ পন্থানুসরণের চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনা 'ঝান্সীর রাণী' এই পর্যায়ভুক্ত।[১৬] এই সূত্রে চণ্ডীচরণ সেনের (১৮৪৫-১৯০৬) 'ঝান্সীর রাণী'র (১৮৮৮) নাম করা যায়। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে বঙ্গভঙ্গ বা 'স্বদেশী' আন্দোলনের সময় (১৯০৫-০৮) পর্যন্ত নাটকে 'প্রতাপাদিত্য', 'নন্দকুমার' 'সিরাজদ্দৌলা' 'মীরকাসিম' 'শিবাজী' চরিত্রগুলিকে 'জাতীয় বীর' রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৮৯৫), 'মহারাজা প্রতাপাদিত্য' (১৮৯৬), 'মহারাজ নন্দকুমার চরিত' (১৮৯৯) প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রিত তথা জাতীয় ভাবোদ্দীপক জীবনী তার দৃষ্টান্ত। এই সূত্রে বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়:

"প্রতি রবিবারে দেশপ্রেমোদ্দীপক ভাব জাগানোর জন্য রাণা প্রতাপ, শিবাজী, রণজিৎ সিং, বাংলার চাঁদ রায় কেদার রায়, সীতারাম, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতির জীবনী পড়া হত।"[১৭]

শিবাজী উৎসবের প্রচলন মহারাষ্ট্রে করেন টিলক (১৮৫৬-১৯২০)। তিনি দেশগর্ব ও স্বাধীনতার আকাংক্ষা জাগ্রত করবার জন্য গণপতি-উৎসব (১৮৯৪), শিবাজী

উৎসব (১৮৯৭) ভবানী মায়ের পূজা প্রভৃতির প্রবর্তন করেন। টিলক নরম পন্থী ছিলেন না, চরমপন্থী ছিলেন, সেজন্য বাংলাদেশের বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে তাঁর মিল হয়ে গেল। কলিকাতায় শিবাজী উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী-উৎসব' কবিতাটি (১৩১১) কবি কর্তৃক পঠিত হয়।[১৮] রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫) মহারাষ্ট্রে অবস্থানকালে টিলকের এই আয়োজন প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বাংলা দেশে ফিরে এসে 'ভারতী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় বীর্যবান বাঙালী জাতি গঠনের আহ্বান জানাতে থাকেন। তাঁরই প্রয়াসে মহারাষ্ট্রের অনুকরণে বাংলাদেশে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' 'উদয়াদিত্য উৎসব', 'বীরাষ্টমী ব্রত' প্রভৃতির প্রচলন হয়।[১৯] কাজেই প্রতাপাদিত্য, শিবাজী প্রভৃতির জীবনী কাব্যে, নাট্যে, চরিতেতিহাসে কীর্তিত হবে এতো খুব স্বাভাবিক। ইতিহাসাশ্রিত জীবনী চরিত-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হওয়ায় কোনো বাধা নেই। তবে আমাদের আলোচ্য যুগের ভারতের বা বাংলার ইতিহাসে 'স্বদেশী' ভাবের মাত্রাপ্রাধান্য ঘটায় অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত ইতিহাস চাপা পড়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রবীন্দ্রনাথের ক্ষমতা ছিল 'ঐতিহাসিক চরিত' রচনায়। কিন্তু পরে সে পথে বঙ্কিমের ভাষায়—'সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমন বার্তা' শ্রুত হল না।

পাদটীকা

১. বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপন, ১৮৯২।

২. গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত অনুবাদ,'বাঙ্গালার ইতিহাস', দ্বিতীয় ভাগ,(১৮৪০)
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত অনুঃ, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', দ্বিতীয় ভাগ,(১৮৪৮)
রামগতি ন্যায়রত্ন কৃত অনুবাদ, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', প্রথম ভাগ, (১৮৫৯)
ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস', তৃতীয় ভাগ, (১৯০৩)

৩. "মার্শমান, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি। সে কেবল সাধ পূরণ মাত্র"—'বাঙ্গালার ইতিহাস', দ্বিতীয় ভাগ।

৪. তদেব।

৫. 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১২৮৭।

৬. তদেব।

৭. Banerjea, S. N., A Nation in Making, 'I lectured upon

Mazzini but took care to tell the young men to abjure his revolutionary ideas.'—p. 41.

৮. 'I persuaded Babu Jogendranath Vidyabhushan and Babu Rajanikanto Gupta, to translate into our language the life and works of Mazzini.'—p. 43.

৯. বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃঃ ১৮৬।

১০. জোসেফ ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী, মুখবন্ধ (১৮৭৯)।

১১. জোসেফ-গ্যারীবল্‌ডির জীবনবৃত্তান্ত, পূর্বভাগ, উদ্বোধনা, (১৮৯০)। এই সূত্রে জ্ঞাতব্য, ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে যোগেন্দ্রনাথ যে ছাত্রপাঠ্য 'প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা বা আত্মোৎসর্গ' (১৮৮৩) লেখেন তার মধ্যে বুদ্ধ, চৈতন্য, গুরুগোবিন্দের সঙ্গে ম্যাট্‌সিনি, গ্যারীবল্‌ডি, জর্জ ওয়াশিংটন প্রভৃতি ব্যক্তিদের জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়। তার কারণ "রামায়ণ, মহাভারত পাঠে যে ফল, এই মহাত্মাগণের চরিত্র পাঠেও সেই ফল।" যোগেন্দ্রনাথের অপর রচনা 'ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত' (১৮৮৬) এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

১২. 'জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত', সমাপ্তি অনুচ্ছেদ, ১৮৭৭।

১৩. কৃষ্ণচরিত্র, চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১৪. মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

১৫. আত্মকথা, বঙ্গভাষার লেখক, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত, ১৯০৪।

১৬. "ইংরাজী ইতিহাস হইতে আমরা রাজ্ঞীর এইটুকু জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল"—ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১২৮৪ ; গ্রন্থে সংকলন : 'ইতিহাস' (১৩৬২), বিশ্বভারতী।

১৭. বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃঃ ১৯১।

১৮. কবিতাটি প্রথমে সখারাম গণেশ দেউস্করের 'শিবাজীর দীক্ষা' (ভাদ্র, ১৩১১) পুস্তিকার অন্তর্গত হয়ে প্রকাশিত হয়। পরে বঙ্গদর্শনে (আশ্বিন, ১৩১১) মুদ্রিত হয়।

১৯. জীবনের ঝরাপাতা, সরলা দেবী চৌধুরাণী, পৃঃ ১২৭-১২৯ ; ১৪০-১৪১।

॥ চরিত সাহিত্যের ঐশ্বর্য যুগ ॥

(১৮৮১-১৯১৮)

বরণীয় প্রচেষ্টার স্বাক্ষর

'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে'র অষ্টম অধিবেশনে (চৈত্র ১৩২১) সাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন :

> "জীবনচরিতে দিন কতক বাঙ্গালীরা খুব পটুতা দেখাইয়াছিল। কতকগুলি জীবনচরিত বাস্তবিক মহামূল্য রত্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু আরও চাই। এখনও জীবনচরিত ঠিক জীবনচরিত হয় নাই। দুচারখানি জীবনচরিতে দেখিতে পাই, কেবল জীবনের ঘটনাগুলি পর পর সাজান আছে। কিন্তু তাকে জীবনচরিত বলে না। ঐ সাজান ঘটনাগুলির কার্যকারণ ভাবগুলি সব দেখাইতে হইবে। সমাজটি বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। ইতিহাস ভাল করিয়া জানা চাই। তবে ত ভাল জীবনচরিত হইবে। একজন মানুষের জীবনচরিত দেখাইতে গিয়া তিনি যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন তাঁহা দ্বারা সমাজের, সাহিত্যের, ব্যবসায়ের, বাণিজ্যের কত পরিবর্তন হইয়াছে—সেগুলি সব দেখান চাই। এইরূপ দেখাইবার চেষ্টা অনেকবার হইয়াছে, যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ও ধন্যবাদের পাত্র। মানুষ মরিলেই তাঁহার জীবনচরিত বাহির হওয়া অনেক সময় ঠিক নয়। কারণ মানুষ থাকিলেই তাহার সম্বন্ধে 'সুবিধা' 'কুবিধা' দুই থাকে। তাই মরিবার বিশ-ত্রিশ বৎসর পরে জীবনচরিত লিখিলে ভালো হয় কিন্তু তাহাতে আবার এক দোষ হয়। অনেক ঘটনা লোকে ভুলিয়া যায়। জীবনচরিত সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ই ভাগ্যবান। তবে পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার সময় এখনও আসে নাই।"—[১]

শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্য সকলেরই সমর্থনীয়। তিনি জীবনচরিত রচনার ক্ষেত্রে বাঙালীদের দিনকতক পটুতা লক্ষ করেছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকখানিকে তিনি 'মহামূল্য রত্ন' আখ্যা দিতে সম্মত। তবে কালগত দূরত্ব না থাকলে

যে 'পক্ষপাতশূন্য' জীবনচরিত লেখা যায় না—তিনি সেকথা বুঝেছিলেন। আমরা লক্ষ করেছি ১৮৮০ সালের পর থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে জীবনী রচনায় যেন একটা বন্যা এসেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর সে বন্যার বেগ আর তেমন অনুভূত হয় না। ১৮৮০ সালের পর থেকে রচিত উল্লেখযোগ্য চরিত-গ্রন্থের একটি নির্বাচিত তালিকা দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়' (প্র. সং ১৮৮১, দ্বি. সং ১৮৮৫), প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen (প্র. স. ১৮৮৭, দ্বি. সং ১৮৯১), উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের 'আচার্য কেশবচন্দ্র' (তিন খণ্ড, ১৮৯১-৯৬), চিরঞ্জীব শর্মার 'কেশবচরিত' (প্র-সং ১৮৮৫, দ্বি. সং ১৮৯৭), শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' (১৮৯১), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' (১৮৯৫), বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর (১৮ ৫), মহেন্দ্রনাথ রায়ের 'বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত (১৮৮৫), নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের 'অক্ষয়চরিত' or An Illustrated life of Late Babu Aksay Kumar Datta (১৮৮৭), যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৬), নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' (১৯২০), তারাধন ভট্টাচার্যের 'তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী' (১৮৯৩) শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী (১৮৯৩), দীনবন্ধু সান্যালের ·Life of the H. J. Dwaraka Nath Mitter (১৮৮৩), কালীপ্রসন্ন দত্তের 'দ্বারকানাথ মিত্র' (১৮৯২), বঙ্কুবিহারী করের 'মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী' (প্র-সং ১৯১০, দ্বি-সং ১৯২১), জগদ্বন্ধু মৈত্রের 'প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী' (১৯১১), দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'আদর্শ চরিত কৃষ্ণমোহন' (১৮৮৬), রামচন্দ্র ঘোষের 'A Biographical Sketch of the Rev. K. M. Banerjea (১৮৯৩), রামগোপাল সান্যালের 'General Biography of Bengal Celebrities, both Living and Dead' (১৮৮৯), Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India. Both official and non-official for the last one hundred years' Part I, (১৮৯৪), 'হিন্দু পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী' (১৮৮৭), রামচন্দ্র দত্তের 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী' (১৮৯০), সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ' (১৯০৫), রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রেমচাঁদ তর্ক-

বাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী' (১৮৯২), হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০৪), শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৩), অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী' (১৯১৩), কুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 'ভূদেবচরিত' (প্রথম ভাগ ১৯১৭, দ্বিতীয় ভাগ ১৯২৩) প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

এই তালিকা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হবে ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশে কত যুগন্ধর পুরুষের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। মধ্যযুগের বাংলাদেশে চৈতন্যদেবকে বাদ দিলে 'বড়ো প্রাণেব' মানুষ বিশেষ দেখা যায় না। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রভৃতি রাজাদের কথা জানা গেছে বাঙালী ঐতিহাসিক তথা দেশপ্রেমিকদের চেষ্টায় মাত্র ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্বে এসে। এই রেনেসাঁসের যুগে, পাশ্চাত্যেব বস্তুজগত ও ভাবলোকের সংঘাতে যখন ইহলোক, মর্তামানুষ, তাব ভালো-মন্দ মিশ্রিত জীবন যুগপৎ কৌতূহল ও শ্রদ্ধাব বিষয় হয়ে উঠল, ইতিহাস-চর্চা, সংবাদপত্র-সেবা, বাজনীতি-আলোচনা প্রভৃতি বিষয় নব্য শিক্ষিতদের কর্মে ও চিন্তায় স্থান পেল—তখন চরিত-সাহিত্যের নতুন করে প্রতিষ্ঠা হতে লাগল। প্রকৃত অনুবাগ ও হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভিন্ন কোনোকালেই চরিতসাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না। যথার্থ শ্রদ্ধা করবার মতো, অনুরক্ত হবার মতো, অসংখ্য চরিত্র বাংলা দেশে ঊনবিংশ শতকের আকাশে নিজেদের অনন্যস্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে নক্ষত্রের মত জ্বলে উঠলেন। মানুষকে 'মানুষ' হিসাবে দেখা, শ্রদ্ধা করা, 'অবতার' বলে নয়, 'মানুষ'রূপে শ্রদ্ধা করবার বা 'বীর পূজা'র দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্যের দর্শন ও রাজনৈতিক সাহিত্য থেকে আমরা লাভ করেছিলাম। এই সব 'বড়ো প্রাণে'র মানুষদের জীবনকথা অবগত হলে চরিত্রগঠন ভালো হবে, নরকল্যাণ হবে, সমাজের মঙ্গল হবে এই 'utility'-র ধারণা অবশ্যই তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমাদের এ যুগের চরিতসাহিত্য পাশ্চাত্য চরিতসাহিত্যের অনুসরণে গড়ে উঠেছে, প্রসঙ্গ ও প্রকরণ উভয় ক্ষেত্রেই তার প্রভাব লক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক।

প্রধানতঃ স্মৃতিরক্ষণ, স্মৃতি-তর্পণ বা গুণকীর্তন-প্রয়াস চরিত-প্রবন্ধ, বা জীবনচরিত রচনার মূল উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হতে দেখা যায় এবং স্বীকার্য যে মৃত্যুই এর 'নিমিত্তকারণ'। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্ন ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে জাত, আপন ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই পরলোকগমন

করেন বিংশ শতক আরম্ভ হবার পূর্বে। আলোচ্য পর্বের (১৮৮১-১৯১৮) চরিত-লেখকেরা কোন্ কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁদের বর্ণনীয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের দেখেছিলেন এবং গ্রন্থরচনায় কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, মোটামুটি ভাবে সেইটি নির্ধারণ করা আমাদের কর্তব্য হবে। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যখন প্রথম রামমোহনের জীবনী লেখেন (প্র-সং ১৮৮১, ১৬১ পৃঃ) তার 'বিজ্ঞাপনে' জানিয়েছিলেন, 'একাল পর্যন্ত পুস্তক বা পত্রিকাদিতে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশ হইয়াছে এবং প্রাচীন ব্যক্তিগণ ও তাঁহার আত্মীয়দিগের নিকট হইতে যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে' সেগুলি 'সঙ্কলিত' হয়েছে। তৃতীয় বারের 'বিজ্ঞাপনে' (১৮৯৬) দেখা যায় শুধু তথ্যসংকলন নয়, 'কি ধর্মবিষয়ক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, সকল বিষয়ে রাজার মতামত যথাসাধ্য ব্যাখ্যা" কবার প্রয়াস রয়েছে। তা ছাড়া "রাজার কোন কোন অমূলক অপবাদ খণ্ডনে"র চেষ্টা করা হয়েছে।

অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথম 'স্বদেশীয় গ্রন্থকারগণ'কে সম্বোধন করে রামমোহনের 'একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত সঙ্কলন' দ্বারা 'তাঁহার ঋণের লক্ষাংশের একাংশ পরিশোধ' কবার আহ্বান জানান।[২] রাজনারায়ণ বসু শারীরিক কারণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় নগেন্দ্রনাথ এই কার্যে অগ্রসর হন।

রামমোহন রায়ের জ্ঞাতি, মহেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনী'র 'বিজ্ঞাপনে' জানান, "স্বদেশজাত অসামান্য ব্যক্তিগণেব জীবন বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইতে অনেকেই ঔৎসুক্য ও আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইজন্য বহুদিবস হইতে স্বদেশীয় মহাত্মাবর্গের জীবনবৃত্ত সঙ্কলন করিতে আমার বাসনা জন্মে"।

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস তাঁর 'অক্ষয়চরিত' গ্রন্থে 'পূর্বাভাষে' লিখেছেন, "লোকে যত উন্নতির সোপানে আরোহন করিতে থাকিবে, ততই স্ব স্ব দেশের চিরস্মরণীয় মহাত্মাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে শিক্ষা করিবে ও তাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত পাঠে বিশেষ শিক্ষা পাইবে এই বিবেচনায় মহানুভব অক্ষয়কুমার দত্তের এই ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশিত হইল।"

রামচন্দ্র ঘোষ ইংরেজি ভাষায় রচিত তাঁর কৃষ্ণমোহনের 'Biographical sketch' গ্রন্থের 'Preface' অংশে উল্লেখ করেছেন, "As the history of such a man is at all times a *delightful and profitable reading*, it is hoped that it will be read by all classes of men, natives

and European. দুর্গাদাস লাহিড়ী তাঁর 'কৃষ্ণমোহনে'র প্রারম্ভে লিখেছেন, "বাংলা সাহিত্যে কিন্তু এই হিতকামী জীবনীর সম্পূর্ণ অভাব। এ অভাবের প্রধান কারণ বাঙ্গালী এখনও জীবনীর প্রকৃত হিতকারী মর্ম বুঝেন নাই।"

রামগোপাল সান্যাল ইংরেজিতে 'Life of K. D. Pal' (১৮৮৬) এবং বাংলায় 'কৃষ্ণদাস পালের জীবনী' (১৮৯০) লেখেন। 'ভূমিকা'য় লেখক তাঁর উদ্দেশ্য বিবৃত করেন, "কৃষ্ণদাস কিরূপে পবিত্র হিন্দুধর্ম রক্ষা করিয়া হিন্দুসমাজের বরণীয় হইয়াছিলেন, প্রধানতঃ তাহাই দেখানো" তাঁর উদ্দেশ্য এবং আশা ছিল তাঁব বর্ণিত চরিত্র "হিন্দু সমাজে গৌরবের বিষয় হইয়া থাকিবে"।

রামগোপাল 'হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী'র (১৮৮৭) ভূমিকায়, "বঙ্গেব শিরোভূষণ যে মনস্বী পুরুষ আপনার অসাধারণ প্রতিভায় ও অপূর্ব দেশ হিতৈষণায় সর্ব সাধারণেব শ্রদ্ধা ও প্রীতিব পুষ্পাঞ্জলি" লাভ করেছিলেন তাঁব বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কথা ঘোষণা করেন।

বাংলা দেশে পজিটিভিস্ট-চিন্তার অগ্রনায়ক ছিলেন দ্বারকানাথ মিত্র। (১৮৩২-৭৪)।[৩] তাঁর মৃত্যুর পর দীনবন্ধু সান্যাল ইংরেজিতে তাঁর জীবনী লেখেন (১৮৮৩)। কালীপ্রসন্ন দত্ত বাংলায় 'বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রেব জীবনী' রচনা করেন ১৮৯২ সালে। তার আখ্যাপত্রে কার্লাইলের নিম্নলিখিত উক্তিটি উৎকলিত হয়েছে ;

> "Biography is by nature the most *universally profitable universally pleasant* of all things, especially biography of distinguished individuals."

কালীপ্রসন্ন ঘোষের (১৮৪৪-১৯১০) 'প্রভাতচিন্তা' (১৮৭৭) গ্রন্থের 'মনুষ্যেব জীবনচরিত' প্রবন্ধ থেকেও একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন লেখক, "জীবনচরিত ব্যক্তি-বিশেষের ইতিহাস। ইহা পাঠ দ্বারা উৎসাহ, উপদেশ ও শিক্ষা—এই ত্রিবিধ ফল লাভ হয়।" এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে "সকল শ্রেণীস্থ লোকেই তাঁহার জীবনী হইতে কিছু না কিছু শিক্ষালাভ করিতে পারেন।"

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 'Life and Teachings of K. C. Sen (2nd Edition, 1891) গ্রন্থের 'Preface-এ জানিয়েছেন, "I have tried to write his biography in his own spirit—"The lights and shadows of my humble picture ***will bring out his noble character*** in

simpler and more natural proportions than any amount of mere wild unthinking praise." আবার চিরঞ্জীব শর্মা 'কেশব চরিতে'র সূচনায় লেখেন, "সাময়িক অসার অনিত্য ঘটনাপুঞ্জের ভিতর দিয়া শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দের জীবন প্রবাহ যে দিকে দিবানিশি প্রধাবিত হইত, কোন প্রতিবন্ধক মানিত না সেই পথ অনুসরণপূর্বক আমি তাঁহার মহচ্চরিত্র বর্ণনে প্রয়াস পাইয়াছি।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একখানি জীবনচরিত (১৯১৪) লিখেছিলেন ভবসিন্ধু দত্ত। 'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশে তিনি এই আকাংক্ষা প্রকাশ করেছেন যে, "এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যদি একজনেরও প্রাণে ভগবদ্‌লাভের পিপাসা জাগ্রত হয় অথবা একজনও সেই অমৃতবস্তুর সন্ধানে গভীররূপে আত্মার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া বর্তমান বহির্মুখীন মানবসমাজে সেই অসীম সম্পদের বার্তা প্রচার করেন তাহা হইলে আমার সকল শ্রম ও সকল চেষ্টা সার্থক হইবে।" অজিত-কুমার চক্রবর্তী মহর্ষির শ্রেষ্ঠ জীবনীকার। তিনি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিতের (১৯১৬) শেষে নিবেদন করেছেন, "তিনি আমাদের এই সমাজকে, এই দেশকে তাঁহার জ্ঞান ও ভক্তির সাধনার দ্বারা ও মহৎ জীবনের দ্বারা বিশ্বসমাজ ও বিশ্বমানবের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই কথাটি আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গ যদি সকৃতজ্ঞভাবে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদন করেন, তবেই এই চরিত রচনা সার্থক হইবে।"

বিদ্যাসাগরের জীবনী আলোচনায় চণ্ডীচরণ 'ভূমিকা'য় (১৮৯৫) জ্ঞাপন করেছেন, "ভক্তিভরে তাঁহার পূজা করিব। সেই পূজার আয়োজনেই এই জীবন-চরিতের সূচনা," অন্যদিকে অপর বিদ্যাসাগর-চরিতকার বিহারীলাল সরকার 'অবতরণিকা' অংশে এমারসন্, কার্লাইল ও বস্‌ওয়েলের উক্তি উদ্‌ধৃত করেছেন। কার্লাইলের উক্তি :

> "Not only in the common speech of men, but in all arts too, which is or should be concentrated and conserved essence of what men speak and show—Biography is almost the one thing needful."

জীবনচরিতের 'নৈতিক সারের' পর জোর দিয়েছিলেন বিহারীলাল। বিদ্যাসাগরের সমালোচনায় বলেছেন, "যে ভ্রমত্রুটির ভ্রমাত্মক অনুকরণে হিন্দু-সন্তানের মহতী ক্ষতি তাহা প্রদর্শন না করিলে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে।"

'ভূমিকা' 'বিজ্ঞাপন' 'নিবেদন' 'প্রস্তাবনা' 'অবতরণিকা' 'পূর্বাভাষ' প্রভৃতি থেকে লেখক কি উদ্দেশ্যে ও কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর বর্ণনীয় বিশিষ্ট নর বা নারীর জীবনচরিত লিখছেন বা জীবনালেখ্য অঙ্কন করছেন তার ইঙ্গিত মেলে। পূর্বের উৎকলিত অংশগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বর্ণিত ব্যক্তিদের চরিত্র গৌরব প্রকাশ এবং তার দ্বারা নৈতিক শিক্ষাদান এই দুটি দিকই মুখ্য ছিল। সামাজিক-শিক্ষার কথাও অনেকে বলেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম-সমাজে 'মহর্ষি' ও 'ব্রহ্মানন্দ' রূপে পরিচিত। তাঁদের উভয়ের জীবন-তটিনীর চরম গতি ব্রহ্ম-সমুদ্র বলে জীবনীকারেরা জানিয়েছেন। কাজেই তাঁদের জীবনের শিক্ষা মূলতঃ অধ্যাত্ম-শিক্ষা। রামগোপাল, হরিশ, কৃষ্ণদাস পাল অথবা বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্ত রাজনৈতিক বা সামাজিক দ্বন্দ্বে ও সংঘাতে বৈচিত্র্যময় পূর্বের অধ্যায়গুলির আলোচনায় দেখাবার প্রয়াস করা হয়েছে যে প্লুটার্ক, জনসন্, বস্ওয়েল, কার্লাইল ও এমার্সনের চরিত-চিন্তার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর পরিচয় সাধিত হয়েছিল এবং ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় রচিত জীবনী গ্রন্থগুলিতে সেই চিন্তার স্বাক্ষর বিদ্যমান। জীবনী গ্রন্থগুলির শিক্ষাপ্রদ বা নৈতিক মূল্যের ('useful and moral purpose') দিকটি চরিতকারদের মধ্যে প্লুটার্ক থেকে সিডনি লী (১৮৫৯ ১৯২৬) পর্যন্ত অনিবার্য লেখক স্বীকার করে নিয়েছেন।

আলোচ্য জীবনচরিত গুলির মধ্যে দেখি 'Life and Letters', 'Life and Works','Life and Times','Two volume Biography' সব রীতির সমাহার ঘটে গেছে। 'অবজেক্টিভ' বা তথ্যপ্রধান (Informative) জীবনীর দিকটার চর্চা স্বভাবতঃ বেশি হয়েছে। বর্ণনীয় ব্যক্তির নিজের লিখিত চিঠিপত্র টুকরো গল্প, মুখের কথা, উইল, দিনলিপি এবং অপরের ডায়েরি, স্মৃতিকথা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সহায়তা অধিকাংশ গ্রন্থে নেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি ভিক্টোরিয়ান্ পর্বে দুই-ভল্যুম জীবনীর প্রচলন বৃদ্ধি পায়। বাংলা সাহিত্যে দুই-ভল্যুম জীবনীর সংখ্যা বেশি নয়, তবে অধিকাংশ গ্রন্থেই পূর্বোক্ত উপাদান ও উপকরণ ব্যবহৃত। কার্লাইল এ পর্যায়ের রচনার নাম দিয়েছিলেন 'compilation, not composition' ভিক্টোরিয়ান্ যুগে 'পিউরিটান' মনোভাব বেড়েছিল ইংরেজি ও বাংলা চরিত-সাহিত্যে। কার্লাইলের প্রভাব উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উভয় দেশের সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বস্‌ওয়েলের 'Life of S. Johnson' গ্রন্থের সমালোচনায় কার্‌লাইল লিখেছিলেন, যে যেহেতু 'Man is perennially interesting to man' সেজন্য বিশেষ-বিশেষ মানুষের অন্তর্‌-বাহির জানতে পারার চেয়ে ভালো লাগার বিষয় আর কিছু নেই। প্রত্যেকেই জানতে ইচ্ছা করেন সেই বিশেষ মানুষটি কোন্ গুণান্বিত ছিলেন, এবং কি ধরণের সমাজ ও ঘটনার মধ্যে থেকে তিনি কী শক্তিবলে নিজের কাজ করে গেছেন।[8] সেই 'বিশেষ' মানুষ কোনো একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন না। তাই কর্মী, কবি, ভক্ত, সংস্কারক—সকলের জীবনচরিত এক ধরণের (pattern) হওয়া উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে রথচাইল্‌ড ও যীশুখ্রীষ্টের জীবনকে এক মাপকাঠিতে পরিমাপের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর কাছে একজন হলেন পার্থিব সম্পদে ধনী, অপরজন আত্মিক সম্পদে। অধ্যাপক হেন্‌রি মর্‌লি (১৮২২-৯৪) 'Life of Gladstone' গ্রন্থের সূচনায় লিখেছেন কবি বা সাহিত্যিকের জীবনী লেখায় সামাজিক ও রাজনৈতিক তথ্যবহুলতার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু 'where the subject is a man who was four times at the head of the government—no phantom, but dictator how can we tell the story of his works and days without reference and ample reference."

রামমোহন, কৃষ্ণমোহন, ইয়ংবেঙ্গল দল, অথবা বিদ্যাসাগর, ভূদেব, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ একের থেকে অপরে নিজ নিজ ক্ষেত্রে ও ব্যক্তিত্বে কত পৃথক। সেজন্য ঐতিহাসিক পটভূমিটিকে বর্ণনীয় ব্যক্তির জীবনের পশ্চাদ্‌পটে রাখার প্রয়োজন হয়। না হলে চরিত্র-চিত্রটি সুস্পষ্ট হয় না। যাঁরা ভক্ত বা সাধক তাঁদের আত্মিক (spiritual) দিকটি বা 'soul's journey' আত্মজীবনীর সহায়তায় কিছুটা ধরা যায় মাত্র। দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী', কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদ' বা 'শ্রীম' সংকলিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থের কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের শুধু জীবনবৃত্তান্ত লেখেননি, "ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার উপদেশ ও মতামত" লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে নগেন্দ্রনাথের গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের (১৮৯৬) কথাই উল্লেখ করা হল। এই সংস্করণ প্রণয়ন কালে তিনি মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের অকৃপণ সহায়তা লাভ করেন এবং তার ফলে রামমোহনের বিশ্বের

বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত ধারণা ও সিদ্ধান্তের অতি প্রাঞ্জল পরিচয় লাভ করা যায়। রামমোহনের (১৭৭৪-১৮৩৩) স্থায়ীভাবে কলিকাতা বাস (১৮১৫) থেকে ইংলণ্ড যাত্রা (১৮৩০) এই পনের বছরের ইতিহাস, তাঁর মতাদর্শের বিপক্ষীয়দের সঙ্গে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা—অর্থাৎ প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে . অক্লান্ত বীরোচিত সংগ্রামের ইতিহাস। উগ্র খ্রীষ্টান পাদ্রি, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ, প্রাচ্য ভাষায় শিক্ষাদানকামী গোষ্ঠী, কোম্পানীর শাসক সকলের বিরুদ্ধেই তিনি 'বিচারে' ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং জয়লাভ করেছেন। হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার,সতীদাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর উদার মত লক্ষণীয়। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, রিফর্ম বিল প্রভৃতির জন্য আন্দোলন, বেন্থাম, রস্কোর মতের সমর্থন, দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা লাভে আনন্দ প্রভৃতি তথ্য প্রমাণ করে তিনি তাঁর যুগের দিক থেকে কত বেশি অগ্রগামী ছিলেন। রামমোহনের 'একেশ্বরবাদ' ঘোষণা খ্রীষ্টীয়, ইসলামী ও ঔপনিষদিক শাস্ত্রচর্চার সম্মিলিত ফল।

রামমোহনের জীবনী রচনায় নগেন্দ্রনাথ 'পূর্বপুরুষ, মাতা পিতা ও বাল্যকাল' অধ্যায় মাত্র তেইশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করে তাঁর কলিকাতা-বাস থেকে ইংলণ্ড-যাত্রা অংশে চারশো পৃষ্ঠা সংগত কারণেই ব্যয় করেছেন। তাঁর বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের বিস্তৃত পরিচয় নগেন্দ্রনাথ যথাসাধ্য দিয়েছেন, ধর্মবিষয়ক মতামতও বিশ্লেষণ করেছেন। 'পরিশিষ্ট' অংশে বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতিকথার সঙ্গে 'বংশতালিকা' ও নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প'[৫] বা 'anecdotes' জুড়ে দিয়েছেন। নগেন্দ্রনাথের পূর্বে কিশোরীচাঁদ মিত্রের ক্যালকাটা রেভিউ পত্রিকায় (ডিসেম্বর, ১৮৪৫) ল্যাণ্ট কার্পেণ্টারের রামমোহন সম্পর্কিত গ্রন্থের এবং কুমারী কার্পেণ্টারের 'The Last Days in England of Rajah Rammohun Roy' গ্রন্থের সমালোচনা মূলক (১৮৬৭) দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ বার হয়। কিশোরীচাঁদের প্রবন্ধ দুটি ও কুমারী কার্পেণ্টারের গ্রন্থের এবং অন্যান্য প্রকাশিত প্রবন্ধের সহায়তা নগেন্দ্রনাথ নিয়েছেন। কুমারী কলেটের 'The Life and Letters of Raja Rammohun Roy' ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয়। কলেট নগেন্দ্রনাথের গ্রন্থ থেকে অনেক বিষয় গ্রহণ করেছেন। নগেন্দ্রনাথের গ্রন্থই রামমোহন সম্পর্কে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। তিনি তাঁর গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' জানিয়েছেন যে 'পূর্ব পূর্ব সংস্করণে রাজার কোন কোন

অমূলক অপবাদ খণ্ডনের চেষ্টা' করা হয়েছিল কিন্তু উক্ত সংস্করণে সেগুলি বর্জিত হয়। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন 'মহাত্মা মার্টিন লুথারের পবিত্র চরিত্রে তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণ কলঙ্কারোপ করিতে নিরস্ত হয় নাই'। নগেন্দ্রনাথ লুথারের সঙ্গে নানা ক্ষেত্রে রামমোহনের তুলনা করেছেন। কার্লাইল 'লুথার'কে 'Hero as Priest' পর্যায়ে ফেলেছেন। নগেন্দ্রনাথ রামমোহনকে তাঁর 'Hero' বা 'Great man' রূপে গ্রহণ করেছেন। কার্লাইলের মতে, "The history of mankind is the history of its great men ; to find out these *clean the dirt from them* and place them on their proper pedestal". নগেন্দ্রনাথ এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে রামমোহন সম্পর্কে উত্থাপিত নানা অভিযোগ খণ্ডনের ও সংশয় নিরসনের চেষ্টা করেছেন।

তিনি রামমোহনের সর্বাঙ্গীন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস করেছেন। তাঁর জীবিতকালে তিনি যে কর্মে ও চিন্তায় সমকালীন ভারতবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং বিশ্বজনীনতার আদর্শ বহন করেছিলেন, এ কথা অস্বীকার কবা অন্যায়। নগেন্দ্রনাথ রাজার সমসাময়িক ইতিহাসকে বিস্মৃত হননি, গ্রন্থরচনা কালে রামমোহন সম্পর্কীয় তাঁর পক্ষে সংগৃহীতব্য সকল উপাদান তিনি ব্যবহার করেছেন। রামমোহন কর্তৃক লিখিত বলে প্রচারিত ও 'এথেনিয়ম' পত্রে প্রথম প্রকাশিত 'আত্মজীবনী মূলক' পত্রখানিকে কুমারী কলেটের পূর্বে কেউ, এমন কি কিশোরীচাঁদও 'জাল' বলেননি। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগন্মোহনের পত্নীর সহমবণ গমনের ও তাঁর প্রতি নির্দয় ব্যবহারের দৃশ্য দেখে রামমোহন সতীদাহ নিবারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন, এই তথ্য নগেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন রাজনারায়ণ বসুব একটি স্মৃতি-ভাষণ থেকে।[৬] তিনি সেটি শুনেছিলেন রামমোহন-শিষ্য তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসু মহাশয়ের কাছে। নগেন্দ্রনাথ এই ধরণের বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে পুনর্বিচার করেননি। না করুন, তাঁর গ্রন্থ 'work of art' না হোক, তবু 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়' বাংলা চরিত সাহিত্যে তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থরূপে উচ্চস্থান অধিকারক্ষম।

কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) পরলোকগমনের পর যে জীবনীগুলি উনবিংশ শতকের শেষে রচিত হয় তার মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ ও চিরঞ্জীব শর্মার গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা তিনজনই কেশবচন্দ্রের অনুরাগী ভক্ত, নববিধান সমাজভুক্ত। 'আদি ব্রাহ্ম-সমাজে'র পক্ষে

অজিতকুমার চক্রবর্তী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মত ও পথের বিরোধ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি সর্বতোভাবে দেবেন্দ্রনাথকে সমর্থন করেছেন। অন্যদিকে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে'র নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'History of the Brahmo Samaj', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র', 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' প্রভৃতি গ্রন্থে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের মিল ও অমিলের কারণ দেখিয়েছেন। 'নববিধান'-ভুক্ত এবং কেশবের বন্ধু, আত্মীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থে কেশবচন্দ্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি থাকলেও স্তব-স্তুতিতে পর্যবসিত হয়নি। তাঁর 'Life and Teachings of K. C. Sen', চরিত-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। জনসন্ জীবনী ('Life') রচনায় 'personal knowledge'-এর পর জোর দিয়েছিলেন। প্রতাপচন্দ্র কেশবচন্দ্রের বাল্য থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিত্যসঙ্গী। সেদিক থেকে তিনি কেশব-জীবনী রচনার যথার্থ অধিকারী। তিনি তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের preface-এ বস্‌ওয়েল ঘোষিত 'lights and shadows of my humble picture' রীতি উল্লেখ করেছেন এবং বিশ্বস্ত অনুগামী হলেও কোনো ক্ষেত্রেই তিনি অন্ধ-সমর্থন জানান নি। প্রথম সংস্করণের preface এ তিনি লিখেছেন যে কেশবচন্দ্র সম্পর্কে অসত্য উক্তিগুলি নিশ্চয়ই সত্যের আলোকে দূরীভূত হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দু একটি কালো দাগ যদি থেকেই যায়, তাহলেও 'his humanity shall be all the more *real* for that'। এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রতাপচন্দ্রের গ্রন্থ প্রশংসার্হ। তিনি স্তুতি অর্থাৎ 'unmitigated deification' এবং অন্ধ বিদ্বেষ বা 'unmerited vilification' উভয়েরই বিরোধী। বাল্য থেকেই তিনি কেশবচন্দ্রকে 'great man' করে গড়েননি। তিনি যে বিখ্যাত ধনী ও সম্ভ্রান্ত রামকমল সেনের পৌত্র, বাল্যে সে চেতনা তাঁর এত তীব্র ছিল যে তিনি কাউকে ঠিক 'বন্ধু' করতে চাইতেন না, বেশ 'বাবু'টি ছিলেন, লোকের পিছনে লাগতেন, যে-কোনো কৌশলে প্রতি-পক্ষকে জব্দ করতেন। তাস খেলা, হ্যামলেটের দৃশ্য ও 'বিধবা বিবাহ নাটক' অভিনয়, যাত্রাগান শোনা, বৈষ্ণব সংকীর্তনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন, পরীক্ষার হলে অপরের খাতার সঙ্গে উত্তর মেলানো এবং সেই অপরাধে শাস্তি লাভ— কেশব জীবনের প্রথম পর্বের এ সব ঘটনা বর্ণনার ফলে কেশবের চরিত্র 'জীবন্ত' হয়েছে। কেশবচন্দ্রের জীবনের 'দ্বিতীয় পর্ব' তাঁর ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ, নিজের পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ (১৮৫৮) থেকে

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিচ্ছেদ (১৮৬৬) পর্যন্ত পর্বের আলোচনায় প্রতাপচন্দ্র দেখিয়েছেন যে কেশবের ধর্মবোধের মূলে ছিল পার্কার, কব, হ্যামিলটন প্রভৃতির রচনার প্রভাব। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে কেশবের জ্বলন্ত উৎসাহ, একদিকে ফ্রান্সিস উইলিয়ম নিউম্যানের সঙ্গে পত্রালাপ অন্যদিকে ডাইসন প্রমুখ খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে ঘোর বিতর্ক—সবই প্রতাপচন্দ্র সততার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের চূড়ান্ত বিচ্ছেদের সময় প্রতাপচন্দ্র কেশবচন্দ্রের সহযোগী রূপে দেবেন্দ্রনাথের কোনো কোনো কার্যের তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের জীবনী রচনাকালে তিনি এ-প্রসঙ্গে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। লক্ষ করবার বিষয়, মুঙ্গেরে কেশব ভক্তদের খ্রীষ্টকে নিয়ে বাড়াবাড়ি, 'কপোত' দর্শন, কেশবের পদযুগল ধরে ক্রন্দন, 'প্রভু' 'ত্রাণকর্তা' রূপে তাঁকে সম্বোধন—প্রভৃতি ঘটনায় শুধু দেবেন্দ্রনাথ নন, তরুণ দলের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যদুনাথ চক্রবর্তী পর্যন্ত তীব্র প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে প্রতাপচন্দ্র কেশবচন্দ্রের জনৈক বন্ধুর কাছে লেখা একখানি চিঠি ব্যবহার করেছেন। ঐ চিঠিতে কেশব জানিয়েছিলেন যে মানুষের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ ব্রাহ্মধর্ম বিরোধী। তবে 'I have no right to interfere with the freedom of others'। এখানেই প্রতাপচন্দ্র দেখেছেন কেশবচন্দ্রের দুর্বলতা। এই মুঙ্গেরী-ভাবই ('Semi-supernaturalism') যে কেশবচন্দ্রের প্রবর্তিত ধর্মমতে শেষে অতি প্রবল হয়ে উঠেছিল প্রতাপচন্দ্র তার উল্লেখ করেছেন। কেশবচন্দ্রকে যাঁরা শুধু ভক্তির পাত্র নয়, পরমপূজ্য বলে মনে করতেন তাঁদের প্রতিই যে কেশবচন্দ্র বিশেষভাবে প্রসন্ন ছিলেন এবং তাঁর তরুণ সমালোচকদের 'infidel' মনে করতেন সে কথা জানাতে তিনি দ্বিধা করেন নি। এ ছাড়া এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যেখানে কেশব ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে তাঁর অনুগামীদের আদেশ দিয়েছিলেন একজন 'সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ'ভুক্ত ব্যক্তির গৃহ আক্রমণ করতে।[৭] কেশব-ভক্তের পক্ষে এ ধরণের ঘটনার উল্লেখ করা দুঃসাহসিকতা। অন্যদিকে গৌরগোবিন্দ, চিরঞ্জীব শর্মা কার্লাইলের 'clean the dirt from them' নীতির পক্ষপাতী, প্রতাপচন্দ্রে তার পরিচয় বিশেষ নেই। কোচবিহার বিবাহ নিয়ে কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের মধ্যে দুটি দল হয়ে যায়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কেশবচন্দ্রকে পরিত্যাগ করে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন (১৮৭৮)। যেখানে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কেশব-বিরোধিতাকে গৌরগোবিন্দ অতি কটু ভাষায় আক্রমণ

করেছেন, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন,—অর্থাৎ দলীয় (partisan) মনোবৃত্তিকে উগ্রমাত্রায় প্রকাশ করেছেন, সেখানে প্রতাপচন্দ্র ঐ মনোভাবকে প্রশ্রয় দেন নি। বহু বিতর্কিত কোচবিহার বিবাহ সম্পর্কে তাঁর মনে হয়েছে 'Keshub did not act sagaciously here'। তিনি তাঁর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের 'Preface' অংশে লিখেছেন যে, তাঁর বিনীত উদ্দেশ্য তাঁর বন্ধুকে তিনি যে-ভাবে দেখেছেন, জেনেছেন সেইভাবে উপস্থিত করতে, 'concealing nothing, nor setting down aught in malice—এবং দ্বিতীয় সংস্করণের 'Preface'-এ নিজে 'faithful follower' হয়েও 'truthful and just' হবার প্রয়াস ঘোষণা করেছেন। তাঁর এই অভিপ্রায় জীবনীকারের যথার্থ লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) মতো প্রতিভাশালী যুগন্ধর ধর্মনেতা ও সমাজ-সংস্কারক ও ভক্ত-সাধকের জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গেলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বের বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা ও ব্যবস্থার আলোচনাও করা প্রয়োজন। প্রতাপচন্দ্র উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের হিন্দু-কলেজের শিক্ষা, ডেভিড হেয়ারের নাস্তিকতা ('reputed infidelity'), 'ইয়ং বেঙ্গল'দের বিজাতীয়তা' ('more or less de-nationalised'), ডিরোজিওর ভ্রান্ত প্রতিভা ('erratic genius and nonchalant self-indulgence') প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কেশবের মতোই সমকালীন পাশ্চাত্য চিন্তা-নায়কদের প্রত্যক্ষবাদ,হিতবাদ বা টোমাস পেইনের'Age of Reason' ইত্যাদির প্রভাবকে সমর্থন করতে পারেন নি।[৮] ব্রাহ্মসমাজও তখন ধর্ম ও সমাজ ক্ষেত্রে একটি প্রবল শক্তিরূপে দাঁড়ায়নি। তিনি দেখিয়েছেন কেশবচন্দ্র সেনের যোগ-দানের ফলেই বেগ, শক্তি ও ব্যাপ্তি ব্রাহ্ম আন্দোলনে এল—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নাস্তিক্যপন্থী যুক্তিপথের বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্র সেনের ভক্তি-আন্দোলন, ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজকে একটি নির্দিষ্ট বিশিষ্ট রূপদান করেছিল, যার পরিণতি 'নববিধানে'।

কেশবচন্দ্রের জীবনের ক্রম পরিণতি, তাঁর অধ্যাত্মজীবন ও কর্ম-জীবনের পরিচয় প্রতাপচন্দ্র ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিন্যাস করেছেন। সঙ্গতভাবেই তিনি কেশবের 'জীবনবেদ' গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছেন তাঁর ধর্মজীবনের উন্মেষ ও বিকাশের পথটিকে ধরে দেবার জন্য। তেমনি কেশবের ধর্মমতে খ্রীষ্ট, চৈতন্য-ও মাতৃসাধনার, পৌত্তলিক ধর্মের নবব্যাখ্যার কারণগুলি রাগ-দ্বেষ বর্জিত

দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন। ১৮৬৬ সাল থেকেই কেশবচন্দ্রের জীবন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। কাজেই কেশবচন্দ্রের জীবনী রচনা করতে গেলে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের ইতিহাস অনিবার্যরূপেই আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ে। জ্ঞানবাদী ব্রাহ্মধর্মে কেশবচন্দ্র কর্তৃক বিবেক, সহজ-প্রত্যয় বা 'intuition'-এর প্রাধান্য আনয়ন, এবং সমাজে জাতিভেদ দূরীকরণ, অসবর্ণ-ও বিধবা-বিবাহ প্রচলন, সবেরই প্রতাপচন্দ্র যথার্থ বিবরণ দিয়েছেন। 'নববিধান'-সমাজ গঠনের পিছনে কেশবচন্দ্রের নিজের বক্তব্য কী ছিল, প্রতাপচন্দ্র সেটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কেশবচন্দ্রের প্রত্যেকটি ভাবনা ও সিদ্ধান্তকে যে তিনি মনে-প্রাণে সমর্থন করেছেন তা নয়। প্রতাপচন্দ্র কেশবের জীবনের ঘটনাগুলি পর-পর শুধু সাজিয়ে দেন নি, তাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। অন্ধভক্তির পরিচয় দেননি, কেননা তিনি জানেন কেশবের মধ্যে পরা-লৌকিক বা 'super-natural' কিছু নেই। কেশবের সমগ্র জীবনটি পর্বে-পর্বে কী ভাবে ঈশ্বরাভিমুখী হয়েছে তাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এবং কেশবের যে অনন্যতা তিনি প্রদর্শন করেছেন, তার সঙ্গে বোধ করি কারো মতানৈক্য হবে না :

> "He consistently professed to see the face and hear the voice of the Living God. Of course it was only as Spirit can see and hear the Spirit. But thus he discovered realities and developed possibilities, which no other man in his age or generation had done."৮

চিরঞ্জীব শর্মা [ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল] 'কেশবচরিত' গ্রন্থে দেখাতে চেয়েছেন 'সাধু অভিপ্রায়ে নীত একটি চির-উন্নতিশীল চরিত্র মানবীয় বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া কিরূপে ভগবানের আদেশ পালন করিয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্গে চলিয়া যায়, তার 'আনুপূর্ব বৃত্তান্ত'। তিনি কার্লাইল-অনুরাগী কেশবচন্দ্রের 'Great men' বক্তৃতার 'God in History' তত্ত্বের সাহায্যে প্রতিপন্ন করেন :

> "হিন্দুধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম, তৎসঙ্গে খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ, মহম্মদীয় ধর্ম সকলে মিলিয়া কেশবচন্দ্রকে আপনাদের সংস্কর্তা, পূরণকর্তা, মিলনকারী এবং পুনর্জীবনদাতারূপে প্রাপ্ত হইয়া সাদরে তাঁহাকে বরণ করিল।...সমস্ত পৃথিবী ও মানবপরিবারের সুদূর ভবিষ্যত কল্যাণের নিমিত্ত বিধাতা কর্তৃক বিশেষরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন।"

গৌরগোবিন্দের 'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দেখি ১৮৭৯ সালে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ত্রৈলোক্যনাথের 'অভিষেক' হয় এবং কেশবচন্দ্র তাঁকে সম্বোধন করে বলেন 'তুমি আহূত, তুমি চিহ্নিত'। কেশবচন্দ্র 'নববিধান সমাজ' গঠন কালে টাউন হলে 'আমি কি প্রত্যাদিষ্ট মহাজন?'—নামে এক বক্তৃতা করেন। ১৮৮১ সালে তিনি একটি 'প্রেরিত পুরুষ' দল গঠন করেন, ত্রৈলোক্যনাথ তাঁদের অন্যতম। কাজেই তিনি 'কেশবচরিত' রচনায় প্রতাপচন্দ্রের মতো ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নি, নববিধান-মতের দৃষ্টিতেই কেশব চরিত্র পর্যালোচনা করেছেন। তিনি খ্রীষ্টের ও চৈতন্যের সঙ্গে মিল রেখে কেশব-চরিত রচনায় অগ্রসর হয়েছেন :

১. "যেমন চৈতন্যের পূর্বে অদ্বৈত, ঈশার পূর্বে জন্, তেমনি কেশবের পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যুগধর্মের আগমনবার্তা ঘোষণা করেন।"

২. "জলাভিষেকের পর মহাবীর ঈশা যেমন চল্লিশ দিবস পাপ পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং পরিণামে জয়ী হইয়া স্বর্গরাজ্য স্থাপনার্থ ধর্ম-প্রচারে ব্রতী হন, কেশবচন্দ্র সেইরূপ আন্তরিক রিপুগণের উপর জয়-লাভ করিয়া জীবনের মহাব্রত পালনে অগ্রসর হইলেন।"

৩. "একদিন জলসংস্কার, একদিন খ্রীষ্টের রক্তমাংস ভোজনের ব্যবস্থা। যীশুদাস কেশব তেমনি মাংসের পরিবর্তে অন্ন ও মদ্যের পরিবর্তে জল পান করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টের ভাগবতী তনু নিজ জীবনে পরিণত করাই ইহার তাৎপর্য।"

কিছু কেশবভক্তের বিরক্তির কারণ হলেও ত্রৈলোক্যনাথ প্রতাপচন্দ্রের মতো স্বীকার করেছেন, "ব্রাহ্মসমাজে এক্ষণে যে ভক্তির লীলাবিলাস ও মাতৃভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে তাহার এক প্রধান সহায় পরমহংস রামকৃষ্ণ।"

ভক্ত ত্রৈলোক্যনাথের দৃষ্টিতে কেশবচন্দ্র 'অবতার'কল্প। প্রতাপচন্দ্রের রচনায় তিনি মহৎ মানব মাত্র। প্রতাপচন্দ্র জানিয়েছেন কেশব নিজে কখনো 'অবতার'ত্ব দাবি করেন নি, ('never claimed to be a messiah, a mediator or a prophet')। ত্রৈলোক্যনাথ, যিনি 'ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা' লিখেছেন তাঁর 'কেশব চরিত' প্রকৃতপক্ষে 'কেশবচরিতামৃত' হয়েছে। যদিচ তিনি ঘোষণা করেন' স্বপক্ষদিগের প্রগাঢ় অনুরক্তি, বিপক্ষদিগের বিদ্বেষ বিরক্তি, ইহারই মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আমি প্রকৃত তত্ত্ব নির্ধারণ করিয়াছি।"

কিন্তু তাঁর কেশবচরিত সে-দৃষ্টির সাক্ষ্য দেয় না। তবে এই গ্রন্থের

একটি মূল্যবান অংশ এর 'পরিশিষ্ট' (১-৭৩ পৃষ্ঠা)। জীবনী-রচনায় 'anecdotes'এর স্থান নগন্ত নয়, 'কেশবচরিত' গ্রন্থে সংকলিত টুকরো গল্পগুলি মূল্যহীন নয়, বরং সেগুলির মধ্যে 'ব্যক্তি'-কেশবচন্দ্রের রূপ বেশ কিছুটা ধরা পড়েছে।

গৌরগোবিন্দ রায়ের 'আচার্য কেশবচন্দ্র' আন্ত-মধ্য-অন্ত্য খণ্ডে বিধৃত বিরাট গ্রন্থ ২৩০২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ভিক্টোরিয়ান যুগের তুই ভল্যুমে জীবনী রচনার আদর্শে তিনি কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, ডায়েরি, আত্মজীবনী, ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রকাশিত প্রবন্ধাদি, অনুকূল-প্রতিকূল সমালোচনা, অপরের ডায়েরি ও স্মৃতিকথা—অর্থাৎ কেশবের জীবনচরিত রচনার সর্বপ্রকার উপাদান সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন। তিনি কেশবচন্দ্রের প্রত্যেকটি কার্যকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছেন, কেশবের বিন্দুমাত্র সমালোচনা যাঁরা করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছেন। প্রতাপচন্দ্রের সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি ও নিপুণ সৃষ্টিকৌশল কোনটিই গৌরগোবিন্দের আয়ত্তাধীন ছিল না। তবে 'art' না হলেও 'craft' হিসাবে এ গ্রন্থের মূল্য আছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের (১৮২০-৯১) পরলোকগমনের পর অতি অল্পকালের মধ্যে তিনখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী ও বহু চরিত-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত 'বিদ্যাসাগর জীবন চরিত' তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজের মৃত্যুর মাত্র তিন মাস পরে প্রকাশিত হয় (১৮৯১, ২৮শে সেপ্টেম্বর)। তাঁর বইখানির শেষে তিনি জানিয়েছেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতকালে তিনি এই বইখানি লিখতে শুরু করেন এবং 'তাঁহার আজ্ঞানুসারে জীবন-চরিতের উপক্রমণিকা, শিশুচরিত সমগ্র ও স্থানে স্থানে তুই-চারি পৃষ্ঠা' তাঁকে পড়ে শোনান। শুনে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেন 'লেখা ভালো হইয়াছে' তবে দান ও সাহায্যপ্রাপ্তদের নামের তালিকা তুলে দিতে বলেন। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মোটামুটি প্রামাণিক জীবনী হিসাবে শম্ভুচন্দ্রের বইখানি গৃহীত হবার যোগ্য। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজের বিস্ময়কর জীবনের ইতিহাস দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিদ্যাসাগরের স্বরচিত অসম্পূর্ণ আত্মচরিতের পাণ্ডুলিপি শম্ভুচন্দ্র দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। কেননা, ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মকথা ও শৈশব সম্পর্কে লিপিবদ্ধ বৃত্তান্তগুলি সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন, "এই বৃত্তান্ত পিতামহী, মাতামহী ও পিতৃদেবের প্রমুখাৎ যেরূপ অবগত

হইয়াছিলাম; তাহা অবিকল লিখিলাম” এবং “আমি কাশীতে তর্কপঞ্চাননের প্রমুখাৎ জ্যেষ্ঠের বাল্যকালের বহুতর গল্প শ্রবণ করিয়াছি।” কাজেই দেখা যায় শম্ভুচন্দ্র উপযুক্ত উৎস থেকেই তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। এবং স্বয়ং বিদ্যাসাগর যখন ‘লেখা ভাল হইয়াছে’ বলে প্রশংসা করেছেন তখন শম্ভুচন্দ্রের গ্রন্থের প্রামাণিকতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বীকার্য। বিদ্যাসাগরেরজন্মের পূর্বে তাঁর জননী ভগবতী দেবী উন্মাদিনীর মত হয়েছিলেন, এ তথ্য শম্ভুচন্দ্র তাঁর পিতামহী বা মাতামহীর কাছ থেকে শুনে থাকবেন। এ ঘটনা অলৌকিক হলেও তার জন্য শম্ভুচন্দ্রকে ঠিক দোষী বলা যায় না। বিদ্যাসাগরের কলিকাতায় ছাত্রজীবন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কর্মময় জীবনের বেশির ভাগ শম্ভুচন্দ্র নিজেই দেখেছেন। তাঁর প্রদত্ত বিবরণের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর কোথাও “দেবত্ব” বা “অতিমানবত্ব” আরোপিত হয়নি। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবন, ছাত্রজীবন ও পরবর্তী কালের বহুমুখী কর্ম-জীবন, তাঁব সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার-সাধন প্রচেষ্টা—শম্ভুচন্দ্র সততা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবৃত করেছেন। তাঁব বই চণ্ডীচরণেব বা বিহারীলালের ‘বিদ্যাসাগর’ গ্রন্থেব মত ‘well-documented’ অর্থাৎ প্রমাণ বা দলিলনিষ্ঠ হয়নি। তিনি হয়ত তার প্রয়োজন বোধ করেননি। তিনি কোথাও রোদন বা ভাবোচ্ছ্বাসের পরিচয় দেননি। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন যে একবার দেশের বাড়িতে গেলে জননী ভগবতী দেবী সাশ্রুনয়নে একটি আত্মীয়া বিধবা বালিকাকে দেখিয়ে বিদ্যাসাগরকে তাদের কল্যাণের জন্য কিছু করতে বলেন, সে কথা তাঁর “হৃদয়ে প্রোথিত হইয়া রহিল”। এ তথ্য তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজাত। পরে তাঁর প্রদত্ত তথ্যগুলি অপরের কাছে স্বভাবতঃই ‘প্রমাণ’ হয়েছে। বিদ্যাসাগরের “যশুরে কৈ” খ্যাতি, একগুঁয়েমি, দারোয়ানের কাছ থেকে টাকা ধার করে দরিদ্র সতীর্থকে সাহায্য, কার সাহেব ও চটিজুতা প্রসঙ্গ, সংস্কৃত কলেজ থেকে পদত্যাগের পর “আলু-পটল বেচিয়া খাইব”—উক্তি, রামধন মুদীর সঙ্গে একসঙ্গে বসে তামাক খাওয়া, বালিকা বিবাহের জন্য বৃদ্ধ অধ্যাপক শম্ভু বাচস্পতিকে তিরস্কার, প্রভৃতি শম্ভুচন্দ্র কর্তৃক বিবৃত তথ্য ও উক্তি বিদ্যাসাগরের চরিত্রনির্ণয়ে অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। শম্ভুচন্দ্রের বইখানি পড়লে দেখা যায় বিদ্যাসাগর চরিত্রের যে দুটি দিক তাঁকে পরবর্তী কালের মানুষের ‘মনের মন্দিরে’ চিরস্থায়ী করেছে, চরিত্রের সেই অনমনীয় বলিষ্ঠতা ও উদার করুণা—উপযুক্ত তথ্যবিন্যাসের ফলে চমৎকার ভাবে ফুটে

উঠেছে। পারিবারিক জীবনে ভ্রাতাদের ও পুত্রের ব্যবহারে তাঁর অশান্তি, ক্ষীরপাইয়ের বিধবা বিবাহের পর তাঁর দেশত্যাগ প্রভৃতি ঘটনাও শম্ভুচন্দ্র বর্ণনা করেছেন, বর্জন করেননি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সামাজিক ও শিক্ষামূলক সংস্কারে সংগ্রামী ভূমিকা ছিল। শম্ভুচন্দ্র সমকালীন পটভূমি ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তার যোগ নির্দেশ করেছেন। পরবর্তীকালে যাঁরা বিদ্যাসাগর-চরিত রচনায় বা বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে বা মাহাত্ম্য পরিমাপে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই শম্ভুচন্দ্রের গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরচিত অসম্পূর্ণ আত্মচরিতের মতই শম্ভুচন্দ্রের বইখানির অনলংকৃত ভাষা ও অবজেক্‌টিভ দৃষ্টি প্রশংসার্হ।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' ১৮৯৫ সালের ১৩ই জুন প্রকাশিত হয়, শম্ভুচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় চার বছর পর। চণ্ডীচরণ 'পূজার আয়োজনে' ('Hero-worship') এই 'সুপবিত্র জীবন-কাহিনী' বর্ণনার অভিপ্রায় করেছিলেন। বিদ্যাসাগর চরিত্র তাঁর মতে 'এতই চিত্তমুগ্ধকর ও এতই উপদেশপূর্ণ' ('entertaining and useful') যে তার আলোচনায় 'লোকমণ্ডলীর বিশেষ কল্যাণ সাধিত' হবার সম্ভাবনা।[৯]

চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষজীবনে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গলাভ করেছিলেন। শিক্ষা-সংস্কারে সমর্থন জ্ঞাপন করলেও তৎকালে সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে অনেকেই বিদ্যাসাগরের বিরোধী হয়েছিলেন। চণ্ডীচরণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর নয়। তিনি 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থ 'মহাত্মা রাজর্ষি রামমোহন রায়ের চরণে গ্রন্থকারের পূজার নৈবেদ্যরূপে' উৎসর্গ করেছেন, কেননা তিনি বিদ্যাসাগরের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন রামমোহনের সমাজ ও শিক্ষাগত সংস্কারের উত্তরাধিকার। রামমোহনের সতীদাহ নিবারণের জন্য শাস্ত্রবচন সংগ্রহ, গ্রন্থপ্রকাশ, বিতর্ক, রাজদ্বারে আবেদন ও বিল বিধিবদ্ধকরণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রচলনের ইতিহাসের মিল আছে। নারীর উত্তরাধিকার সম্পর্কেও রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতৈক্য এই সূত্রে স্মরণীয়। শিক্ষাসংস্কার সম্পর্কে বিদ্যাসাগর রামমোহনের মতের পূর্ণ পোষকতা করেন। বাংলা ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রকাশ রামমোহন-বিদ্যাসাগর উভয়েরই বিশেষ কাম্য ছিল। উভয়েই মানবতাবিরোধী দেশাচারের বিরুদ্ধে সদর্পে দাঁড়িয়েছেন এবং সামাজিক নির্যাতন লাভ করেছেন।

কাজেই 'সংস্কারক' বিদ্যাসাগরকে রামমোহনের অনুবর্তীরূপে চিত্রিত করায় চণ্ডীচরণের অন্যায় হয়নি।

ব্রাহ্মমনোভাবের জন্যই চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরকে 'বাল্যকাল হইতেই প্রতিমা-পূজার তাদৃশ পক্ষপাতী ছিলেন না'[১০] বলে প্রমাণ করেন এবং ভগবতী দেবীও 'মূর্তিপূজার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না' বলে মন্তব্য করেন। তিনি অবশ্য ভগবতী দেবী সম্বন্ধীয় উক্তিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজ মুখের উক্তি বলে দাবি করেছেন। কিন্তু তাঁর এই ধরনের মন্তব্য তর্কাতীত নয়। শম্ভুচন্দ্রও উভয় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছেন। তিনি লিখেছেন, বিদ্যাসাগর মাতৃদেবীকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন একদিন পূজা করে বহু অর্থব্যয় অপেক্ষা দরিদ্রদের সাহায্য করা শ্রেয় কিনা। ভগবতীদেবী সে ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেন। এর দ্বারা চণ্ডীচরণের সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না।

'ধর্মমতে বিদ্যাসাগর' অধ্যায়ে দেখি বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজেব সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখক ছিলেন এবং ঐ পত্রিকাব সম্পাদনা কার্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য সহায়তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনেব যোগদানেব পব তিনি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেন। দেবেন্দ্রনাথও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারমূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশ ও আলোচনাকে ভালো চোখে দেখেন নি। তিনি একখানি পত্রে লিখেছেন—"কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহাবদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই" (২৬শে ফাল্গুন, ১৮৫৩)।[১১] চণ্ডীচরণ 'বোধোদয়' বইয়ে বিদ্যাসাগবের 'নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' ঈশ্বরবিষয়ক উক্তিকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়েছেন। কৃষ্ণকমলের মতে হেয়ার ও বিদ্যাসাগর উভয়েই নাস্তিক ছিলেন।[১২] বিদ্যাসাগর agnostic বা সংশয়বাদী ছিলেন, ব্রহ্মবাদী ছিলেন না।

চণ্ডীচরণের কোনো কোনো 'গল্প' (anecdote) বিচারসহ হয়নি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃভক্তি সম্পর্কীয় যে কাহিনী বাংলাদেশে সর্বাধিক প্রচলিত, অর্থাৎ ভ্রাতার বিবাহোপলক্ষে বর্ষার দুরন্ত দামোদর নদ সাঁতার দিয়ে পার হওয়া এবং পথে 'দারকেশ্বর নদও পূর্ববৎ পার হওয়া'—সেও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত। চণ্ডীচরণ লিখেছেন এ ঘটনা এত বিস্ময়কর যে 'উপন্যাসে কবি-কল্পনায় এরূপ ঘটনার অবতারণা অসম্ভব'। কিন্তু যে ভ্রাতাব বিবাহে বিদ্যাসাগর যোগদানের জন্য যাত্রা করেন, তিনি শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

তিনি তাঁর 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন নি এবং 'ভ্রম নিরাসে' (১৩০২) এই কাহিনীর অবাস্তবতা ও অসঙ্গতি নির্দেশ করেছেন। তাঁর উক্তির প্রামাণ্য অস্বীকার্য নয়। এই ধরনের কিছু কিছু তথ্যের পুনর্বিচার প্রয়োজন হলেও চণ্ডীচরণের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থ বিদ্যাসাগর জীবনীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে বিহারীলাল সরকার তাঁর 'বিদ্যাসাগর', চণ্ডীচরণের বই বার হবার চারমাস পরে প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের তেজ, অন্তরের কোমলতা, গদ্যসাহিত্যে তাঁর দান, শিক্ষাবিস্তারে উজ্জ্বল ভূমিকা স্বীকার করলেও বিদ্যাসাগর যাকে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে মনে করতেন, সেই বিধবা-বিবাহ দান বিহারীলাল সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন 'দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করা' কর্তব্য বলে মনে করেছেন কেননা, না করলে 'হিন্দুসন্তানের মহতী ক্ষতি' হবে এবং 'প্রত্যবায়ভাগী' হতে হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে চণ্ডীচরণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়ায় বিদ্যাসাগরের জীবনী রচনায় অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল এবং বিহারীলাল আপেক্ষিক রক্ষণশীল দৃষ্টির পরিচয় রেখে গেছেন।

অ্যাসকুইথ্ জীবনচরিতকারের মধ্যে অন্যান্য গুণের সঙ্গে 'love of detail' এবং 'a dash of hero-worship' প্রত্যাশা করেছেন।[১২] চণ্ডীচরণের মধ্যে এই দুটি গুণই বিদ্যমান। বিদ্যাসাগরের জীবনের সবগুলি দিকের আলোচনায় তিনি বস্ওয়েল-সুলভ তথ্যপ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যদিকে মেদিনীপুরের গ্রামের যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান অমিতবিক্রমে সকল বাধা অতিক্রম করে, সকল সংস্কার 'হেলায় তুচ্ছ করে' এগিয়ে চলেছেন নিজের আত্মবিশ্বাসে, তাঁকে চণ্ডীচরণ কার্লাইল ব্যাখ্যাত 'Hero' রূপেই গ্রহণ করেছেন। স্যর সিডনী লী (১৮৫৯-১৯২৬) যিনি দীর্ঘকাল 'Dictionary of National Biography' সম্পাদন করেন, জীবনচরিত রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছিলেন, "to do honour to the memories of those who by character and exploits have distinguished themselves from the mass of their countrymen."[১৩] 'উপক্রমণিকা' অংশে চণ্ডীচরণ এই উক্তির প্রতিধ্বনি করেছেন।

বিদ্যাসাগরের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তাঁর চিত্তের তেজস্বিতা ও কোমলতার উৎস-সন্ধানে চণ্ডীচরণ তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ও মাতা ভগবতী দেবীর প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন। এই heredity বা

বংশগতি-তত্ত্ব উনবিংশ শতকের ডারউইনীয় জীববিজ্ঞানের দান।[১৪] উনবিংশ শতকের শেষভাগে রচিত জীবনী গ্রন্থগুলিতে বংশগতি-তত্ত্বের প্রভাব লক্ষণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জর্জ হেন্‌রি লিউয়েসের (১৮১৭-৭৮) গ্যেটের জীবনীর (১৮৫৫) উল্লেখ করা যায়। বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ সকলেই চণ্ডীচরণের বিশ্লেষণ স্বীকার করেছেন।

চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরের সর্বতোমুখী প্রতিভা, কর্মদক্ষতা, তেজস্বিতা, সামাজিক সংস্কারে আত্মোৎসর্গ সবই স্বীকৃত বা সমর্থিত প্রচুর তথ্যের দ্বারা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের ট্রাজিক রূপটি একমাত্র তিনিই ধরতে পেরেছেন। বিদ্যাসাগব সমাজ-সংস্কারে, বিধবা-বিবাহদানে ব্রতী হয়েছিলেন, সেজন্য অজস্র ঋণ তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল। দেশের জ্ঞানী ও ধনী ব্যক্তিরা শেষ পর্যন্ত অনেকেই প্রতিশ্রুত অর্থসহায়তা বন্ধ করেছিলেন। যে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন এবং বিদ্যাসাগরের জন্যই যিনি উচ্চ সরকারী পদ লাভ করেন, তিনি প্রদত্ত ঋণের জন্য বিদ্যাসাগরকে অতিমাত্রায় বিব্রত করেছেন। যে ভ্রাতা দীনবন্ধুকে শিক্ষাদান শেষে সরকারী চাকরি করে দিয়েছিলেন, তিনিই বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে প্রেসের প্রাপ্য অংশ নিয়ে মামলা করেন। যে পিতাকে তিনি কাশীর বিশ্বেশ্বর মনে করে পূজা করতেন তিনিও শেষ পর্যন্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতার পরামর্শে বিদ্যাসাগরের প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। যে ক্ষীরপাই-বিবাহ নিয়ে বিদ্যাসাগর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তার উদ্যোক্তা ছিলেন ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও বিদ্যাসাগরের নিজের ছেলে নারায়ণ। পত্নীর কাছ থেকে প্রার্থিত সহানুভূতি বিদ্যাসাগর লাভ করেছিলেন বলে মনে হয় না। কোনো গুরুতর অপরাধে পুত্রের মুখদর্শন করতেও তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। সততার অভাবের জন্য জামাতাকে মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে পদচ্যুত করতে হয়, বড়ো মেয়ের বৈধব্য দেখতে হয়, পিতৃহীন দৌহিত্র সুরেশ সমাজপতির "আমার বাবা বেঁচে থাকলে'—খেদোক্তি শুনতে হয়। শুধু তাই নয়—যারা অর্থ নিয়ে বিধবা-বিবাহ করত, তারাই আবার অর্থলোভে অন্যত্র বিবাহ করেছে, এ ঘটনা বিদ্যাসাগরকে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছে। তাই মানুষের সামান্য দুঃখ-কষ্টের কথা শুনলে যিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করতেন, সেই বিদ্যাসাগর শেষে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষিত সমাজকে ঘৃণা করতে শুরু করেন, আনন্দ পান শুধু কার্মাটাড়ে সাঁওতালদের সংস্পর্শে। বিদ্যাসাগর

চরিত্রের এই মানব-দরদী থেকে মানব-বিদ্বেষী রূপান্তরের ট্রাজিডি চণ্ডীচরণই একমাত্র ধরতে পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগর চরিত্রের আর অতি করুণ একটি ঘটনা—যেখানে তিনি সেসিল বীডনকে অনুরোধ করেন তাঁকে শিক্ষাবিভাগে' একটি চাকরি করে দিতে ('has now become a necessity')। যে দৃপ্ত বিদ্যাসাগর পূর্বে দুইবার সরকারী চাকরী থেকে পদত্যাগ করেন, 'আলু পটল বেচিয়া খাইব' বলেন, ঋণভারগ্রস্ত সেই বিদ্যাসাগর কী গভীর মনস্তাপ নিয়ে পুনরায় সরকারী শিক্ষাবিভাগের পদলাভে আগ্রহী হয়েছিলেন—চণ্ডীচরণ তার যথাযথ বিবরণ দিয়েছেন। অবশ্য সেই দুঃখের দিনেও বিদ্যাসাগর দাবি করেছিলেন যে তাঁর বেতন যেন য়ুরোপীয় শিক্ষকদের চেয়ে কম না হয়। ভস্মের মধ্যেও বহ্নির দীপ্তি ছিল।

সুলিখিত জীবন-চরিতের একটি বড়ো লক্ষণ, বর্ণিত ব্যক্তিকে 'recall him to life'-আনতে পাবা। চণ্ডীচরণ এক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে সার্থকতা অর্জন করেছেন। চণ্ডীচরণের এই সার্থকতা অর্জনের একটি প্রধান পন্থা তাঁর বর্ণন-দক্ষতা, উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে যার দৃষ্টান্ত মেলে। বিদ্যাসাগরের অধ্যাপক বৃদ্ধ শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির বালিকা-বিবাহ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের যে-চিত্র চণ্ডীচরণ এঁকেছেন তার থেকে অংশ-বিশেষ উৎকলন করলেই চণ্ডীচরণের কৃতিত্ব প্রমাণিত হবে :

> "বাচস্পতি মহাশয়ের নববিবাহিতা পত্নীকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই জননীস্থানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়া ও সেই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বাচস্পতিমহাশয় 'অকল্যাণ করিস্ না রে' বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহির বাটিতে আসিলেন এবং নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশ দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে ও তাঁহাকে প্রবোধ দিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে ঈশ্বরচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ জল খাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পাষাণতুল্য কঠিন প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র জলযোগ করিতে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইয়া বলিলেন 'এ ভিটায় আর কখনও জলস্পর্শ করিব না'।"

চরিত্র-সৃষ্টি ও সাহিত্য-সৃষ্টি উভয় ক্ষমতা চণ্ডীচরণের ছিল। এ ক্ষমতা শম্ভুচন্দ্র বা বিহারীলালে দেখা যায়নি।

বিহারীলাল সরকার বিদ্যাসাগর সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য অথবা প্রকাশিত

তথ্যের কোনো নতুন ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি বাংলাদেশের একজন মহামানব রূপে দেখলেও বিদ্যাসাগর সম্পর্কে উক্তি করেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুগুণান্বিত হইলেও দোষবর্জিত নহেন। সত্য সেই সব দোষ তাঁহার ভ্রান্তবিশ্বাসমূলক। তাহা হইলেও দোষ ত বটে।" বিধবা-বিবাহের বিচার অংশের আলোচনা পড়লেই বোঝা যায় বিহারীলাল কেন বিদ্যাসাগর সম্পর্কে 'ভ্রান্তবিশ্বাস' পদ প্রয়োগ করেছেন। তা ছাড়া বিদ্যাসাগর সন্ধ্যাহ্নিক করতেন না, 'মন্ত্র' গ্রহণে তাঁর অপ্রবৃত্তি ছিল। তাঁর এই সব আচরণ রক্ষণশীল লেখকের মনঃপূত হয়নি বলে মনে হয়। তবে বিহারীলালের গ্রন্থের তথ্যের দিক থেকে মূল্য রয়েছে। বিদ্যাসাগরের কৌতুকপ্রিয়তা, অমায়িকতা, অযাচিত দান প্রভৃতির বর্ণনার সঙ্গে ঋণগ্রহণের জন্য তাঁর লাঞ্ছনা ভোগ—বিহারীলাল ভালোই বর্ণনা করেছেন। তবে হকিন্‌সের 'জনসন্ চরিত' যেমন বস্‌ওয়েলের গ্রন্থের তুলনায় নিম্নস্থানাধিকারী তেমনি বিহারীলালের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের স্থান চণ্ডীচরণের গ্রন্থের নিচে।

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) উনবিংশ শতকের বাংলাদেশে চিন্তা ও মননের দিক থেকে স্মরণযোগ্য ব্যক্তি। তিনি বিদ্যাসাগরের মতো যুক্তিবাদী, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় উৎসাহী। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হলেও তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ব্রহ্ম-ভক্তির বা ব্রহ্ম-সাধনার পথে অগ্রসর হননি। দেবেন্দ্রনাথ ক্ষোভ করে বলেছিলেন, অক্ষয়কুমারের "আত্মীয় সভায়" (১৮৫২) 'হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা হইত' এবং লিখেছিলেন "আমি কোথায় আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ।" অক্ষয়কুমার বেদের অভ্রান্ততায় অবিশ্বাস করেন, অঙ্ক কষে প্রমাণ করেন প্রার্থনার ফল = 0 কাজেই দেখা যায় দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার প্রকৃতপক্ষে দুটি ভিন্ন মানস লোকাধিষ্ঠিত। অক্ষয়কুমার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত ভাষণে বলেন: "ভাস্কর ও আর্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস যে-কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাস্ত্র, গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কোম্‌ত যে কোনও প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাস্ত্র।"[১৫] এই মন্তব্যের মধ্যেই তাঁর উদার জ্ঞানচর্চার পরিচয় প্রকাশিত।

তাঁর শিরঃপীড়ার দরুণ জীবনের অধিকাংশ কাল তিনি জ্ঞানচর্চায় ও যুক্তিবাদ

প্রচারে ব্যয় করতে পারেন নি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যিনি অক্ষয়কুমারকে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত করান, কৌতুক করে লিখেছিলেন: 'মাথামুণ্ড ঘুরে গেল মাথামুণ্ড লিখে।' কাজেই 'শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থের লেখক মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি জানিয়েছেন: "পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় শিরোরোগ প্রযুক্ত চিরদিনের নিমিত্ত একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়েন। এই পর্যন্তই ইনি আপনাকে জীবিত বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।" মহেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের আত্মীয়। তিনি যুক্তিবাদী, জ্ঞানপন্থী, বিজ্ঞানপ্রিয় অক্ষয়কুমারকে শ্রদ্ধা করতেন। সেজন্য অক্ষয়বাবুর জীবিতকালে 'অক্ষয়বাবুর জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যেখানে যাহা প্রাপ্ত হই, তৎসমুদয় সংগ্রহ' করে রাখেন। অক্ষয়বাবুকে তিনি তাঁর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করায় অক্ষয়কুমার "প্রথমতঃ ইহাতে অসম্মত হন। পরে আমার একান্ত যত্ন ও নিতান্ত আগ্রহাতিশয়" দেখে "অগত্যা সম্মত হইলেন।" মহেন্দ্রনাথ যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তার সঙ্গে পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত গোস্বামী কর্তৃক সংগৃহীত অক্ষয়কুমারের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ক তথ্যাদি ব্যবহার করেছেন। মহেন্দ্রনাথ এই জীবনবৃত্তান্ত রচনায় দুরূহ শ্রম করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', সংবাদপ্রভাকর, বিদ্যাদর্শন, তত্ত্ববোধিনী' সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকা, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নববার্ষিকী' প্রভৃতি নানা সূত্র থেকে অক্ষয়কুমারের জীবন ও কার্যাবলী সম্পর্কিত তথ্য আহরণ করেন।

মহেন্দ্রনাথও অক্ষয়কুমারের জন্মবিবরণ প্রসঙ্গে তার 'পিতামাতার প্রকৃতি' বর্ণনা করেছেন। শিক্ষা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে লিখেছেন: 'ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্য তাঁহার স্বহস্ত গঠিত'। অক্ষয়কুমার সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। লেখক দেখিয়েছেন দরিদ্র একটি বালক শিক্ষালাভে গভীর আগ্রহ অথচ অর্থাভাবে উপায়হীন বালক কী ভাবে গৌরমোহন আঢ্যের বদান্যতায় নিজের শক্তিতে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে যোগ, 'সংবাদ প্রভাকরে' ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে বঙ্গানুবাদ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয়, তত্ত্ববোধিনীতে যোগদান, দেবেন্দ্রনাথের সহিত বেদের অভ্রান্ততা নিয়ে মতপার্থক্য, প্রার্থনার আবশ্যকতা অস্বীকার সবই মহেন্দ্রনাথ বিবৃত করেছেন। তিনি অক্ষয়কুমারের মতকে শ্রদ্ধা ও সমর্থন জানিয়েছেন: 'বিজ্ঞানসিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী কার্য করা ব্রাহ্মধর্মের

প্রধান অঙ্গ'—অক্ষয়কুমারের এই মত দেবেন্দ্রনাথের থেকে পৃথক। 'মানবহিত-বাদে' অক্ষয়কুমারের গভীর আস্থা ছিল, লেখক দেখিয়েছেন সে ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার রামমোহন রায়ের উত্তরসাধক। অক্ষয়কুমারের মতো যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম যে কেশবচন্দ্র সেনের পাদপূজা, নরপূজার বিরোধিতা করবেন এ তো স্বাভাবিক।

মহেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত রচনায় জ্ঞানবাদী, ইতিহাসনিষ্ঠ, বিচারমুখ্য, বিজ্ঞানপ্রিয় ও উদার ধর্মমতাবলম্বী রূপটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সামাজিক সংস্কার ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ন্যায় প্রগতিশীল দৃষ্টির মানুষ ছিলেন। তিনি বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন, বিধবা-বিবাহের সংবাদ শুনে আনন্দিত হয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লেখেন। ডারউইন ও নিউটনের চিত্রপট স্থাপনে স্থানটি 'দেবলোকসদৃশ' হল—তাঁর এই মন্তব্য মানবপন্থী ও বিজ্ঞানসেবী দৃষ্টির সাক্ষ্য দেয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'প্রজাগণের দুরবস্থা' বিষয়ক রচনা ও নীলকরদের বিরুদ্ধ সমালোচনা তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বসূরী রূপে প্রমাণিত করে। অক্ষয়কুমার সম্পর্কে এরূপ শ্রমসাধ্য, সযত্ন-চয়িত উপাদানসমৃদ্ধ জীবনী বাংলা সাহিত্যে এর পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। চিঠিপত্র, প্রণীত গ্রন্থাদি, সম্পাদকীয় রচনা, প্রদত্ত ভাষণ, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক তথ্য সবই মহেন্দ্রনাথ সদ্ব্যবহার করেছেন। বর্ণিত ব্যক্তির নিজের মুখের কথাকে ধরে রাখতে পারলে চরিতগ্রন্থের প্রামাণিকতা বৃদ্ধি পায়। বস্‌ওয়েল ও লক্‌হার্টের মতো মহেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের নিজের উক্তিকে গ্রন্থের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> "যে যে স্থানে উদ্ধৃতিচিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে, অথচ কোন পুস্তক বা পত্রিকার নাম লিখিত হয় নাই, তওৎস্থলের অংশগুলি অক্ষয়বাবুর নিজের মুখের কথা বলিয়া বুঝিতে হইবে।"

মহেন্দ্রনাথের রচিত জীবনী ভাবাবেগবর্জিত, তথ্য-প্রমাণ-সমৃদ্ধ। অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিগত জীবনের দিকটি সম্পর্কে তিনি বিশেষ বিবরণ কিছু দেননি। তাহলেও মহেন্দ্রনাথের জীবনী থেকে যুক্তিনিষ্ঠ, প্রজাহিতৈষী, মানবপন্থী অক্ষয়কুমারকে চিনে নিতে দেরি হয় না।

মহেন্দ্রনাথের বই বার হবার দুবছর পরে ১৮৮৭ সালে অর্থাৎ অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর পর নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের 'অক্ষয়চরিত' প্রকাশিত হয়। তিনি প্রেস্‌কটের (Prescott) একটি উক্তি আখ্যাপত্রে উৎকলন করেছেন

"There is no kind of writing which has truth and instruction for its main object, so interesting and popular, on the whole, as Biography."

—এই উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হয়ে তিনি অক্ষয়বাবুর পরিবারবর্গ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে তাঁর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মহেন্দ্রনাথের মতো কোনো বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নকুড়চন্দ্রের মধ্যে দেখা যায় না। তাঁর গ্রন্থও নিঃসন্দেহে informative বা তথ্যমূলক। তিনি অক্ষয়কুমারের চোদ্দ বৎসর বয়সের প্রথম রচনা 'অনঙ্গমোহনে'র উল্লেখ করেছেন, এ তথ্য আর কেউ দেননি। এছাড়া বিদ্যাসাগরের অনেক মুখোক্তির লিপিবদ্ধ রূপ দেখতে পাই। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র 'প্রবন্ধ নির্বাচনী সভা'র কার্যবিবরণী থেকেও অনেক অংশ তুলে দেওয়া হয়েছে। বংশবৃত্তান্ত থেকে মৃত্যু ও অক্ষয়কুমারের উইল পর্যন্ত তথ্যাদি সবই লেখক বিন্যাস করেছেন। তবে নকুড়চন্দ্রের 'অক্ষয়চরিত' অপেক্ষা মহেন্দ্রনাথ রায়ের 'অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত' উন্নততর রচনা।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার থেকে অন্য পথের পথিক মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩)। বাংলাদেশের রেনেসাঁসে একদিকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার গোষ্ঠী অন্যদিকে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য জীবনী আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। কিন্তু মধুসূদন সম্পর্কে আমাদের সে প্রবল ক্ষোভ নেই। যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' এবং নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' সে অভাব বহুলাংশে দূর করেছে।

ঊনবিংশ শতকে সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) কাল পর্যন্ত ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কার নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্কের যুগ। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার সকলেই 'Reason' পন্থী। 'ইয়ংবেঙ্গল' বা নব্যবঙ্গদের গুরু ডিরোজিও তাঁর তরুণ ছাত্রদের জ্ঞানৈষণা, যুক্তিবাদ ও চিত্ত-স্বাধীনতার দিকে টেনে নিয়েছিলেন। কৈলাসচন্দ্র বসু রামগোপাল ঘোষের স্মৃতিসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন:

"He chose for his motto a saying of Sir William Drummond, 'He who will not reason is a bigot; he who cannot is a fool, and he who dose not is a slave.'"

মধুসূদন ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন না, তিনি হিন্দুকলেজে প্রবেশের পূর্বেই ডিরোজিওর সঙ্গে হিন্দুকলেজের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তিনি পড়েছিলেন ডি. এল্.

রিচার্ডসনের কাছে, যাঁর সাহিত্য-অধ্যাপনা তরুণ চিত্তে রসের উদ্‌বোধন, কল্পনার প্রসার, অনুভূতির গভীরতা সৃষ্টি করত।[১৬]

যোগীন্দ্রনাথ মধুসূদনের জীবনে শিক্ষা-গুরু রিচার্ডসনের দ্বিমুখী প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তিনি কবি বায়রণের সঙ্গেও মধু-জীবনের মিল দেখেছেন। মূরের (Moore) 'বায়রণ জীবনী' ছাত্রজীবনে মধুসূদনের অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ ছিল।[১৭] লেখকের মতে তিনি 'অনেক বিষয়ে বায়রণকে আপনার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন'। বায়রণের একদিকে অসাধারণ কবিপ্রতিভা, অপরদিকে স্বেচ্ছাচারী অসংযম। রিচার্ডসন্ পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের, শেক্‌সপীয়রের নাট্যসাহিত্যের রসজ্ঞ ও লব্ধকীর্তি সমালোচক, কিন্তু নৈতিক দিক থেকে শিথিল-চরিত্র। মধুসূদনের চরিত্রে যোগীন্দ্রনাথ এই দুটি দিককে অচ্ছেদ্য ভাবে মিশে থাকতে দেখেছেন এবং মধুসূদনের জীবনের ট্রাজিডির মূল সেখানেই নির্দেশ করেছেন :

> "অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াও যে তিনি শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারেন নাই, নৈতিক বলের অভাবই তাহার প্রধান কারণ", ..."পরিতৃপ্তি যে সুখে নয়, কঠোর আত্মসংযমে বায়রণ ও মধুসূদন উভয়ের কেহই তাহা জানিতেন না, পরিতৃপ্তি তাঁহাদের ভাগ্যে মিলিবে কেন ?"[১৮]

বংশগতি-তত্ত্বের অনুসরণে যোগীন্দ্রনাথ মধুসূদনের চরিত্রে অসংযম ও স্বেচ্ছাচারিতার উৎস নির্দেশ করেছেন মূলতঃ তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্তের চরিত্রে। আর হৃদয়ের কোমলতা ও কাব্যানুরাগ তিনি মায়ের কাছ থেকে শৈশবেই লাভ করেন। মধুসূদন কপোতাক্ষ তীরে বাস করলে অর্থাৎ হিন্দুকলেজ থেকে বহু দূরে সাগরদাঁড়িতে থাকলে কোনো কালে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন হতেন না। মনে রাখতে হবে মধুসূদনের চিত্তের বিকাশোন্মুখ পর্ব কেটেছে হিন্দুকলেজ ও বিশপস্ কলেজে। স্বভাবতঃই যোগীন্দ্রনাথ ঐ পর্বের আলোচনায় (১৮৩৭-৪০) 'Life and Times'-এর রীতিতে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, 'যে কোন প্রকার উন্নতিই হউক, প্রধানতঃ হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের দ্বারা হইয়াছিল'। সেজন্য রাজনীতিতে রামগোপাল ঘোষ এবং কাব্য-সাহিত্যে মধুসূদনকে সমপর্যায়ভুক্ত বলে তিনি মনে করেছেন। কাজেই তাঁর মতে "কাব্যে হউক বা চরিত্রে হউক মধুসূদনকে বুঝিতে হইলে হিন্দুকলেজীয় শিক্ষার দোষগুণ এবং তৎকালীন ইংরাজী শিক্ষিত সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করা

আবশ্যক।" সেই যুগধর্ম বা spirit of the age-এর ঐতিহাসিক পর্যালোচনা তিনি করেছেন। 'ইয়ংবেঙ্গল'দের তীব্র সমালোচনাও করেছেন। তাঁর মতে এই হিন্দুকলেজে একদিকে বায়রণ-অধ্যয়ন অপরদিকে রিচার্ডসনের অধ্যাপনা উভয়ের দুরন্ত প্রভাবে 'হতভাগ্য কবি চিরজীবনের জন্য দুর্নীতির নিবিড় অন্ধকারময় গহ্বরে নিপতিত হইলেন।'

মধুসূদন চরিত্রে ছাত্রজীবনে একদিকে লেখক লক্ষ করেছেন 'উচ্ছৃঙ্খল, অসংযতেন্দ্রিয়, অমিতব্যয়ী, বিলাসী, ধর্মনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন'-রূপ অপরদিকে 'অধ্যয়নশীল, কাব্যানুরাগী, প্রেমপিপাসু, পরদুঃখকাতর, উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর'-রূপ এই দুটি বিপরীত বৃত্তির মিশ্রণ ঘটায় ফলেই মধুসূদনের চরিত্র বিস্ময়কর ও অসাধারণ হতে পেরেছে।

মধুসূদনের জীবনের রূপটাই নাটকীয়। নানা অঙ্কবিধৃত রোমান্টিক ট্রাজিডির মতোই তাঁর জীবন, ট্রাজিক 'হিরোর' মতই তাঁর করুণ পরিসমাপ্তি। যোগীন্দ্রনাথ মধুসূদনের জীবন-পর্বগুলিকে সেইভাবেই ভাগ করে দেখিয়েছেন। কিন্তু মধুসূদন দত্তের জীবন যে জন্য পাঠকের কাছে বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও সহবেদনার বস্তু, তিনি বারবার সেই দিকগুলিকেই আক্রমণ করেছেন। ভিক্টোরিয়ান নীতিবাদ, ব্রাহ্মসুলভ পিউরিটান দৃষ্টি ও এমার্সনের 'self-reliance' তত্ত্বকে তিনি অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে মধুসূদন যদি স্বেচ্ছাচারী, অহংকারী, বিলাসপ্রিয়, উদ্ধত, মদ্যপায়ী, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী, খ্রীষ্টান মহিলার পাণিগ্রহীতা, অপব্যয়ী বা নৈতিক-দুর্বল না হতেন তাহলে তিনি সুখে, শান্তিতে, খ্যাতি-সম্মানে কালযাপন করতে পারতেন! কিন্তু তাহলে কি আর তিনি রঙ্গলাল বা হেমচন্দ্র থেকে পৃথক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কিছু হতেন? রাজনারায়ণ বসু মধুসূদনের সহপাঠী ও সুহৃদ্ ছিলেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন 'মধুর আত্মশ্লাঘা কিছু অধিক পরিমাণে ছিল'। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদনের নব-নব সৃষ্টি, তাঁর নাটক, মহাকাব্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দ সবই সেই আত্মশ্লাঘাজাত। আত্মশ্লাঘা তাঁর প্রতিভা-স্ফুরণের অনিবার্য বহ্নি। জীবনচরিত লেখকের পক্ষে যোগীন্দ্রনাথ বসুর ধরনের 'আচার্য-পদ' গ্রহণ কাম্য নয়। বায়রণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সেজন্য হার্বার্ট রীড সতর্ক করে দিয়েছেন "it is necessary to guard against the importation of moral judgements into a literary context।"[১৯] তবে যোগীন্দ্রনাথ

যে মধুসূদনের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন, তার মূলে কিন্তু মধুসূদনের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা। অন্তর দিয়ে ভালো না বাসলে অবিস্মরণীয় প্রতিভার অধিকারী মধুসূদনের জীবনের করুণ পরিণতির জন্য দীর্ঘশ্বাস মোচন করা যায় না, সহবেদনার অশ্রু বর্ষিত হয় না।

যোগীন্দ্রনাথ মধুসূদনের চরিতালোচনায় তাঁর কাব্য-সাধনার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি 'কবি শ্রীমধুসূদন'। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জাতীয় পতাকায় 'শ্রীমধুসূদন' নাম লিখে দিতে বলেছিলেন। কাজেই মধুসূদনের চরিত-বর্ণনায় তাঁর রচিত কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা করা প্রধান কর্তব্য। কবির কাব্যে কবিমানসের স্বচ্ছ প্রতিফলন ঘটে। যোগীন্দ্রনাথ ঠিকই লিখেছেন :

> "গ্রন্থই প্রকৃতপ্রস্তাবে গ্রন্থকারের জীবন, মধুসূদনের জীবনের ঘটনাবলী হইতে তাঁহার গ্রন্থসমূহের ইতিহাস বিযুক্ত করিলে তাহাতে আর কিছু থাকে না। সেইজন্য মধুসূদনের এই জীবনচরিতে তাঁহার পারিবারিক জীবনের ঘটনাবলীর ন্যায় তাঁহার সাহিত্যগত জীবনের ঘটনাও আমরা গ্রথিত করিয়াছি।"

যোগীন্দ্রনাথ তাঁর মধুসূদনের জীবনী রচনায় মধুসূদন কর্তৃক লিখিত ও মধুসূদনকে লিখিত পত্রাবলীর যথোপযুক্ত ব্যবহার করেছেন। মধুসূদনের ব্যক্তি-জীবন ও কবি-জীবনের প্রকৃত ইতিহাস এই পত্রাবলীর মধ্যে নিহিত। যোগীন্দ্রনাথ পত্রগুলিকে শুধু মুদ্রিত করেননি, সেই পত্রগুলির বক্তব্য দ্বারা মধুসূদন-মূর্তিতে প্রাণসঞ্চার করেছেন। যোগীন্দ্রনাথ নিজে সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন, মধুসূদনের স্বল্পবৃত্ত নাটকীয় সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের ট্র্যাজিডি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। মাদ্রাজ, কলিকাতা, প্যারিস, লাউডন স্ট্রীট, উত্তরপাড়া লাইব্রেরী, প্রেসিডেন্সি জেনারল হাসপাতাল—মধুসূদনের জীবনের এই পর্ব-পরিক্রমায় তিনি শিল্পীর নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। শেলি বা বায়রণের জীবনের মতো মধুসূদনের জীবন বিচিত্র নাটকীয় ঘটনা-সংঘাতে পরিপূর্ণ। ম্যাকবেথের মতো নিষ্ঠুর-করুণ। তাঁর জীবন রেণেসাঁস-রোমান্টিক যুগের যথার্থ প্রতিনিধি-মূলক। সেই জীবনের ঘটনাবলীর উপস্থাপনায় যোগীন্দ্রনাথের মধ্যে বস্‌ওয়েল-সুলভ 'dramatic sense'-এর পরিচয় মেলে।

মধুসূদনের উত্তরপাড়ায় অবস্থানকালীন দারিদ্র ও রোগাক্রান্ত অবস্থার চিত্র যোগীন্দ্রনাথ গভীর বেদনার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। আর হেনরিয়েটার মৃত্যুর কালো রাত্রে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পরিবেশে মৃত্যুর প্রতীক্ষমান মধুসূদনের ভাঙা গলায় ম্যাকবেথের অন্তিম দৃশ্যের 'Tomorrow and Tomorrow'র গম্ভীর আবৃত্তি, নিজের সন্তানদের জন্য মনোমোহন ঘোষের কাছে কাতর আবেদনের যে চিত্র যোগীন্দ্রনাথ এঁকেছেন, যে রুদ্ধশ্বাস বেদনার পরিমণ্ডল রচনা করেছেন, সঙ্গীতের শেষ নিখাদের সঙ্গেই তার তুলনা করা চলে। বাংলা জীবনীকে 'work of art' পর্যায়ে উন্নীত করেছেন যোগীন্দ্রনাথ তাই যতই 'didactic' ও 'moral tone' এ গ্রন্থের থাকুক, যতই লেখক বলুন, "মধুসূদনের জীবনের ইতিহাস অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ" বা "যিনি যে দণ্ডের উপযুক্ত বিধাতা তাঁহার প্রতি সেইরূপ দণ্ডবিধান করিয়া তাহাকে উদ্বোধিত করেন। ভগবানের অবাধ সন্তান মধুসূদন, এতদিন তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, তাই সেই ন্যায়বানপ্রভু, তাঁহার প্রতি অতি কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করিয়া এই শেষ মুহূর্তে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিলেন।"—তবুও মধুসূদন দত্তের 'জীবন্ত' রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। মধুসূদনের ছাত্রজীবনের বন্ধু পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত ভোলানাথ চন্দ্র বইখানি পড়ে গৌরদাস বসাককে সেকথা লিখেছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩২১-২৪ সালে প্রকাশিত হয়। পরে ১৩২৭ সালে (১৯২০) গ্রন্থাকারে বার হয়। মধুভাবনা রচনায় যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতো কোনো নৈতিক (moral) মানদণ্ড তিনি আরোপ করেন নি। তিনি মধুসূদনের জীবনের বৈচিত্র্যে ও ঐশ্বর্যে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়েছিলেন। বস্‌ওয়েল জনসনকে তার 'Hero' রূপে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, নগেন্দ্রনাথ তার গ্রন্থসমাপ্তিতে লিখেছেন, "আমরা মধুস্মৃতি সমাপ্ত করিলাম। আশা করি ইহাতে গৌড়গৃহ মধুময় হইবে।" যেখানে যোগীন্দ্রনাথ লেখেন "অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে চরিত্র ও নীতির বল থাকিলে তাঁহার জীবন যে কেবল স্বদেশীয়গণের গৌরবস্থল হইত, তাহা নয়, তাঁহার নিজের পক্ষেও শান্তিময় হইত"—সেখানে নগেন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিতভাবে তার প্রতিবাদ জানান:

"মহা-সমুদ্রেই বাড়বাগ্নি জ্বলে, গগনস্পর্শী মহামহীরুহে বা দুর্গচূড়েই বজ্রপাত হয়; হিমাদ্রিবক্ষেই দুরন্ত ঝটিকা তাণ্ডব নৃত্য করে। মহারণ্যেই

দাবানল প্রজ্জলিত হইয়া থাকে, মহাকাশেই মহাগর্জন অনুভূত হয়,— মধুসূদনের ন্যায় মহাপুরুষের মহাভাগ্যেই বিধাতার বিচিত্র লীলা প্রকটিত।”

নগেন্দ্রনাথের তথ্যসংকলন দেখলে বিস্মিত হতে হয়। বস্‌ওয়েল জনসন্‌-চরিত রচনায় তথ্য সংগ্রহে ও পূর্ব সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই করবার জন্য যে দুরূহ শ্রম করেছেন নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁরই প্রায় সমধর্মী। বস্‌ওয়েলের একটি উক্তি ‘that minute particulars are frequently characteristic’, নগেন্দ্রনাথ নিষ্ঠার সঙ্গে তাকে অনুসরণ করেছেন, তাঁর গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য সেখানেই।

নগেন্দ্রনাথ যোগীন্দ্রনাথের কয়েকটি তথ্যের পুনর্বিচারও করেছেন। দেখিয়েছেন মধুসূদনের মাতা সর্বদা শান্তস্বভাবা ক্ষমাশীলা ছিলেন না (পৃঃ ৪), উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে থাকাকালীন মধুসূদনের পুত্রদের “পর্যুসিত অন্ন” ভোজনের কাহিনী সত্য নয়। (পৃঃ ৫৪৫) কিন্তু তিনি একটি মারাত্মক মিথ্যাকে ইতিহাসের মর্যাদা দিয়েছেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের দ্বিতীয়া কন্যা দেবকীকে বিবাহ করবার আকাঙ্ক্ষায় মধুসূদন ১৮৪৩ সালে খ্রীষ্টান হয়েছিলেন, এ তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। ঐ সময়ে দেবকীর জন্ম হয়েছিল কিনা সন্দেহ বিবাহ তো দূরের কথা।

মধুসূদনের এই আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত প্রথম দেন মধুসূদনের সহপাঠী গৌরদাস বসাক। তারপর যোগীন্দ্রনাথ বসু লেখেন ‘পরিচিতা কোন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিনী বালিকার রূপগুণের’ কথা। সেখানে কারও নাম নেই। নগেন্দ্রনাথ যোগীন্দ্রনাথের ন্যায় পণ্ডিত বা শিল্পী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর গ্রন্থ মধুসূদন সম্পর্কিত সর্বপ্রকার তথ্যের রত্নখনি। তিনি কোনো didactic বা moral tone আরোপ না করায় মধুসূদনের জীবনকথা শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির মিশ্রণে হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুরু ‘শব্দস্তোম মহানিধি’ (১৮৬৯-৭০) ‘বাচস্পত্যভিধান’ (১৮৭৩-৮৪) প্রণেতা তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮০৬-৮৫) সম্পর্কে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছিলেন ‘তিনি একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী এরূপ আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ’।[১৮] এই তারানাথের জীবনবৃত্তান্ত লেখেন শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও তারাধন তর্কভূষণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মার্শাল সাহেব সংস্কৃত কলেজে ১৮৪৫ সালে অধ্যাপক পদে নিয়োগের প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর তাঁর গুরুকে ঐ পদে দেবার জন্য

অনুরোধ জানান এবং তারানাথ নিযুক্ত হন। কিন্তু শুধু শাস্ত্র চর্চা, পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপনার জন্য তাঁর জীবন চিত্তাকর্ষক নয়। তিনি যেমন 'শব্দার্থ রত্ন' ও 'বাক্যমঞ্জরী' (১৮৫১) বা পূর্বোক্ত মহাগ্রন্থ দুখানি প্রণয়ন করেন, তেমনি বিলিতি সুতোর ব্যাবসা, কাপড় তৈরীর কুঠি, সারা ভারতে কাপড় পাঠিয়ে ও নেপাল থেকে শালকাঠ আনিয়ে বাংলা দেশে বিক্রয় ব্যবস্থায় তিনি অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। অধ্যাপক-ব্যবসায়ীর দুর্লভ মিশ্রণ ঘটাতেই তাঁর জীবন-কাহিনী বেশ কৌতূহলোদ্দীপক হয়েছে। শুধু কাপড় বা কাঠের ব্যাবসা নয়, তিনি বীরভূমে জমি ইজারা নিয়ে চাষ-বাস করেন, পাঁচশো গোরু পোষেন, দুধ-ঘি বিক্রয় করেন। শাল-আলোয়ানের কুঠিও করেছিলেন কিন্তু ১৮৬২ সালে ব্যাবসায় খুব ক্ষতি হয়।[১৯] অন্যদিকে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশেব মতো তারানাথ কবির দলের গান বাঁধতেন, রন্ধন-বিদ্যায় পটু ছিলেন। আবার হাইকোর্ট তাঁর মত নিতেন, বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহদানে তাঁর সমর্থন খোঁজেন। এমনি বিচিত্র চরিত্রের মানুষ ছিলেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি। শম্ভুচন্দ্র আদ্য-মধ্য-উত্তর চরিত এই তিন ভাগে তারানাথেব জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর কাছে এই জীবনটি কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল বলেই তিনি তারানাথের জীবনী রচনা করেছিলেন। তারানাথের জ্ঞাতিভ্রাতা তাবাধন তর্কভূষণ লিখিত তর্কবাচস্পতির জীবনী পড়লে দেখা যায় তিনি তিনবার বিবাহ করেন, স্বর্ণালঙ্কারের ব্যাবসাও তাঁর ছিল। ব্যবসায়ে যখন ক্ষতি হল তখন "ঋণগ্রস্ত হওয়াতে তাঁহার একটি মহৎ দোষ জন্মিয়াছিল যে উত্তমর্ণগণ আপন প্রাপ্য আদায়ের নিমিত্ত তাঁহাব আবাসে আসিলে তিনি হাতে কিছু না থাকিলে কখন কখন বাটীর ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়া আমাদের প্রমুখাৎ বহিঃস্থ উত্তমর্ণকে বলিয়া পাঠাইতেন 'যে তিনি বাটীতে নাই।'

সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরের চাপে তারানাথ বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত বিধবা বিবাহে মত দিয়েছিলেন, কন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেছিলেন। তবে অর্থ পেলেই তিনি 'ব্যবস্থা' দিতেন, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য নয়।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্রের মত তিনি যুগনায়ক নন, তিনি একজন প্রখ্যাত শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত দিকের ইতিহাস তাঁর ব্যবসায়ী জীবন—তাঁর দম্ভ, অশিষ্টাচার, অর্থলোভ সব মিলে তাঁর জীবন বেশ চমকপ্রদ। আলোচ্য যুগে বাংলা চরিত-সাহিত্য কত বিভিন্ন বৃত্তির ও চরিত্রের মানুষকে গ্রহণ করেছিল—তারানাথ

তর্কবাচস্পতির জীবনী তারই প্রমাণ। শম্ভুচন্দ্র ও তারাধন দুজনেই তাঁকে সহজ "মানুষ" রূপে গড়েছেন, সেখানেই তাঁদের বইয়ের মূল্য।

বাংলা দেশে পজিটিভিস্ট-চিন্তার ইতিহাসে অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের (১৮৩২-৭৪) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু সান্ন্যাল দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর সহচর ছিলেন। তিনি ১৮৮৩ সালে ইংরেজিতে দ্বারকানাথের জীবনী প্রকাশ করেন। তিনি দ্বারকানাথের জন্ম, বাল্য-কৈশোর, শিক্ষা, ফরাসী ভাষা চর্চা, কঁতের গ্রন্থের অনুবাদ, রিচার্ড কন্‌গ্রিভের সঙ্গে পত্রালাপ, বাংলা দেশে বিলেতের মতো 'পজিটিভিস্ট গোষ্ঠী' গঠন প্রয়াস, তাঁর আইন ব্যবসায়, জজীয়তি প্রভৃতি ঘটনা পর্বে-পর্বে ভাগ করে বর্ণনা করেছেন।[২০] হুগলী কলেজে অধ্যয়নকালে (১৮৫০-৫৪) তিনি তার রচনায় বেকন, নিউটন ও তুর্গো থেকে মতামত উৎকলন করেন। সেখানে তিনি Age of Reason-এর যোগ্য প্রতিনিধি। সেই সঙ্গে তাঁর স্বাধীন-বুদ্ধির পরিচয় পাই যখন তিনি বেকনের সমালোচনাও করেন।[২১] এই বেকন-চর্চার মধ্যেই তাঁর পরবর্তী জীবনে 'প্রত্যক্ষবাদ' বরণের সূচনা রয়েছে। ফ্রাঙ্কো-জর্মান যুদ্ধের সময় (১৮৭০) ফ্রান্সের পরাজয়ে দ্বারকানাথের অশ্রুবিসর্জন ঘটনাটি রামমোহনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলাদেশে পজিটিভিস্ট-চিন্তার প্রসার তথা দ্বারকানাথের ভূমিকা চরিতগ্রন্থখানিতে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। দ্বারকানাথের পানাসক্তি দোষ তিনি যেমন বর্ণনা করেছেন তেমনি তাঁর স্বাধীনচিত্ততা, উদারতার প্রসঙ্গকেও উচিত মূল্য দিয়েছেন। দ্বারকানাথ মিত্রের শ্রেষ্ঠ জীবনী রূপে দীনবন্ধুর গ্রন্থ আদরনীয়। কন্‌গ্রিভের সঙ্গে পত্র-বিনিময় অধ্যায়টি এ গ্রন্থের অমূল্য সম্পদ।

কালীপ্রসন্ন দত্ত বাংলায় দ্বারকানাথের জীবনী লেখেন ১৮৯২ সালে। তিনি দ্বারকানাথের জীবনচরিত শিক্ষাপ্রদ হতে পারে মনে করেছেন। সেজন্য আখ্যাপত্রে উৎকলন করেছেন "Education is received not only from books, but from life" এবং ভূমিকায় জানান "দ্বারকানাথে নিন্দা ও দুর্নামের অংশ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে জীবন চরিত লিখিবার পক্ষে, সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিবার পক্ষে দ্বারকানাথ অতি উপযুক্ত পাত্র।" কালীপ্রসন্ন দ্বারকানাথের নিরহংকার মনোভাব, সৌজন্য, সাধারণ বেশভূষায় আগ্রহ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য বিজড়িত জীবনের নানা ছোটখাট ঘটনার উল্লেখ

করেছেন, সেগুলির মধ্য দিয়ে দ্বারকানাথ আমাদের 'কাছের মানুষ' হয়ে ওঠেন। মধুসূদনের কন্যা শর্মিষ্ঠার বিবাহে অর্থসাহায্য, সাংসারিক ব্যয় বাবদ হেনরিয়েটার হাতে গোপনে দুশো টাকা দিয়ে আসা, বিজ্ঞান-চর্চায় আগ্রহ ও সেজন্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে অর্থদান যেমন তাঁর বন্ধুবৎসল, উদার ও প্রগতিশীল মনোভাবকে প্রকাশ করে, তেমনি দু-একটি কৌতুককর ঘটনা তাঁর সহজ রূপটিকে ধরিয়ে দেয় :

> "দ্বারকানাথের একটি অভ্যাস ছিল, বক্তৃতাকালে পেন কলম হস্তে লইয়া উভয় হস্তে ক্রমাগত সেই কলমটি মোচড়াইতেন। এইরূপে—যাই কলমটি একেবারে দুইখণ্ড হইয়া যাইত অমনি দ্বারকানাথের বক্তৃতা বন্ধ হইত, আর বলিতে পারিতেন না। এই জন্য বক্তৃতাকালে ইহার পশ্চাতে একজন লোক একগোছা কলম লইয়া বসিয়া থাকিত। যাই একটি কলম ভাঙ্গিয়া যাইত অমনি খেই হারাইবার ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কলম হাতে গুঁজিয়া দিত।"

কালীপ্রসন্ন দ্বারকানাথের ভক্ত হলেও, কৎ-দর্শন সম্পর্কে শ্রদ্ধাভরে লিখলেও দ্বারকানাথের মধ্যে প্রচলিত-হিন্দুধর্মে অনুরাগের অভাব দেখে এবং সুরাপান ও মাংসাহারে আসক্তি ও হিন্দু আচারে না চলার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বুঝতে পারা যায় কেন 'নব্যহিন্দু' দলের 'সাধারণী' পত্রিকার অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই জীবন চরিতের উপক্রমণিকায় লেখেন :

> "পাশ্চাত্য শিক্ষার সার—স্ব স্ব প্রাধান্য, আমাদিগের অনেককেই নিয়তি এইরূপ বিডম্বিত করিতেছে। যদি দ্বারকানাথ মিত্রের এই জীবন দশজন যুবককেও এইরূপ জ্ঞানবিডম্বনা হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারে।"

তাই দেখি কালীপ্রসন্ন খুব খুশি হয়ে লিখেছেন "জীবনের শেষ অবস্থায় হিন্দুধর্মের প্রতি দ্বারকানাথের স্পষ্ট অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল।" কিন্তু কালীপ্রসন্ন এর পিছনে যে সমাজতাত্ত্বিক দিকটি ছিল তার ব্যাখ্যা দেননি। যোগীন্দ্রনাথও মধুসূদন দত্তের রচিত রচনায় জীবনের শেষ মুহূর্তে মধুসূদনের অনুতাপ প্রকাশে ও ঈশ্বর-সম্বোধনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নৈতিক ও আচারগত সংযম-অসংযমের প্রশ্ন জীবনীকারের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করলে ভালো জীবনী গড়ে ওঠে না। কালীপ্রসন্নের গ্রন্থের ত্রুটি সেখানেই।

জগদ্বন্ধু মৈত্রের 'প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী' ও বঙ্কবিহারী করের

'মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী' বই দুখানির মধ্যে প্রথম বইখানি পূর্ণাঙ্গ, কিছু অলৌকিকতা সত্ত্বেও তথ্যভূয়িষ্ঠ। লেখক বহুদিন গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে বাস করেছিলেন। তাঁর "শ্রীমুখ হইতে যাহা শ্রবণ" করেছিলেন এবং 'বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণ', সাময়িক পত্র, রচিত গ্রন্থাদি থেকে তিনি ঘটনা সংগ্রহ করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, "কাহারও জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার জীবনের যথার্থ ঘটনাবলী পরিহার করা চরিতাখ্যায়কের সর্বথা অকর্তব্য।" তবে জগদ্বন্ধুর কেশবচন্দ্র সেনপন্থীদের বিজয়কৃষ্ণ সম্পর্কিত কয়েকটি তথ্যের বিরোধিতা করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। 'মধ্যখণ্ডে' গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে কেশবচন্দ্রের প্রভাবকে তিনি অস্বীকার করেননি। 'পাপীর দুরবস্থা ও ঈশ্বরের অসীম দয়া' অনুভব এবং তাঁর "পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই। পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়া লুটাই" সংগীতের কথা জীবনীকার বর্ণনা করেছেন। গানটি পড়লেই বোঝা যায় এর মধ্যের 'পাপতত্ত্ব' 'ঈশ্বরের করুণা' 'পাপীর মুক্তি' প্রভৃতি খৃষ্টভক্ত কেশবচন্দ্রের মতবাদের প্রভাব। অন্যদিকে কেশবচন্দ্র যে বিজয়কৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রভাবে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে' চৈতন্য-ভক্তি, নগর-সংকীর্তন, নাম-কীর্তনে রত হয়েছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁর কেশবচন্দ্রের জীবনীতে সে-বিষয় সুস্পষ্ট রূপে দেখিয়েছেন। জগদ্বন্ধু এই সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা লিখেছেন :

> "একদিন কেশববাবু গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন, 'গোঁসাই আমার ভিতরে শ্রীচৈতন্যের ভাব (spirit) এবং তোমার ভিতরে শ্রীঅদ্বৈতের ভাব (spirit) বিদ্যমান। কেশববাবুর এই কথা গোস্বামী মহাশয়ের ভাল লাগিল না।"

জগদ্বন্ধু পরে জানিয়েছেন কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটার পর 'নববিধান' দল কর্তৃক একবার তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছিল। তিনি জানিয়েছেন এই ঘটনাটি তিনি 'গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যেরূপ শ্রবণ' করেছিলেন, 'অবিকল' সেটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বর্ণনায় বাড়াবাড়ি আছে কিন্তু একেবারে ভিত্তিহীন না হতেও পারে। কেননা, কেশবচন্দ্রের বিশ্বস্ত অনুগামী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তো স্বীকার করেছেন কেশবচন্দ্র একবার তাঁর অনুচরদের আদেশ দিয়েছিলেন 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'-ভুক্ত এক ব্যক্তির গৃহ আক্রমণ করতে।[২২] এই ঘটনার ঐতিহাসিক কিছু মূল্য আছে। বিজয়কৃষ্ণের 'আশাবতীর

উপাখ্যান' বইখানির সুন্দর আলোচনা করে গোস্বামী মহাশয়ই যে 'আশাবতী', লেখক নিপুণ বিশ্লেষণে দেখিয়ে দিয়েছেন। বঙ্কবিহারী করের বইখানি জগদ্বন্ধু মৈত্রের রচনার মত নয়। 'দলগত' (partisan) কোনো মনোভাব বইখানিতে নেই। রবীন্দ্রনাথ সেজন্য এই বইখানির প্রশংসা করেছিলেন।

রামগোপাল সান্ন্যালের 'General Biography of Bengal Celebrities' অথবা 'Reminiscences and Anecdotes of Greatmen of India' বই দুখানি তথ্য সংকলনের দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান। গ্রন্থদ্বয়ে আহৃত তথ্যপুঞ্জের সহায়ে বহু চরিতগ্রন্থ রচিত হতে পারে। সেদিক থেকে এগুলি আকরগ্রন্থ স্বরূপ। তাঁর 'হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী' (১৮৮৭) হরিশ সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। তিনি সাংবাদিক সুলভ তথ্য-সংগ্রহে ও-সংকলনে দক্ষ ছিলেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টি তাঁর ছিল। হরিশের মধ্যে 'দেশহিতৈষিতা'র উজ্জ্বল আদর্শ তিনি দেখেছিলেন এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই হরিশের জীবন-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল-আন্দোলন সম্পর্কে হিন্দু পেট্রিয়টের তেজস্বী সম্পাদক রূপে হরিশের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। লেখক হরিশের কার্যাবলীর ও চরিত্রের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। হরিশের চরিত্রের দোষত্রুটিগুলিকে চেপে রাখেন নি। হরিশ সম্পর্কিত বহু টুকরো গল্প বা 'anecdotes'-যোজনা এই গ্রন্থের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর 'কৃষ্ণদাস পালের জীবনী'তেও (১৮৯০) বহু anecdote সন্নিবিষ্ট হতে দেখা যায়। তিনি হরিশ ও কৃষ্ণদাসের জীবনী রচনায় সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস ও বিভিন্ন আন্দোলনের পরিচয় দিয়েছেন। কেননা উভয়েই ছিলেন সাংবাদিক, মুখ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।

পণ্ডিত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় তাঁর অগ্রজ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনী (১৮৯২) লেখেন।[২৩] বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী রচনাকালে (১৮৯৩) বইখানির উল্লেখ করেছেন। কেননা রামাক্ষয় তাঁর গ্রন্থে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 'প্রেমচাঁদ' নামে উল্লেখ করায় বঙ্কিম সেই রীতিকে সমর্থন করেন এবং নিজেও সেই রীতিতে তাঁর মধ্যমাগ্রজকে 'সঞ্জীবচন্দ্র' নামে সম্বোধন করেন। রামাক্ষয় জানিয়েছেন প্রেমচাঁদ সংস্কৃতে সুকবি ছিলেন আবার তিনি কবি ও তর্জার দলেও গান বেঁধে দিতেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতো। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে নানা তথ্য এই গ্রন্থে আছে।[২৪] প্রেমচাঁদের জন্মমৃত্যু-বিধৃত জীবন, তাঁর প্রকৃতি

ও ধর্মবিশ্বাস বেশ অবজেক্টিভ রীতিতে বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থের ভাষাটি বিদ্যাসাগরের গদ্যানুসারী।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা, ইংরেজিতে লিখেছেন 'Men I have seen' এবং বাংলায় 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং নিজের 'আত্মচরিত' (১৯১৮)। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য, একদিকে উনবিংশ শতকের বাংলার রেণেসাঁসের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপস্থাপনা অপরদিকে ঐ শতকের বিশিষ্ট মানুষদের জীবনবৃত্তান্ত। লেথব্রিজ সাহেব বইটির ইংরেজি সংস্করণের সংগতভাবে নাম দেন 'Ramtanu Lahiri. A History of the Renaissance in Bengal.' প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় শিবনাথ লেখেন, "তাঁহার [রামতনু] জীবনচরিত লিখিতে গেলে বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ ইতিবৃত্তকে বাদ দিয়া লেখা যায় না। তাই বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ—সামাজিক ইতিবৃত্তের বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতে হইল।" দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯০৯) ভূমিকায় তিনি যোগ করেন, "যে সকল মানুষ জন্মিয়া বঙ্গদেশকে লোকচক্ষে উন্নত করিয়াছেন তাহাদের জীবনের স্থূল স্থূল কথা রাখিয়া গেলাম।" রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের (১৮১৩-৯৮) জীবনচরিতকে উপলক্ষ করে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের উনবিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস রচনা করেছেন।

শিবনাথ (১৮৪৭-১৯১৯) যাঁদের কথা লিখেছেন তাঁরা অধিকাংশই তাঁর সমকালীন, কয়েকজন পূর্বজ। বাইশ বছর বয়সে (১৮৬৯) কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরে' তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তার পূর্বে তিনি ১৮৫৬ সালে সংস্কৃত কলেজে পড়তে আরম্ভ করেন তাঁর মাতুল 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাসায় থেকে। কাজেই বাংলাদেশের সামাজিক-ও ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের সমগ্র গুরুত্বপূর্ণ পর্বের তিনি পর্যবেক্ষক ও অংশভাক্। তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ কাল-পর্বের দর্শকমাত্র নন, তিনি এই যুগের একজন বিশিষ্ট নেতাও। দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রামতনু, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, আনন্দমোহন, মহেন্দ্রলাল প্রভৃতির সঙ্গে শুধু তিনি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন না। সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম-সংস্কারমূলক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সেজন্য এই গ্রন্থের শেষাংশ সম্পূর্ণভাবে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপূর্ণ। বিংশ শতকের প্রথম পাদে

দাঁড়িয়ে তিনি সমগ্র উনবিংশ শতকের ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন। ঐতিহাসিকের মতোই ইতিবৃত্ত গড়বার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতো সত্যসন্ধ শিক্ষাব্রতী বাংলাদেশে খুব বেশি জন্মগ্রহণ করেন নি। জনসন্ বলেছিলেন 'More Respect to be paid to Knowledge, to Virtue, to Truth'. শিবনাথের রচনায় তার প্রত্যক্ষ রূপ দৃষ্ট হবে। তিনি ব্রাহ্মধর্মের 'সত্য-দর্শন'কে মনে-প্রাণে-কর্মে-বাক্যে গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুকলেজে ডিরোজিওর যুগে 'সত্যবাদী' আর 'হিন্দু কলেজের ছাত্র' সমার্থক ছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র শিবনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্র, তেজস্বী হরানন্দ ভট্টাচার্যের পুত্র ও উদার দ্বারকানাথের ভাগিনেয়। এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের জীবনে সত্যের সাধক। শিবনাথ তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন 'আমি শৈশবাবধি বিদ্যাসাগরের চেলা'—সত্যের পথে বিদ্যাসাগরের মতোই তাঁর সংগ্রামের জীবন। যাকে একবার সত্য বলে জেনেছেন তাকে প্রকাশ করতে কখনো কুণ্ঠিত হন নি, শত নির্যাতনেও তাকে পরিত্যাগ করেন নি। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থখানি সত্যনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিশ্বাসী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে রচিত। তবে শুধু ইতিহাসের তথ্যের জন্য নয়, তার সঙ্গে সেই ঐতিহাসিক যুগের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ লক্ষণীয়। সেই শতবর্ষ ব্যাপী ইতিহাসের পটভূমিতে সারি সারি যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন নিজেদের চিন্তা, কর্ম ও সাধনার বৈশিষ্ট্যে—তাঁদের চরিত্র-চিত্র সংক্ষেপে এঁকেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের চতুর্থ-ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে (পৃঃ ৬৯—৩১০) অর্থাৎ হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল (১৮১৭) থেকে 'সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা (১৮৭৮) ও তার নেতৃবৃন্দের কাল পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে। শিবনাথ প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ছিলেন বলেই ডিরোজিওর যুগকে ও তাঁর শিষ্যদের কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের মত নিন্দা করেন নি। তিনি ডিরোজিও-ভক্তদের "নাস্তিক ও সমাজ বিপ্লবেচ্ছু যথেচ্ছাচারী" আখ্যা দানের নিন্দা করেছেন। যে সাধুচরিত্র রামতনু লাহিড়ীর জীবনচরিত রচনা তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল, তিনিই একনিষ্ঠ ডিরোজিও-ভক্ত। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য উনবিংশ শতককে সামাজিক অভ্যুত্থান ও অবনমনের দিক থেকে কয়েকটি কাল-পর্বে বিভক্ত করা। ১৮২৫-৪৫ পর্বকে 'বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল' ও ১৮৫৬-৬১ পর্বকে 'বঙ্গ সমাজের মাহেন্দ্রক্ষণ' বলে তিনি নির্দেশ করেছেন। তেমনি ১৮৭০-৭৯ পর্বকে 'ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব হ্রাস ও হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সূচনা' নামে চিহ্নিত করেছেন।

তাঁর এই 'periodisation' বা 'পর্ব-চিহ্নিতকরণ' ঐতিহাসিক দৃষ্টির সাক্ষ্যবহ। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, তাঁর পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টি। যাঁদের চরিত্র-চিত্রণ এই গ্রন্থে আছে তাঁদের জীবনকথা রচনায় অন্ধভক্তি বা তীব্র বিদ্বেষ উভয়ই তিনি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, এর বর্ণনা ও ভাষার অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি। সেজন্য 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' শুধুমাত্র একখানি ঐতিহাসিক দলিল বা historical document রূপে নয়, শিল্পবস্তু বা 'work of art' রূপে বেঁচে থাকবে। শিবনাথ শাস্ত্রী সাময়িক পত্র-পত্রিকা, ডায়েরি, কথোপকথন, চরিত গ্রন্থ, স্মৃতিকথা প্রভৃতি, ইতিহাস ও চরিত রচনার অনিবার্য উপাদানগুলি সবই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর রচনাগুণে সেগুলি 'Compilation' মাত্র না হয়ে 'Composition' হয়েছে। জীবনচরিত পাঠের উপযোগিতা সম্পর্কে এমার্‌সন লিখেছেন :

> "True it furnishes the memory with a portrait gallery of interesting faces. True it makes history and philosophy and poetry vivid with the personalities of the men to whom we owe great causes, great systems, great thoughts."

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' সম্পর্কে এই মন্তব্য খুবই উপযোগী।

রামচন্দ্র ঘোষ ও দুর্গাদাস লাহিড়ী রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮১৩-৮৫) জীবনী লিখেছেন যথাক্রমে ইংরেজীতে ও বাংলায়। দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'আদর্শ চরিত্র কৃষ্ণমোহন' গ্রন্থের তুলনায় রামচন্দ্র ঘোষের 'Biographical Sketch of Rev. K. M. Banerjea' চরিত গ্রন্থ হিসাবে অধিকতর প্রামাণিক। তার প্রধান কারণ রামচন্দ্র কৃষ্ণমোহনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন এবং তিনি দাবি করেছেন এই গ্রন্থের অধিকাংশ তথ্য তিনি স্বয়ং কৃষ্ণমোহনের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কৃষ্ণমোহন লেখকের পরম ভক্তির পাত্র এবং তিনি জানিয়েছেন সে-ভক্তি এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর টলেনি। ভক্তের লেখা চরিতগ্রন্থ হলেও এ জীবনীখানি চরিতামৃত হয়নি।

কৃষ্ণমোহনের জীবনের প্রথম পর্ব অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের (১৮৩২) পূর্ব পর্যন্ত জীবনেতিহাস বর্ণনা তথ্যবহুল, অতিরঞ্জনমুক্ত। কৃষ্ণমোহন যে-যুগে তাঁর কৈশোর ও যৌবনের প্রথম প্রহর কাটিয়েছেন সেই কাল-পর্ব আমাদের

জাতীয় জীবনে সমুদ্র-মন্থনের কাল। তার ফলে অমৃত ও গরল দুই-ই উঠেছিল। এই সময়ে পাদ্রী ডাফের আগমন, ডিরোজিওর অধ্যাপনা ও কর্মচ্যুতি ঘটে। রামচন্দ্র ডিরোজিওর প্রভাবের কথা ঐতিহাসিক সততার সঙ্গে বিবৃত করেছেন। কৃষ্ণমোহনের পটলডাঙার স্কুল থেকে পদচ্যুতি, 'এন্‌কোয়ারার' পত্রিকায় হাউস্ অব কমন্সে উত্থাপিত 'রিফর্ম বিলের' পক্ষে জ্বালাময়ী রচনা প্রকাশ, গো-হাড় নিক্ষেপ বৃত্তান্ত, কৃষ্ণমোহনের গৃহত্যাগ, 'The Persecuted' নাটক রচনার প্রসঙ্গ বিশ্বস্ততার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। হিন্দুকলেজের ছাত্র, ডিরোজিওর শিষ্য হিন্দুধর্মত্যাগী কৃষ্ণমোহন অসত্যের কাছে মাথা নিচু করেননি। এজন্য রামচন্দ্র কার্লাইলের 'হিরো'র আদর্শ মেনে নিয়ে 'Hero as Priest' অংশের লুথার ও নক্‌সের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের তুলনা করেছেন।[২৫]

কৃষ্ণমোহনের জীবনের দ্বিতীয় পর্বে (১৮৩৩-৮৫) লেখক সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হলেও এবং হিন্দু ধর্মাচারের বা হিন্দু ভাবের বিরুদ্ধে কিছু কিছু লিখলেও তিনি মনে-প্রাণে 'ভারতীয়' ছিলেন। মিশনরীদের মধ্যে সাদা ও কালো চামড়ার পার্থক্য তিনি বরদাস্ত করেননি, তার প্রতিবাদে তিনি 'উপদেশক' পদ (Canonry) ত্যাগ করেন। তিনি 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ', 'শ্রীনারদ পাঞ্চরাত্রং', 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'ভট্টিকাব্য' সম্পাদন করেন। তাঁর বাংলায় 'ষড়দর্শনসংবাদ' রচনা শুধু জ্ঞানচর্চার নিদর্শন নয়, দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয়বহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতায় সর্বদাই 'our Rishis', 'our nation' বলতে তিনি গর্ববোধ করতেন। এই প্রসঙ্গে ১৮৭০ সালের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন রামচন্দ্র। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পরিচালিত 'Indian Association for the Cultivation of Science'-এর এক অধিবেশনে কৃষ্ণমোহন বলেন: "কবে আমরা ভারতীয় হার্শেল, ভারতীয় নিউটন, ভারতীয় গ্যালিলিওদের দেখতে পাব।" এই দেশগর্বের বিশিষ্ট জ্বলন্ত উদাহরণ 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টে'র প্রতিবাদ জ্ঞাপন (১৮৭৮)। এর পূর্বেই তিনি জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান 'ইণ্ডিয়া লীগে'র সভাপতি হন। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের প্রতিবাদে ১৭ই এপ্রিল সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় যোগদানকারীদের গ্রেপ্তারের সম্ভাবনার কথা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু চিরস্বাধীন কৃষ্ণমোহন দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন 'Dare Government prosecute us?' ১৮৮৩ সালে তিনি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য 'জাতীয়

ফণ্ড' খোলার পক্ষপাতী হন, বলেন "It was a cause of my country and would I not join it ?"

রামচন্দ্র ঘোষের জীবনীতে বিশেষ করে কৃষ্ণমোহনের এই স্বাধীন-চিত্ত দেশপ্রেমিক রূপটি ফুটে উঠেছে। সহায়সম্বলহীন একটি যুবক গৃহ ও সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়ে নিজের তেজ ও শক্তিবলে উচ্চে উঠেছিলেন, স্বচিহ্নিত সেই যাত্রাপথ—রামচন্দ্র ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষা করে বর্ণনা করেছেন। চোদ্দ বছর বয়সে লেখক কৃষ্ণমোহনেব সঙ্গে পরিচিত হন এবং আজীবন তাঁব সাহচয লাভ করেছেন বস্‌ওয়েলের মতো। বচনাব দিক থেকেও বইখানি উপভোগ্য।

অন্যান্য জীবনচরিতের মধ্যে তিন খণ্ডে বিধৃত 'ভূদেব চরিত' গ্রন্থখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ভাগের 'নিবেদন' অংশে অনুরূপা দেবী লিখেছেন :

> "ইহা পিতৃভক্তের হৃদয়-শোণিতে রচিত পিতৃভক্তির ইতিহাস।… স্বজন-প্রীতিমূলেই স্বজাতিপ্রীতিও নিহিত থাকে। প্রকৃত স্বধর্মপরায়ণতায় কখনই পরধর্মবিদ্বেষ আনিতে পাবেন না। বিশ্বমানবের প্রতি বিশ্বপ্রেম মুখে আবৃত্তি করিলেই উহা পাওয়া যায় না বা দেওয়া যায় না। ৺ভূদেববাবুর চরিতে কেমন করিয়া মানুষ সমাজ ও স্বজনপ্রেমকে বজায় রাখিয়া প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক হইতে পারে তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, ইহাই চরিত্র পঞ্জিকা।"

বিশ্বমানব, বিশ্বপ্রেমিক প্রভৃতি বিশেষণ ভূদেবের প্রতি প্রয়োগ অনেকাংশেই অর্থহীন বলে মনে হয়। যে অর্থে রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত বিশেষণে ভূষিত হতে পারেন, ভূদেবের চিন্তায় ও কর্মে তার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে 'প্রথম ভাগে'র ভূমিকায় যেকথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ—"তিনি স্বধর্ম পালন, স্বদেশপ্রীতি, সহৃদয়তা, সদাচার, সৎকর্মে সম্মিলন, স্বাবলম্বন এবং সাত্ত্বিক উদ্যমের প্রচারক।…তিনি ভারতের একচ্ছত্র সম্মিলন জন্য রাজার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া…সাত্ত্বিক উদ্যমে এদেশীয়দিগকে নিজেদের সকল কার্য নিজেদেরই করিয়া লইতে শিক্ষা দিয়াছেন।…নিজের জীবন দিয়া ভূদেববাবু পূর্ণ সর্বাঙ্গ সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান সহ 'বৈধ স্বদেশী যুগে'র প্রবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন।"—এগুলি ভূদেব সম্পর্কে অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। ভূদেব-জীবনের আদি-মধ্য-অন্ত্য বিবরণ পর-পর তিনখণ্ডে বিবৃত হয়েছে। এরূপ তথ্যবহুল চরিত-গ্রন্থ বাংলায় বেশি নেই। তথ্যের জন্য চরিতপ্রণেতাদের কোনো বেগ

পেতে হয়নি : "ভূদেববাবুর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুত্র তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর অনেক কথা সময়ে সময়ে তাঁহারই নিকট শুনিয়া রাখিয়াছিলেন।" তাছাড়া ভূদেবের দিনলিপি, চিঠিপত্র, সরকারী রিপোর্ট, সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাদি প্রায় সবই পাওয়া গেছে। তার ফলে একটি দোষ ঘটেছে চরিত গ্রন্থটি অতিরিক্ত মাত্রায় তথ্যভারাক্রান্ত হয়েছে। স্ট্রেচি নিন্দিত 'lamentable lack of selection' এই গ্রন্থের প্রধান ত্রুটি।

রামমোহন, কৃষ্ণমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, শিবনাথ শাস্ত্রী সকলের জীবনই সংগ্রামের ইতিহাস। যে-চরিত্রে কোনো সংগ্রাম বা 'struggle' নেই তার চরিতকথার আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম। ভূদেবের জীবনের আদি-পর্বের বর্ণনা বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছে, তার কারণ ভূদেবের প্রথম জীবনে তৎকালীন হিন্দুকলেজের ছাত্র-সুলভ সংশয়বাদ, মিশনরী প্রভাব, 'পৌত্তলিকতা'র বিরুদ্ধে বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল, তাঁর পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় (যিনি তারাচাঁদ চক্রবর্তীর 'মনুসংহিতা'র অনুবাদে বিশেষভাবে সহায়তা করেন) ধীরে ধীরে কী ভাবে ভূদেবের মনকে স্বধর্মে স্ব-সংস্কৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন— তার ইতিহাসটি সর্বাপেক্ষা সুলিখিত। ভূদেবের সহপাঠী মধুসূদন ও রাজনারায়ণ বসু যথাক্রমে খ্রীষ্টান্ ও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ভূদেব স্বধর্মনিষ্ঠ থাকতে পেরেছিলেন। বরং বলা যায় রাজনারায়ণ বসুই শেষে ভূদেবের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন।[২৬]

ভূদেবের একদিকে 'সামাজিক-পারিবারিক'-ও 'আচার-প্রবন্ধ' অপরদিকে 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (তৃতীয় ভাগ), ঐতিহাসিক উপন্যাস' 'পুষ্পাঞ্জলি'। সমাজ-চিন্তা, ইতিহাস-চিন্তা ও সাহিত্য-চিন্তায় অর্থাৎ মনন-চর্চায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তুলিত হতে পারেন। 'ভূদেব-চরিত' প্রসঙ্গে বিস্তৃত ভাবে এগুলি আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে দু-একটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। ভূদেব ইতিহাসপ্রিয় ছিলেন। তিনি গ্রীস ও রোমের ইতিহাস সংযুক্ত 'পুরাবৃত্তসার' ও 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' প্রণয়ন করেন। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' সম্পর্কে তাঁর মতামত অনেকটা বঙ্কিমের অনুরূপ। তিনিও বলেছেন, "দেশীয় ভাবে ভারত-ইতিহাস লেখার চেষ্টা হইতে পারে···ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের চক্ষে দৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া ভারতের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।" 'ভারতবর্ষের

ইতিহাস' (তৃতীয় ভাগে) তাঁর সমকালীন যুগের বাংলার শিক্ষিত-গোষ্ঠীর চিন্তাধারা কোন পথে অগ্রসর হচ্ছিল, তার বিশ্লেষণ তিনি করেছেন, সেখানে ঐতিহাসিকের নিপুণ দৃষ্টির প্রকাশ।[২৭] ইতিহাস-প্রীতি ও স্বদেশপ্রীতির যুগ্ম ফসল 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'।—ভূদেবের চাকরি-জীবন, তথা ইতিহাস. সাহিত্য, শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা, অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য, তাঁর পাণ্ডিত্য ও মনীষার দিক বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর ব্যক্তি-জীবনের খুঁটিনাটি তথ্যও বাদ পড়েনি।

রামচন্দ্র দত্ত পরমহংসদেবের ভক্ত ছিলেন। তিনি পরমহংসদেবের মৃত্যুর পর যে জীবনীখানি রচনা করেন, তার মূল্য আজো হারায়নি।

অজিতকুমার চক্রবর্তী 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী' রচনায় দেবেন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের (১৮১৭-১৯০৫) ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চরিত সাহিত্য সম্পর্কিত চিন্তা ও ধারণা আলোচনার পর অজিত. চক্রবর্তীর গ্রন্থ আলোচনা করাই সংগত হবে তার কারণ অজিতকুমার ছিলেন রবীন্দ্র-শিষ্য।

যে চরিত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল, তাদের মধ্যে যোগীন্দ্রনাথ চণ্ডীচরণ বা প্রতাপ মজুমদারের গ্রন্থ ছাড়া আর কোনোটি 'সাহিত্য-কর্ম' বা 'work of art' স্তরে উঠতে পারে নি। তবু এই সব 'craft' জাতীয় বা 'compilation' গ্রন্থের মূল্য আমরা লিটন স্ট্রেচির ভাষায় নির্ধারণ করব :

> "The studies in this book are indebted, in more ways than one, to such works—works which certainly deserve the name of Standard Biographies. For they have provided me not only with much indispensable information, but with something even more precious—an example."[২৮]

স্ট্রেচি সঙ্গত কথাটি লিখেছেন। বহু পরিশ্রমে আহরিত তথ্যসমৃদ্ধ জীবনবৃত্তান্ত প্রণীত না হলে কী করে রচিত হবে শিল্পময় চরিত-সাহিত্য। স্ট্রেচি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, স্যর এডওয়ার্ড কুকের 'Life of Florence Nightingale' বইখানি প্রণীত না হলে তিনি তাঁর 'Eminent Victorians' গ্রন্থে সংকলিত 'ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল' চরিত-ভাষ্যটি লিখতে পারতেন না।

এই কথাই প্রখ্যাত চরিত-লেখক এমিল লুড্‌উইগ (১৮৮১—১৯৪৮) তাঁর 'Genius and Character' (১৯২৭) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন :

"Of course, the portraitist takes his basic material from the purely scientific biographer and is always indebted to him. With a kind of naive cynicism, he appropriates the scientists' laboriously collated facts for purposes of his own ;"[২৯]

পাদটিকা

১. অষ্টম অধিবেশন হয় বর্ধমানে (২০-২২ চৈত্র ১৩২৯)। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যদুনাথ সরকার ও যোগেশচন্দ্র রায় যথাক্রমে দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেন।

২. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮০০ শক, চৈত্র, 'রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা'।

৩. পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায়, আচার্য কৃষ্ণকমলের স্মৃতিকথা, বিপিনবিহারী গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ১৩২০।

৪. Review of Boswell's Life of Johnson in Fraser's Magazine, April, 1882. 'Biography as an Art. Selected Criticism, 1560-1960' গ্রন্থে সংকলিত।

৫. নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প' বা Some Anecdotes from the life of Raja Rammohun Roy with a Geneological Table showing the succeeding Generations from Nittanand Bandyopadhyaya down to the present surviving members of one branch of the family. (খ্রি-সং ১৮৯১)।

৬. মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পৃঃ ২৭।

৭. "Philosophers of the Sceptical and Agnostic School, scientific opponents of religion and morality, the apostles of Utilitarianism, the materialist professors of new science and so-called Positivism overspread the land with their teachings."—Life and Teachings of K.C. Sen, Introduction, p. 5.

৮. Preface, Life and Teachings of K. C. Sen.

৯. বিদ্যাসাগর, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, পৃঃ ছয়।

১০. তদেব, পৃঃ ৪০০।

১১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী, সংকলক, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

১২. পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায়।

১৩. Principles of Biography, The Leslie Stephen Lecture delivered in the Senate House, Cambridge, (1911).

১৪. চার্লস্ ডারউইনের (১৮০৯-৮২) পিতামহ ইরাস্‌মাস ডারউইন্ (১৭৩১-১৮০২) এই মত পোষণ করতেন 'the process of evolution depended on the inheritance of acquired characteristics'. পরে চার্লস বহু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা বংশগতি-তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেন।

১৫. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী' পৃঃ ৪১১-১২।

১৬. Recollections of D. L. Richardson, Bholanath Chunder, Calcutta University Magazine, July 1894.

১৭. Moore, Thomas, The Works with His Letters and Journals and His Life, 17 vols. (1832-33).

১৮. পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায়, পৃঃ ২০৩—২০৪।

১৯. তদেব, পৃঃ ৯।

২০. কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতিকথায় পজিটিভিজম্ ও দ্বারকানাথ মিত্র সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন (পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় পৃঃ ৫৭-৭০)। তিনি বলেছেন, "এতাবৎ আমার যত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৺দ্বারকানাথ মিত্রের মত সমুজ্জ্বল ধীশক্তিসম্পন্ন লোক, এমন brilliant intellect আমার নয়নগোচর হয় নাই।"

২১. বেকনের অনুবর্তী হয়েও দ্বারকানাথ তাঁর হুগলী কলেজে অধ্যয়নকালে (১৮৫৩-৫৪) রচিত প্রবন্ধে লেখেন, "we must reject the 'idols' Bacon has warned us against but we must not fall flat at the shrine of those other 'idols' he himself worshipped."

২২. Life and Teachings of K. C. Sen, p. 281। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন "মহম্মদের অনুকরণে বিরোধিগণকে কাফের শ্রেণী গণ্য করিয়া তাহাদের প্রতিকটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং আপনার দলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য বিধিমতে প্রয়াসী হইলেন।" —রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২৪৮।

২৩. এই সূত্রে দ্রষ্টব্য শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য লিখিত 'প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ' প্রবন্ধ (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৬৭)। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের অধ্যাপনা সম্পর্কে লিখেছেন, "তিনি কুমারসম্ভবে যখন পড়িতেন, 'ত্রিভাগ শেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং / নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত। ক্ব নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাক্ / অসত্যকণ্ঠার্পিত বাহুবন্ধনা॥/ তখনই আহা, হা, করিয়া উঠিতেন, তাঁহার ভাব লাগিয়া যাইত, আমাদেরও সেদিনকার মত পাঠ বন্ধ হইত।"—পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায়, পৃঃ ২২৫-২৬।

২৪. "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কলিকাতার বড বড় লোকের ছেলেদের দলে মিশিলেন এবং পবিত্র চরিত্রটি কলুষিত হইতে দিতে লাগিলেন।"

২৫. Carlyle, On Heroes, Hero-worship and the Heroic in History', Lecture—IV, (Ed. by H. M. Buller, 1926).

২৬. রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতার পর "দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার 'সোমপ্রকাশে' লিখিলেন যে হিন্দুধর্ম নির্বাণোন্মুখ হইতেছিল রাজনারায়ণ বসু তাহাকে রক্ষা করিলেন; সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সভাপতি কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাহার অশেষ প্রশংসা করিয়া রাজনারায়ণ বাবুকে হিন্দুকুলশিরোমণি বলিয়া বরণ করিলেন।"—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২৮৬।

২৭. "তত্ত্ববোধিনী সভা নব্যদলের ধর্মপ্রণালী সংস্থাপিত করিলেন এবং একজন সুবিজ্ঞ বাঙ্গালী ভারতবর্ষীয় সমাজের সভাপতি হইয়া রাজকার্য বিষয়ে সভার স্থিরদৃষ্টি জন্মাইলেন। সচরাচর অনেকেই বলিয়া থাকেন যে এই দেশীয় লোকেরা স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া কোন কার্যই করিতে পারেন না, আর ইহারা যাহা করিতে পারেন তাহাও অপরের অনুকৃতি মাত্র হয়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম এবং ভারতবর্ষীয় সমাজ এই দুইটিই অপরের সহায়তা অথবা অনুকৃতির ফল নহে। ঐ দুই সভার

দ্বারাই হিন্দুসমাজের ভাবী পরিবর্তনসমূহের বীজ উপ্ত হইয়াছিল।'
—বাঙ্গালার ইতিহাস, তৃতীয় অধ্যায়।

২৮. Strachey, L., Eminent Victorians, Preface, p. 7, Penguin ed., 1948.

২৯. Ludwig, Emil., Genius and Character, Introduction, p. 14-15.

॥ রবীন্দ্রনাথ ও চরিত সাহিত্য ॥

ভাববাদী ও আদর্শবাদী দৃষ্টির স্বাক্ষর

কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ চরিত-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নতুন চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও রূপসৃষ্টি করে গেছেন। তিনি রোমান্টিক যুগের কবি, নিজের চিত্তপ্রবণতাও ছিল মূলতঃ রোমান্টিক। ব্যক্তির বহির্জগতের চেয়ে অন্তর্জগৎ, বহির্জীবনের ঘটনা অপেক্ষা অন্তর্জীবনের ভাবনা, ইতিহাসের 'তথ্যে'র চেয়ে তার অন্তর্নিহিত 'সত্য' রবীন্দ্রনাথকে আজীবন আকর্ষণ করেছে। 'Fact'-এর চেয়ে 'Truth' চিরদিনই তাঁর জীবনের অন্বিষ্ট। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখি কাব্যে 'তথ্যে'র চেয়ে 'সত্য'কেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এই যে অন্তর্যাত্রা, বাহির থেকে অন্তরে অন্বেষণ—এ মনোভাব সাবজেক্‌টিভ্, রোমান্টিকতার অঙ্গীভূত। যদি কারো জীবনীতে সেই ব্যক্তির অন্তর্লোক, ভাবলোক, জীবনের নিগূঢ় সত্যটি না ফুটে ওঠে তাহলে তথ্যপুঞ্জিত চরিত-গ্রন্থের কি সার্থকতা?[১] অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে যে সপ্রশ্ন কৌতূহল, সর্বস্তরের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে নিরন্তর জিজ্ঞাসা এবং যে সংশয়বাদ, যুক্তিবাদ প্রভৃতি প্রবল হয়ে উঠেছিল, ঊনবিংশ শতকের প্রথমে ইংরেজি সাহিত্যে 'ভাববাদী' জর্মান-দর্শন ও রোমান্টিক-মনোভাবের প্রাধান্যে বহুলাংশে তার হ্রাস ঘটে। কোলরিজের মধ্যে উত্তরকালে তাঁর পূর্ব-পোষিত অষ্টাদশ শতকীয় সংশয়বাদ ও যুক্তিবাদের অবসান দেখি। স্টার্লিং লিখেছেন:

> "To Coleridge I owe education. He taught me to believe that an empirical philosophy is none, that Faith is the highest Reason."

পরবর্তীকালে কার্‌লাইলের মধ্যে কোলরিজের মতের প্রতিষ্ঠা অনেকে লক্ষ করেছেন, কেননা দুজনেরই প্রেরণার মূলে কাজ করেছে খ্রীষ্টধর্মাদর্শ ও জর্মান ভাববাদী-দর্শন।[২]

জীবনচরিত রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে কোলরিজ অষ্টাদশ শতকীয় রীতিতে চিঠিপত্র, টুকরো গল্প, প্রচলিত জনশ্রুতি, অর্থাৎ তথ্যপুঞ্জ যোজনার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে যে জীবন 'worthy of being recorded' তারই চরিতকথা লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। বস্‌ওয়েলী রীতি থেকে স্বতন্ত্র রীতির ঘোষণা যে কোলরিজ করেছিলেন, তার কারণ তাঁর ভাববাদী রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি। সেজন্য উত্তরকালে অবজেক্‌টিভের চেয়ে সাবজেক্‌টিভ-দৃষ্টি তাঁর মধ্যে বেশি দেখা যায়। এবং সেজন্যই 'The age of personality'-র দাবি তাঁব কণ্ঠে অধিক ধ্বনিত হয়েছিল।

ববীন্দ্রনাথও রোমান্টিক, ভাববাদী এবং 'age of personality-তে বিশ্বাসী। এমিল লুড্‌উইগ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "চবিত রচনার একটি পর্বে মানুষের চরিত্র-নির্ণয়ে বংশগতি, পরিবেশ প্রভৃতির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী কাল-পর্বে ডারউইনীয় চিন্তাধারার পরিবর্তে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল মানুষের 'ব্যক্তিত্ব' উন্মোচন, 'the personality *per se*, the personality almost devoid of temporal co-ordinates' স্মরণীয় যে তিনি 'Genius and Character' গ্রন্থ বস্‌ওয়েলকে নয়, কার্‌লাইলকে উৎসর্গ করেছেন। চরিত-চিন্তায় এই 'personality' বা 'ব্যক্তিত্ব'-বিচার প্রধান স্থান অধিকার কবেছে রবীন্দ্রনাথের চরিত-চিন্তায়। সেজন্য দেখি পাশ্চাত্যের কবি-মনীষীদের চরিতগ্রন্থ আলোচনাকালে তিনি ঐ গ্রন্থগুলিতে অবলম্বিত রীতির ও দৃষ্টির সমর্থন করেন নি। এই আলোচনার উপলক্ষ হয়েছিল কবি টেনিসনেব (১৮০৯-৯২) মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে তাঁর পুত্র হালাম টেনিসন কর্তৃক পিতার দু-ভল্যুম জীবনচরিত প্রকাশ (১৮৯৭)। ববীন্দ্রনাথ তাঁর 'কবি জীবনী' (আষাঢ়, ১৩৩৮) প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থের সমালোচনায় লিখলেন:

> "কবি কোথায়, কাব্যস্রোত কোন্ গুহা হইতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা তো খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে। আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কবি কবে মানব হৃদয়সমুদ্রের মধ্যে জাল ফেলিয়া এত

> জ্ঞান ও ভাব আহরণ করিলেন এবং কোথায় বসিয়া বিশ্বসংগীতের সুরগুলি তাঁর বাঁশিতে অভ্যাস করিয়া লইলেন।”[৩]

রবীন্দ্রনাথ টেনিসনের জীবনকে ‘সৎলোকের জীবন’ বলেছেন কিন্তু তাকে ‘প্রশস্ত বৃহৎ বা বিচিত্র ফলশালী’ বলেন নি। কাজেই তাঁর জীবন আর কাব্য সমান ওজনে হতে পারে নি, মহাকবি দান্তের জীবন ও কাব্যের মত। টেনিসনের জীবনচরিতে তাঁর কাব্যে অভিব্যক্ত বিশ্বব্যাপকতার রূপটি ফোটেনি, ‘যে ভাবে তিনি বিরাট···সেই বৃহৎ ভাবটি জীবনীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে নাই’।

ভিক্টোরিয়ান যুগে দু’ভল্যুম জীবনচরিত রচনা প্রাধান্য লাভ করে। বর্ণিত ব্যক্তির জীবনের সমস্ত তথ্য অবগত হবার উপযোগী সর্বপ্রকার উপকরণ এই চরিত গ্রন্থগুলিতে ভরে দেওয়া হত। প্রখ্যাত সমালোচক জর্জ সেণ্টস্‌বেরি সেজন্য জীবনচরিতকে “pure’ ও ‘applied’ এই দুই পর্যায়ে ভাগ করতে চেয়েছিলেন। ১৮৯২ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি বস্‌ওয়েল-লক্‌হার্ট রীতিকে ‘ফলিত’ বা ‘applied’ আখ্যা দেন।[৪] রবীন্দ্রনাথ এই ফলিত রীতির বিরোধিতা করেছেন :

> “য়ুরোপকে চরিত বায়ুগ্রস্ত বলা যাইতে পারে। কোনমতে একটি যে কোন প্রকারে বড়লোকত্বের সুদূর গন্ধটুকু পাইলেই তাহার সমস্ত চিঠিপত্র, গল্পগুজব, প্রাত্যহিক ঘটনার সমস্ত আবর্জনা সংগ্রহ করিয়া মোটা দুই ভল্যুম জীবনচরিত লিখিবার জন্য লোক হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে।”[৫]

রবীন্দ্রনাথ টেনিসনের চরিতগ্রন্থে তাঁর কবিজীবনের ‘সত্যটিকে’ খুঁজেছিলেন, ব্যক্তি-জীবনের তথ্যপুঞ্জকে নয় এবং সেজন্যই একদা প্রশ্ন করেছিলেন, ‘কবিরে খুঁজিছ তাহার জীবনচরিতে ?’

অনুরূপ ভাবে, প্রচলিত জীবনচরিত গ্রন্থে বর্ণিত ব্যক্তির ‘light and shade’, তাঁর সমস্ত দোষগুণ, ভালো-মন্দ মিশ্রিত জীবনকে আঁকা উচিত—এই মনোভাব ড্রাইডেন থেকে স্ট্রেচি পর্যন্ত অধিকাংশ চরিত লেখকের মধ্যে চলে এসেছে। কেন না তাহলে চরিত্রটি ঠিক ‘মানুষ’ হয়, ‘জীবন্ত’ বা ‘বাস্তব’ হয়। এমন কি কোলরিজও একদা লিখেছেন “The duty of an honest biographer, is to portary the prominent imperfections as well as excellencies of his hero.”[৬]

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন না, যে-কোনো লোকের জীবন নিয়ে চরিত-গ্রন্থ প্রণীত হতে পারে। তিনি 'বারোয়ারি মঙ্গল' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন :

"যে নাচে তাহার জীবনচরিত, যে গান করে তাহার জীবনচরিত,—জীবন যাহার যেমনই হোক, যে লোক কিছু-একটা করিতে পারে তাহারই জীবনচরিত।"[৭]

এই ধরণের জীবনী রচনা বা আলোচনা তাঁর কাম্য নয়। সেজন্য চরিত গ্রন্থ রচনার যে দৃষ্টি জনসন্-বস্ওয়েল থেকে চলে আসছে, অর্থাৎ দোষে-গুণে মেশানো মানুষের জীবন্ত-রূপ সৃষ্টি, যেমন হয় নাটক বা নভেলের 'নায়ক' চরিত্র—রবীন্দ্রনাথ তার পক্ষপাতী ছিলেন না। কাজেই ম্যাক্সিম্ গোর্কির টলস্টয়-স্মৃতি বা 'Reminiscenes' রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করে নি। 'যে সত্যেব গুণে' টলস্টয় 'মহৎ', রবীন্দ্রনাথ সেই সত্য-চিত্রটি গোর্কির রচনায় দেখতে পান নি। তিনি এই প্রসঙ্গে গোর্কির সমালোচনা করে লিখেছেন :

"ম্যাক্সিম্ গোর্কি টলস্টয়ের একটি জীবনচরিত লিখেছেন। বর্তমানকালের প্রখরবুদ্ধি পাঠকেরা বাহবা দিয়ে বলেছেন, এ লেখাটা আর্টিস্টের যোগ্য লেখা বটে। অর্থাৎ টলস্টয় দোষ-গুণে ঠিক যেমনটি, সেই ছবিতে তীক্ষ্ণ রেখায় তেমনটি আঁকা হয়েছে। এর মধ্যে দয়ামায়া, ভক্তিশ্রদ্ধার কোনো কুয়াশা নেই। পড়লে মনে হয় টলস্টয় যে সর্বসাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড়ো তা নয়, এমন কি অনেক বিষয়ে হেয়।··· টলস্টয়ের কিছুই মন্দ ছিল না একথা বলাই চলে না; খুঁটিনাটি বিচারে করলে তিনি যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতই এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল, একথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু যে সত্যের গুণে টলস্টয় বহু লোকের এবং বহু কালের, তাঁর ক্ষণিক মূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন করে থাকে তাহলে এই আর্টিস্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কী।··· তাছাড়া গোর্কির আর্টিস্ট-চিত্ত তো বৈজ্ঞানিক হিসাবে নির্বিকার নয়। তাঁর চিত্তে টলস্টয়ের যে-ছায়া পড়েছে সেটা একটা ছবি হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সেটা যে সত্য তা কেমন করে বলব। গোর্কির টলস্টয়ই কি টলস্টয়? বহুকালের ও বহুলোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের মধ্যে সংহত করতে পারতেন তাহলেই তাঁর দ্বারা বহুকালের বহুলোকের টলস্টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হত। তার মধ্যে

অনেক ভোলবার সামগ্রী ভুলে যাওয়া হত; আর তবেই যা না-ভোলবার তা বড়ো হয়ে, সম্পূর্ণ হয়ে, দেখা দিত।"৮

রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনায় 'যে সত্যের গুণে টলস্টয় মহৎ' বাক্যাংশটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ জনসন্-বস্ওয়েল গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকার করছেন না। আবার বিংশ শতকের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বিশ্বাসী ম্যাক্সিম্ গোর্কির দৃষ্টিরও তিনি সমর্থক নন। তিনি টলস্টয়ের 'personality' বা সমগ্র জীবনের 'সত্য'টিকে উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি সমাজের অপর পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁকে দেখা অন্যায় বলে মনে করেছেন। এমারসন্ তাঁর 'Representative Man' গ্রন্থে 'Uses of 'Great Men' অধ্যায়ে লিখেছেন: "I count him a great man who inhabits a higher sphere of thought." রবীন্দ্রনাথের কাছে টলস্টয়ও ঐরূপ প্রতিভাত হয়েছেন। অবশ্য এমারসনের বক্তব্য তাঁর গুরু কার্লাইলের 'Hero' সম্পর্কিত উক্তিরই অনুসরণ। কার্লাইল তাঁকেই 'হিরো' বলতে চেয়েছেন, যিনি 'lives in the inward sphere of things'। দেখা যায় 'অন্তর-সত্য' সন্ধানী রবীন্দ্রনাথ বস্ওয়েল বা গোর্কি অপেক্ষা কার্লাইলের দৃষ্টিরই যেন পক্ষপাতী। কার্লাইলের 'ভাববাদী' দৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। যে মানুষ 'মানবধর্মে' অর্থাৎ আত্মার শক্তিতে বলীয়ান সেই মানুষই যে প্রকৃত বড়ো এ সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের নিজের। তিনি কার্লাইলের পূর্বোক্ত বাক্যাংশে তার সমর্থন দেখেছিলেন। গোর্কির টলস্টয়-চিত্র রচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই 'ব্লুমস্বেরি' গোষ্ঠীর লিটন স্ট্রেচির কথা মনে আসে। স্ট্রেচির 'Eminent Victorians' (১৯১৮) গ্রন্থ চরিতসাহিত্য ক্ষেত্রে যুগান্তকারী রচনা। তিনি কার্লাইল-রীতির Hero-Worship-এর পরিবর্তে 'হিরো'-বিরোধী, ভাববাদ-বিরোধী, অষ্টাদশ শতকী সংশয়বাদ-বিদ্ধ, যুক্তিগর্ভ সপ্রশ্ন দৃষ্টি হানলেন। ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রশস্তিমূলক দু'ভল্যুমের চরিত রচনাকে বিদ্রূপ করে লিখলেন:

> "Those two fat volumes, with which it is our custom to commemorate the dead, who does not know them, with their ill-digested masses of material, their slipshod style, their tone of tedious panegyric, their lamentable lack of selection, of detachment, of design?"৯

কার্লাইল তাঁর 'greatmen'-দের অঙ্গ থেকে সর্বপ্রকার ধূলি দূর করে 'proper pedestal'-এ স্থাপন করতে বলেছিলেন। স্ট্রেচির কাজ হয়েছিল অনেকটা তার বিপরীত, "de-pedestalizing popular idols." তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে স্ট্রেচি ভিক্টোরিয়ান্ যুগের লোকমান্য প্রখ্যাত নরনারীদের ধরাশায়ী করবেন বলে প্রস্তুত হয়েই তাঁর উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং যে শরগুলি নির্বাচন করলে তাঁদের শরশয্যা রচনা করা যায় সেগুলিই নিপুণভাবে বেছে নিয়েছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে। স্ট্রেচি লিখেছেন কার্ডিনাল মানিং তাঁর স্ত্রীকে মনে প্রাণে ভালোবাসেন নি। উচ্চপদ লাভ ও উচ্চাকাংক্ষা তৃপ্তির জন্যই তিনি তাঁকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীর সমাধিমন্দির ধ্বংসপ্রায় হলেও তার সংস্কারে যত্নবান হন নি।[১০] কিন্তু আসল ঘটনা মানিং তাঁর স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন। তার প্রামাণিক তথ্য পাওয়া গেছে। পরলোকগতা স্ত্রীর ডায়েরি মানিংয়ের কাছে যুগপৎ প্রেম ও শ্রদ্ধার প্রতীকরূপে নিত্যসঙ্গী ছিল। মানিং তাঁর সুহৃদকে একথা বলেছিলেন।[১১]

রবীন্দ্রনাথ স্ট্রেচির দৃষ্টি ও পদ্ধতিকে বর্জন করেছেন। তিনি জনসন্, বস্‌ওয়েল, কার্লাইল, এমারসন্, লেস্‌লি স্টীফেন—সকলের রচনার সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। তিনি কার্লাইলের 'হিরো'র সংজ্ঞাকে অর্থাৎ 'lives in the inward sphere of things' গ্রহণ করেন। বহির্জীবনের তথ্যের চেয়ে অন্তর্জীবনের মূল সত্যটি আবিষ্কারে ও ব্যাখ্যায় তিনি একান্ত ভাবে বিশ্বাসী। কিন্তু কার্লাইল নীট্‌শের 'Superman' পন্থার দিকে ঝুঁকেছিলেন, শেষে তাঁর জর্মানী-প্রীতি বিসমার্কের (১৮১৫-৯৮) কঠোর 'blood and iron' শাসন নীতির সমর্থনে পরিণত হয়েছিল। তারই পুরস্কার স্বরূপ তিনি বিসমার্কের কাছে থেকে 'Order of Merit' লাভ করেন। বশ-মানানো অঙ্কুশ-শক্তির পর তাঁর শ্রদ্ধা। সেজন্য 'মহম্মদে'র প্রতি তাঁর প্রবল শ্রদ্ধা—কিন্তু বুদ্ধদেব বা খ্রীষ্টের প্রতি তদনুরূপ নয়।[১২] তার কারণ মহম্মদ 'বিধর্মী'দের শক্তি দ্বারা জয় করেছিলেন। এজন্যই প্রমথ চৌধুরী মন্তব্য করেন: "দুর্বলের উপর বল-প্রয়োগের নামই যে বীরত্ব তা বুঝলুম ঢের পরে, যখন কার্লাইলের Hero-worship পড়লুম।" সেজন্য রবীন্দ্রনাথ কার্লাইলের আর কিছু গ্রহণ করেন নি।

পাশ্চাত্যের চরিত-সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথ খুব শ্রদ্ধাশীল হতে পারেন নি। তার কারণ পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, সেখানে যে কোন ব্যক্তির, যে

কোন লোকের জীবনী লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি চিরদিনই "ক্ষমতা" ও "মাহাত্ম্য" শব্দ দুটির অর্থগত ভেদ মেনে এসেছেন। অথচ তিনি দেখেছেন:

"য়ুরোপে এই ক্ষমতা ও মাহাত্ম্যের প্রভেদ লুপ্তপ্রায়। উভয়েরই জয়ধ্বজা একই রকম, এমন কি, মাহাত্ম্যের পতাকাই যেন কিছু খাটো। পাঠকগণ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন বিলাতে অভিনেতা আর্ভিঙের সম্মান পরম সাধুর সম্মান অপেক্ষা অল্প নহে। রামমোহন রায় আজ যদি ইংলণ্ডে যাইতেন তবে তাঁহার গৌরব ক্রিকেট খেলোয়াড় রঞ্জিত সিংহের গৌরবের কাছে খর্ব হইয়া থাকিত।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি সর্বাংশে সত্য নয়। একজন খেলোয়াড় বা অভিনেতার চরিত গ্রন্থ রচিত হবে না, এ-সিদ্ধান্ত স্বীকার্য নয়। দ্বিতীয়ত, আত্মশক্তিসম্পন্ন চরিত্রকে যুরোপ শ্রদ্ধা করতে জানে। রামমোহন রায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও উচ্চ সম্মান প্রদর্শন তারই প্রমাণ। ঊনবিংশ শতকের শেষেও সে সম্মান প্রদর্শিত হতে পারত। আসলে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য:

"কিন্তু যে মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন তাঁহারই জীবন-চরিত সার্থক, যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোন কাজ করিয়াছেন তাঁহাদেরই জীবন আলোচ্য।"

এজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'চারিত্রপূজা' (প্রঃ সং ১৯০৭)। চরিত্রের শক্তি চারিত্র, তার প্রতি তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এই গ্রন্থে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগে একমাত্র চৈতন্যদেব ছাড়া শ্রদ্ধাভাজন আর কোনো ব্যক্তিকে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পান নি। বাংলা দেশের 'বীর' প্রতাপাদিত্যকে তিনি শ্রদ্ধা করতে পারেন নি। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক তার দৃষ্টান্ত। তাঁর ভাগিনেয়ী সরলা দেবী যখন প্রতাপাদিত্য-উদয়াদিত্য উৎসব পালনের আন্দোলন করেন, তিনি তাতে বিরক্ত হয়েছিলেন।[১৪]

ইতিহাস পাঠে ও চর্চায় রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল। তিনি তাঁর ছাত্রজীবন থেকে দুঃখবোধ করেছেন এই ভেবে, যে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস নেই। তিনি ক্ষোভের সহিত লিখেছেন,

"সকল সভ্যদেশেই আপন সাহিত্যে ইতিহাস ও জীবনী আগ্রহের সহিত সঞ্চয় করিয়া থাকে। ..[প্রাচীন] ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তাহার

চিহ্ন দেখা যায় না; যদি বা ভারতসাহিত্যে ইতিহাস থাকে তাহার মধ্যে আগ্রহ নাই।"[১৫]

বৈদেশিক আক্রমণ, সংঘাত-সংঘর্ষকে ভারতবর্ষের একমাত্র ইতিহাস বলে ববীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি। তুর্কি-পাঠান মোগল আক্রমণের যুগে কবীর, নানক, চৈতন্য, তুকারামের কথা তাঁব মনে হয়েছে, যাঁবা ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মানব-সমাজকে বৃহত্তব জীবনের পথে আহ্বান করেছেন। বেণেসাঁস চেতনার সঙ্গে দেশপ্রেম জড়িত থাকতে দেখা যায়। উইলিয়ম্ জোনস্ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার, তার ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধাব কাযে ব্যাপৃত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত পবে তাঁদের পথেই হেঁটেছেন।

ববীন্দ্রনাথ সেই প্রাচীন ভারত থেকে নবীন ভাবতের সঞ্জীবনী মন্ত্রেব সন্ধান একদা করেছিলেন। সে প্রাচীন ভাবত রবীন্দ্রনাথের পুনরাবিষ্কাব। তাঁর 'কথা' ও 'কাহিনী' গ্রন্থে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষেব যে চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে বাংলাদেশের কোনো স্থান নেই। আধুনিক যুগেব বাংলাদেশের রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে তিনি প্রকৃত 'ব্যক্তিত্বে'র সন্ধান পেয়েছেন, তাঁদের চরিত্রের শক্তি ও মহিমা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। ইতিহাস রচনায় রবীন্দ্রনাথ, শ্রম-আহৃত তথ্য থেকে 'সত্য' নিষ্কাষণের যে প্রচেষ্টা করেছেন তার সঙ্গে হেগেলের সিদ্ধান্তের মিল আছে। হেগেল সম্পর্কে কলিংউড লিখেছেন :

> "What Hegel is doing is to insist that the historian must first work empirically by studying documents and other evidence ; it is only in this way that he can establish what the facts are. But he must then *look at the facts from the inside* and tell us what they look like from that point of view."[১৬]

রবীন্দ্রনাথের চরিত-প্রবন্ধগুলির তিনটি পর্যায় ; বুদ্ধদেব ও খ্রীষ্ট, রামমোহন বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ , মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু মূল সূত্রটি এক, মানবধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁকে "অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি" করেছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবকে ঈশ্বর বলেন নি। তাঁকে মহৎ জীবনের মানুষ বলেই জেনেছেন, যিনি মানব কল্যাণের দীপশিখাকে নিজের অন্তরের মধ্যে বহন করে চলেছেন। বুদ্ধদেবের

'মৈত্রী' সাধনা, তাঁর 'ব্রহ্মবিহার'কে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।[১৭] তেমনি খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি রেঁণা অথবা স্ট্রাউস্ (Strauss)-এর মতো খ্রীষ্টকে দেখেন নি। বাংলাদেশে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি খ্রীষ্ট-জিজ্ঞাসা চলেছে। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের বিবাদ ও বিচ্ছেদের একটি প্রধান কারণ ব্রাহ্মধর্মে খ্রীষ্টতত্ত্ব গ্রহণ-বর্জন প্রশ্ন। নবীনচন্দ্র সেন খ্রীষ্টকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র যীশুখ্রীষ্টকে 'মহৎ পুরুষ' স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ খ্রীষ্টের জীবনে খুঁজে পেয়েছেন ত্যাগোজ্জ্বল ও প্রেমোদ্দীপ্ত মনুষ্যত্বের বাণী। তাঁর পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তির যোগ, পিতাপুত্রের, প্রভু-সেবকের যোগ উপলব্ধি করেছেন। 'ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি' মন্ত্রকে তিনি তাঁর সাধনায় সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যীশুর মধ্যে এই সত্যেরই প্রকাশ দেখেছেন :

> "ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে গ্রন্থিবন্ধনের প্রয়োজন আছে মন্ত্র তার সহায়তা করে। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা তাঁর সঙ্গে একটা কোনো বিশেষ সম্বন্ধকে পাকা করে নেব। সেইরূপ একটি মন্ত্র হচ্চে : পিতা নোঽসি।...যিশু ওই সুরটিকে পৃথিবীতে বাজিয়ে গিয়েছেন। এমনি ঠিক করে তাঁর জীবনের তার বাঁধা ছিল যে মরণান্তিক যন্ত্রণার দুঃসহ আঘাতেও সেই তার লেশমাত্র বেসুর বলেনি, সে কেবলই বলেছে : পিতা নোঽসি ॥...[১৮]

খ্রীষ্টের চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছেন ঈশোপনিষদের সেই মন্ত্র, যা একদা দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতায় পথ নির্দেশ করেছিল—সেই 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা', যদিচ দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার সঙ্গে রবীন্দ্র-ব্যাখ্যার মিল নেই। রবীন্দ্রনাথের মতে খ্রীষ্টের আত্মদানে শুধু সত্যের জন্য প্রাণদানের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়নি, তিনি তাঁর মানবপ্রেম দ্বারা অগণ্য মানবের চিত্ত-প্রদীপ জেলে দিয়েছেন। সেখানেই বুদ্ধদেবের মতো তাঁর ব্রহ্মবিহার।

মহামানব বুদ্ধদেব ও খ্রীষ্টের জীবনের মধ্য দিয়ে যে 'সত্যটি' উদ্ভাসিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তাকেই ব্যাখ্যা করেছেন। এঁরা প্রাচীন ইতিহাসের চরিত্র। পূর্বে বলা হয়েছে মধ্যযুগের রাজপুত-মারাঠা-শিখের জীবনে রবীন্দ্রনাথ কর্মের ও ধর্মের যে উজ্জ্বল পরিচয় লাভ করেছিলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে তার প্রতিরূপ খুঁজে পান নি। কিন্তু রেনেসাঁস-যুগের উনবিংশ শতকের বাংলাদেশে

পেয়েছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বরণীয় ব্যক্তিদের চরিত্রে। 'Reason' এর চেয়ে 'Faith'-কেই যাঁরা একমাত্র বড়ো বলে মেনেছিলেন তাঁদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হন নি।

রবীন্দ্রনাথের 'রামমোহন রায়' রচনাটি প্রথম ১২৯১ (১৮৮৪) সালে পুস্তিকাকারে বার হয়। তার পূর্বে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রামমোহন জীবনী (প্র-সং ১৮৮১) বার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথের মতো কোনো তথ্য সংগ্রহ বা সংকলন করেন নি। তিনি রামমোহনের স্মরণ সভায় প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেন, সঙ্গতভাবে ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেমন মিল্‌টনের জন্য আক্ষেপ করেছিলেন, দেশের দুর্গতির দিনে রামমোহনের মতো 'স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের অটল আশ্রয়' প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধে রামমোহন কী ভাবে আঘাত দিয়ে সংস্কার-বিমুখ হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করেছেন, শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার ঘটিয়েছেন, ভস্মের মধ্য থেকে অগ্নিকণিকা আহরণ করেছেন—সেই দিকটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ পরে রামমোহন রায়কে 'ভারত-পথিক' আখ্যা দান করেন। যে উদার অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ধর্ম ও মানবতাবোধ একদিন প্রাচীন ভারতে জাগ্রত ছিল কালক্রমে 'তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি বিচারের স্রোতঃপথ'কে গ্রাস করেছিল, রামমোহন সেই বালুবাশিকে সরিয়ে দিয়ে পুনরায় মহান্‌ ভারত পন্থাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। বামমোহনেব মধ্যে প্রাচীন ভারতের উদার আহ্বান 'আয়ন্তু সর্বতঃস্বাহা' সার্থক হলো।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রচিত 'চারিত্র পূজা' গ্রন্থে সংকলিত প্রথম প্রবন্ধটি ১৩০২ (১৮৯৫) সালের ১৩ই শ্রাবণ অপরাহ্নে বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ সভার সাংবাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত হয়। তার পূর্বে বিদ্যাসাগরের স্বরচিত 'জীবনচরিত' (১৮৯১) শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' এবং চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঐ গ্রন্থগুলির সহায়তায় তাঁর 'বিদ্যাসাগর চরিত' প্রবন্ধটি রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত তথ্যগুলি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে তিনি "অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের" অধিকারী ছিলেন। সেই মনুষ্যত্বের দীপ্তি তাঁর চিন্তায় ও কার্যে বিচ্ছুরিত হয়েছে। এই সূত্রে তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রামমোহনের চরিত্রের সাদৃশ্য উপলব্ধি করেছেন :

"একদিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপর দিকে য়ুরোপীয়

প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকট সাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে।…নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন।"

বাঙালী জাতি ও সমাজের নিশ্চেষ্টতা, কাপুরুষতা, কৃতঘ্নতা, নিষ্ফল তার্কিকতার প্রতি বিদ্যাসাগরের ধিক্কার ছিল বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন এবং বিদ্যাসাগব-চরিত্রের 'অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্বের প্রতি' তাঁর অন্তরের সমগ্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগব-চরিত্রের যে-পবিমাপ করা হয়েছে তার চেয়ে নতুন কথা আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেন নি।

'বিদ্যাসাগর-চরিত' পর্যায়ে দ্বিতীয় রচনাটিতে প্রথমটির মতো তথ্য-বিশ্লেষণ নেই—শিবনাথ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগর-চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যোগবাশিষ্টেব একটি শ্লোক উৎকলন করেন। ঐ শ্লোকের শেষ পংক্তি "স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি" রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট কবে। তিনি ঐ শ্লোকটিব মধ্যে কার্লাইল কথিত 'lives in the inward sphere of things'-এর সমর্থন পেলেন। আর একটি শ্লোক 'গতানুগতিকো লোকো ন লোকঃ পারমার্থিকঃ', থেকে তিনি 'গতানুগতিক' ও 'পারমার্থিক' এই দুই শ্রেণীব মানুষ পেলেন। যাঁরা 'মননেন হি জীবতি' তাঁরাই 'পারমার্থিক'। তাঁর করুণার্দ্রহৃদয় ও বলিষ্ঠচিত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জনসনের মিল খুঁজে পেয়েছেন। যে জনসন্ ধনীর দানকে প্রত্যাখ্যান করেন, যাঁর হৃদয় করুণাপূর্ণ। লেস্‌লি স্টীফেন এবং কার্লাইলের জনসন্-চরিত্র এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সহায় হয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব। তিনি 'মহর্ষির জন্মোৎসব', 'মহর্ষির আদ্যকৃত্য উপলক্ষে প্রার্থনা', 'মহাপুরুষ' প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে মহর্ষিব উদ্দেশ্যে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। মহর্ষি সম্পর্কিত রচনাগুলিতে তিনি তাঁর পিতার যে-মূর্তি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন সে তাঁর অন্তরের সত্যের মূর্তি। বিদ্যা নয়, অর্থ নয়, সামাজিক সম্মান নয়, "যে সত্যের গুণে" তিনি বড়ো, রবীন্দ্রনাথ সেই দিকটিকেই ব্যাখ্যা করেছেন। বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করেও অমৃতের জন্য আকুল পিপাসা ও ব্রহ্মসন্ধানের অমৃত-পথযাত্রা দেবেন্দ্রনাথের জীবনের দিব্য-অধ্যায়। তাঁর চিত্তের মৈত্রেয়ী-প্রার্থনাটি 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ তেনাহং কিমকুর্যাম্'—কী ভাবে তাঁর সমগ্র

জীবনের মধ্য দিয়ে শাশ্বতরূপে বিকিরিত হয়েছে, সেইটিই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

'চারিত্রপূজা' নামের মধ্যেই এ গ্রন্থের মূল সুরটি ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'অন্তর্মুখী' ও 'ভাববাদী' দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধগুলি রচনা করেছেন। দেখা যায় কবিজীবনী, মহামানব-জীবনী বা মহাত্মা গান্ধীর জীবনী সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ 'অন্তরতর সত্য'কে দেখাবার, ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস করেছেন। 'ভাবগত সত্য' বা subjectivity এই আলোচনাগুলিতে প্রধান স্থান লাভ করেছে। অবজেক্‌টিভ চরিত রচনা রীতির পরিবর্তে সাব্‌জেক্‌টিভ রীতির প্রাধান্য আনলেন রবীন্দ্রনাথ। আর চরিত-প্রবন্ধ যে সর্বোচ্চ সাহিত্যের কোঠায় স্থান পেতে পারে, অসামান্য শিল্পগুণসমৃদ্ধ হতে পারে—'চারিত্রপূজা' তারই প্রমাণ।

পাদটীকা

১. 'অতি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তূপাকার করে তা দিয়ে স্মরণস্তম্ভ হতে পারে কিন্তু জীবনচরিত হবে কী করে।' জাভাযাত্রীর পত্র, রবীন্দ্র-রচনাবলী ঊনবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী সং।

২. Willey, Basil, Nineteenth Century Studies, 'Thomas Carlyle', 1955.

৩. সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতীসং, অষ্টম খণ্ড।

৪. Saintsbury, G., 'Some Great Biographies' first published in Macmillan's Magazine, June 1892, Compiled in Collected Essays, 1923.

৫. বারোয়ারি মঙ্গল, 'ভারতবর্ষ', রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী সং, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৩।

৬. 'The Principles of True Biography' (1818), Compiled in 'Biography as an Art', Selected Criticism 1560-1960, Ed. by J. L. Clifford, Oxford University Press, 1962.

৭. 'বারোয়ারি মঙ্গল', রবীন্দ্রনাথ।

৮. জাভাযাত্রীর পত্র, রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী সং ঊনবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৩৮২।

৯. Strachey, L., Eminent Victorians', Preface.

১০. Cardinal Manning, p. 17. (Penguin edition, 1948).

১১. The Times Literary Supplement, 24th March, 1921. Quoted in the New Statesman and Nation, April 30, 1955. "Baron Von Hugel revealed a conversation with Cardinal Vaughn... 'he (Manning) drew out a battered little pocket book full of a woman's handwriting. He said, "Into this little book my dearest wife wrote her prayers and meditations. Not a day has passed since her death on which I have not prayed and meditated from this book. All the good I have done I owe to her."

১২. Carlyle on Heroes, Hero-worship and the Heroic in History, The Hero as Prophet, Ed. by H. M. Buller, 1926.

১৩. বারোয়ারি মঙ্গল, রবীন্দ্রনাথ। ভল্‌তেয়রও (১৬৯৪-১৭৭৮) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন :

"With me, as you know, the great men come first and the military heroes last. I call those men *great* who have distinguished themselves in useful or constructive pursuits ; the others, who ravage and subdue provinces are merely *heroes*."

১৪, জীবনের ঝরাপাতা, সরলা দেবী চৌধুরানী।

১৫. কাদম্বরী চিত্র, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ।

১৬. Collingwood, Idea of History, p. 113-114.

১৭. 'ব্রহ্ম-বিহার' (১১ চৈত্র, ১২৬৬), 'বুদ্ধদেব', রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী।

১৮. খৃস্ট প্রসঙ্গ ও খৃস্ট, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী সং।

১৯. রামমোহন রায়, চারিত্রপূজা।

২০. 'মহাত্মা গান্ধী' (১৬ আশ্বিন, ১৩৪৪), রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, সং।

॥ অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত-ব্যাখ্যাতা ॥

উমেশচন্দ্র বটব্যাল (১৮৫২-৯৮)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র, সংস্কৃত কলেজ ও প্রেসিডেন্‌সি কলেজের স্বল্পকালীন অধ্যাপক ও শেষে ম্যাজিস্ট্রেট পদে বৃত উমেশচন্দ্র বটব্যাল বাংলা সাহিত্যে একজন বিস্মৃত মানুষ। তিনি সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের ত্রিবেণীতে অবগাহন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'সাংখ্যদর্শন' সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনে' লিখেছিলেন। উমেশচন্দ্র ১৩০০ সালের 'সাধনা' পত্রিকায় 'সাংখ্যদর্শন' সম্পর্কে কয়েকটি রচনা প্রকাশ করেন। সেগুলি পড়ে "ভবদীয় ভক্ত" পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ উমেশচন্দ্রকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে একখানি পত্র লেখেন (১৯ চৈত্র, ১৩০০)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পূর্বে নাম ছিল 'দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার'। উমেশচন্দ্রই এই প্রতিষ্ঠানের ১৭শ অধিবেশনে (১৮৯৩) ঐ নামের পরিবর্তে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' নামকরণের প্রস্তাব করেন। ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও আলোচনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর ইচ্ছা ছিল একখানি বাংলার ইতিহাস রচনা করবেন। দুঃখের বিষয় সে কার্য তিনি সমাধা করতে পারেন নি। কিন্তু রাজকার্যে নিযুক্ত থাকা কালে তাঁকে বহু জেলায় ঘুরতে হত, তিনি সেই সময় ইতিহাসের বহু উপকরণ সংগ্রহ করেন। মালদহে থাকার সময় তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রজ ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষ ভট্টনারায়ণকে প্রদত্ত রাজা ধর্মপালের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কার করেন। তার পাঠোদ্ধার করে টীকা সহ তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ও 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বেদ সম্পর্কেও তিনি 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। 'সেকশুভোদয়া' সম্পর্কে তিনিই প্রথম আলোচনা করেন (সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০১)। তবে চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের ধর্মগুরুদের ও গোস্বামীদের সম্পর্কে উমেশচন্দ্র যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তাকে অনেকটা লিটন্ স্ট্রেচির মনোভাব বলতে পারি। উমেশচন্দ্র যুক্তিবাদী, যেন 'age of reason'-এর মানুষ, যেমন স্ট্রেচি সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি বিংশ শতকের লোক হলেও তাঁর সপ্রশ্ন দৃষ্টি ও মেজাজ প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ

শতকীয় ইংলণ্ডের। উমেশচন্দ্র 'বৈদিক যুগে গোহত্যা' নামক চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ লেখেন, 'বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্মে'র তুলনামূলক আলোচনাও করেন।

জীবনচরিত বলতে তিনি "রক্তমাংসে গড়া মনুষ্যের প্রকৃত জীবন-কাহিনী"কেই একমাত্র গ্রহণীয় বলে মনে করেন। মানুষের উপর 'ঈশ্বরত্ব' বা 'অবতারত্ব' আরোপের তিনি তীব্র বিরোধী ছিলেন। সেজন্য তিনি 'গৌরাঙ্গ' সম্পর্কে লিখেছেন :

> "আমরা গৌরাঙ্গকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করি না। গৌরাঙ্গ কেন, কোন মনুষ্যকেই ঈশ্বর বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।...যাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্ধ বিবেকশূন্য বিশ্বাসের সহিত অনুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করাও আমাদের পক্ষে অসাধ্য।"

এবং আরোপিত অবতারত্ব সম্পর্কে ব্যঙ্গচ্ছলে লিখেছেন :

> "অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হওয়া এক্ষণকার কালেও যে একেবারে অসম্ভব তাহা নহে।...প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল তমলুক মহকুমায় আমি এক কল্কি অবতার দেখিয়া আসিয়াছি।...বিশ্বম্ভর মিশ্রের অন্ততঃ গৌরবর্ণ ছিল জলামুঠার কল্কি মহাশয়ের তাহাও নাই। আবার সেদিন দেখিতে দেখিতে ঈশ্বর নাকি পরমহংস সাজিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন শুনিতে পাই।"

উমেশচন্দ্র বৈরাগী বা সন্ন্যাসী হবার বিরোধী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। উমেশচন্দ্র লিখেছেন, বৈরাগী হওয়ার চেয়ে "ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা কর্তব্য।" এবং সেজন্য তিনি বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করেছেন, "কিন্তু কলিযুগে বৈরাগী লাখ-লাখ। আর বৈরাগীর ন্যায় বৈরাগিনীও অনেক। ধন্য বুদ্ধদেব যিনি এই মহা অনর্থের মূল।"

উমেশচন্দ্র গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ সম্পর্কেও যে কারণ নির্দেশ করেছেন সে নিছক 'বাস্তব' বা practical। তাঁর মতে :

> "দেখিলেন সংসারে সুখ নাই। জনকজননী অন্নকষ্টে প্রপীড়িত। ছোট ছোট ভাইবোনগুলি অকালে মরিয়া গেল। নিজে ভালো খাইতে পান না, ভালো পরিতে পান না, মান নাই, সম্ভ্রম নাই"—

অতএব সন্ন্যাস গ্রহণই শ্রেয়ঃ। এই কালাপাহাড়ী মন্তব্যে অনেকেই, যেমন

রামেন্দ্রসুন্দর আহত হয়েছিলেন। উমেশচন্দ্র মনোভঙ্গির দিক থেকে কঁৎ-মিল-হার্বার্ট স্পেনসারের ধারার অনুবর্তী। ব্যক্তি-মানুষ ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য তাঁরও কাম্য। বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রীকৃষ্ণকে বুদ্ধদেব ও যীশুখ্রীষ্টের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন তার কারণ বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট সংসারত্যাগী। সংসারে থেকে 'অনুষ্ঠেয় কর্ম' (Duty) সাধনই বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মাদর্শের মূল কথা। শ্রীকৃষ্ণ তারই প্রতীক।

উমেশচন্দ্র যখন গৌরাঙ্গ, মাধবেন্দ্র পুরী ও ঈশ্বর পুরী, রূপ ও সনাতনকে নিয়ে প্রবন্ধাদি রচনা করেন, সে-সময়ে কেশবচন্দ্র প্রধানতঃ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে তাঁর ব্রাহ্ম-ধর্মমতে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করেন। তখন নামসংকীর্তন, নগরসংকীর্তন, 'চৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ, বৈরাগব্রত পালন, 'মহাজন সমাগম' পর্যায়ে 'চৈতন্য সমাগম' সম্পর্কে বক্তৃতা—ব্রাহ্মধর্মের অঙ্গীভূত হয়েছে। বিজয়কৃষ্ণ 'কোচবিহার বিবাহে'র পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্ত হন। তিনি গৌরাঙ্গপূজা আন্দোলনের নব-স্রষ্টা। পরিশেষে 'জটিয়া বাবা' নামে পরিচিত হন এবং সর্ববর্ণের লোককে দীক্ষা দেন। অর্থাৎ যিনি উপবীত ছিঁড়ে ফেলে একদিন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছিলেন, তিনিই শেষপর্যন্ত অদ্বৈতাচার্যের বংশধররূপে ফিরে গেলেন নিজের কুলধর্মে। শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১) যৌবনে ছিলেন 'উন্নতিশীল ব্রাহ্ম'দলের সভ্য, যাঁর পাল্কীর বাঁশে কুক্কুট বাঁধা থাকত[১]—তিনিই শেষে 'শ্রীঅমিয় নিমাইচরিতে' জীবনের পূর্ণতা খুঁজে পেলেন। উমেশচন্দ্র হলেন যুক্তিবাদী, বাস্তব জগৎ ও দেহধারী নরনারীই তাঁর কাছে প্রধান সত্য। তাই তৎকালে চৈতন্যভক্তির বাড়াবাড়ি তাঁর পছন্দ হয়নি। গৌরাঙ্গ-সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি তারই প্রতিক্রিয়াজাত বলে মনে হয়। কার্লাইল ও কেশবচন্দ্র 'মহম্মদ' সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন উমেশচন্দ্রের "মহম্মদ" প্রবন্ধটি পড়লে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ধরা পড়বে।[২]

তিনি 'রামমোহন ও রামজয় বটব্যাল' প্রবন্ধে রামজয় সম্পর্কে যে-সব অমূলক উক্তি করা হয়েছে সেগুলির প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প" নামক বইয়ে প্রথম দেখান রামনগর গ্রামের দলপতি রামজয় বটব্যাল নাকি রামমোহন রায়কে গ্রাম থেকে বিতাড়ন করবার মানসে

তাঁর "বাটীর নিকট ক্রমাগত কুক্কুটধ্বনি করিত এবং সন্ধ্যার পর তাঁহার অন্তঃপুরে গো-হাড় প্রভৃতি নিক্ষেপ করিত।...কিন্তু রামমোহন রায়ের অসাধারণ ধৈর্য কিছুতে পরাভব মানিল না। কোন প্রকার প্রতিহিংসা করা দূরে থাকুক, তিনি সর্বদাই সদ্ভাব দ্বারা অসদ্ভাবকে জয় করিতে চেষ্টা করিতেন।"

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর রামমোহন-জীবনীতে এই গল্প গ্রহণ করেছেন। উমেশচন্দ্র আদালতের নথিপত্রের সহযোগে বিচারের ফয়সালা উদ্‌ধৃত করে দেখিয়েছেন বরং রামমোহন রায়ই রামজয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন ও তাঁকে নানারূপে জব্দ করবার চেষ্টা করেন।[৩]

উমেশচন্দ্র 'অন্ধ বিবেকশূন্য বিশ্বাসের' পক্ষপাতী ছিলেন না। 'রক্তমাংসের মনুষ্য'ই তাঁর প্রধান অবলম্বন ও ইতিহাসের দৃষ্টি তাঁর সহায় ছিল। শুধু মধ্যযুগের গৌরাঙ্গ-গোষ্ঠীর পর্যালোচনা না করে যদি আধুনিক কালের কোনো চরিত্রকে অবলম্বন করে 'প্রকৃত জীবনকাহিনী' লিখতেন তাহলে বাংলা চরিত সাহিত্য সমৃদ্ধতর হত।

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)

বিপিনচন্দ্র পালের 'চরিতকথা' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'চরিতকথা'র সমপর্যায় ভুক্ত হলেও অধিকতর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা। এই গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অশ্বিনীকুমার দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। বিপিনচন্দ্র বিশেষ কোনো নতুন তথ্য বা উপাদান সংগ্রহ বা বিন্যাস করেন নি। তিনি পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের নবমূল্যায়ণে অগ্রসর হয়েছেন নিজের বিশিষ্ট তত্ত্ব-দৃষ্টি নিয়ে।

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাগুলিতে ডারুউইনের অভিব্যক্তিবাদ, স্পেনসারের সামঞ্জস্যবাদ এবং জাতীয়তাবাদ, সমাজকল্যাণবাদের সাহায্যে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথের কর্ম ও সাধনার ভাষ্য পাঠ করি। বিপিনচন্দ্রের রচিত আলোচ্য প্রবন্ধগুলিতে পূর্বোক্ত মতবাদগুলি সবই আছে। তিনি এই রচনাগুলির মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নবজাগরণ-যুগের বাংলার ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য সম্পর্কে নতুন মূল্যায়ন উপস্থিত করেছেন। কিন্তু তাঁর মূল্যায়ন কিয়দংশে 'পুনরুত্থানবাদী' দৃষ্টি (**revivalism**) দ্বারা প্রভাবিত।

বিপিনচন্দ্র হিন্দু-সমাজ পরিত্যাগ করে ১৮৭৭ সালের মাঝামাঝি শিবনাথ শাস্ত্রীর বিশিষ্ট সাধকদলে দীক্ষিত হন। এই দীক্ষাতে কতকটা প্রাচীন হিন্দু-যজ্ঞের অনুকরণ করা হয়েছিল। ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়, বিপিনচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য দেখা যায়। 'উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলে'র শিশিরকুমার ঘোষ শেষে গৌরাঙ্গভক্তি অবলম্বন করেন। বিপিনচন্দ্র পালও শেষে বৈষ্ণবধর্মের দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকেছিলেন, তবে তিনি বৈষ্ণবতত্ত্ব ও বৈষ্ণবধর্মকে একটি যুক্তিগ্রাহ্য রূপ দিতে চেয়েছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধগুলিতে তার পরিচয় আছে।

তাছাড়া বিপিনচন্দ্র সমাজতত্ত্বে Homogeneity, Differentiation, Integration-এর সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এবং তার সঙ্গে হেগেলীয় লজিকের ডায়লেক্‌টিক thesis, anti-thesis, synthesis সূত্র মিলিয়ে একটি নূতন ব্যাখ্যা-পদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন। সেই ব্যাখ্যা-পদ্ধতি আলোচ্য প্রবন্ধগুলিতে প্রয়োগিত হয়েছে।

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ, জীবনসংগ্রাম তত্ত্ব, যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন মতবাদ ঊনবিংশ শতকের চিন্তাজগতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। গ্যালিলিও এবং নিউটনের মতবাদ সপ্তদশ শতকে যে ধরনের চাঞ্চল্য ও আলোড়ন এনেছিল ডারউইনের ভূমিকা ঊনবিংশ শতকের শেষে প্রায় তারই অনুরূপ বলা চলে। ডারউইনের বক্তব্যের দুটি দিক, অভিব্যক্তিবাদ এবং জীবনসংগ্রাম ও 'যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন'। এর থেকেই 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে'র প্রশ্ন আসে। বিপিনচন্দ্র রামেন্দ্রসুন্দরের মতো ডারউইন-ওয়ালেস নিউম্যান নির্দেশিত জীবনসংগ্রাম ও 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্বকে সুরেন্দ্রনাথের অবিচলিত স্থৈর্য ও নিন্দাস্তুতি সমভাবে উপেক্ষা করবার শক্তির কারণ রূপে ব্যাখ্যা করেছেন :

> "যে নিগূঢ় কৌশল-সহায়ে জীব বিবিধ বিরোধী অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়াও প্রকৃতির নির্বাচনের নিয়মানুযায়ী আত্মরক্ষায় ও আত্মচরিতার্থতা লাভে সমর্থ হয়, সুরেন্দ্রনাথ অতি আশ্চর্যরূপে সে কৌশলটি লাভ করিয়াছেন। এই কৌশলটি যে জীব লাভ করিতে পারে সে-ই কেবল বিশ্বব্যাপী নির্মম জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিয়া আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা করিতে পারে।"

ডারউইনের মতবাদে 'ব্যষ্টি'র চেয়ে 'সমষ্টি'র স্থান বড়ো। সেজন্য সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তায় ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টির উপর জোর বেশি পড়েছিল। তেমনি সে প্রভাব 'জাতীয়তাবাদে'র ক্ষেত্রেও পড়তে দেখা গিয়েছিল "which can appeal, to the Darwinian doctrine of survival of the fittest applied not to individuals, but to nations."[৪] বিপিনচন্দ্রের সমাজ-চেতনায় ও স্বাদেশিকতায় ডারউইনীয় প্রভাব প্রবলভাবে লক্ষণীয়।

উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ-ইতিহাস আলোচনায় বিপিনচন্দ্র 'ব্যক্তিস্বাভিমানী অনধীনতা' ও 'সমাজানুগত্য'কে পরস্পরবিরোধী মতবাদ রূপে দাঁড় করিয়েছেন। একদিকে 'ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য' অপরদিকে সমাজের, ধর্মের, ঐতিহ্যের বা লৌকিকাচারের প্রতি আনুগত্য—এই দুয়ের মধ্যে তিনি 'সমষ্টি' বা সমাজানুগত্যকে শ্রেয়স্কর বলে মনে করেছেন। তিনিও রামেন্দ্রসুন্দরের মতো লিখেছেন :

> "প্রত্যেক সমাজের রীতিনীতি, আচারবিচার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানাদি সেই সমাজের আত্মপ্রয়োজনে, তার আভ্যন্তরীণ জীবনচেষ্টার ফলেই গড়িয়া উঠে, কোন আকস্মিক ঘটনাপাতে, আপনা হইতে গজায় না অথবা অন্য সমাজ হইতেও উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে না।"

কাজেই সমাজের সংস্কারের জন্য 'ব্যষ্টি-শক্তি' অপেক্ষা 'সমাজ-শক্তি'র বৃদ্ধি বেশি দরকার। কেননা,

> "সমাজ একবার সজীব ও আত্মস্থ হইয়া উঠিলে, সামাজিক ব্যাধি-সকলের বীজাণুগুলি আপনি মরিয়া যাইবে বা মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়া থাকিবে।"

এই 'সমাজানুগত্য'-ধারণা বিপিনচন্দ্রের 'চরিতকথা' গ্রন্থের অধিকাংশ রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনযাপন আরম্ভ হবার সময়ে বিপিনচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। সুরেন্দ্রনাথের পুরুষকারকে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাঁর চরিত্রে তিনি রজঃপ্রাধান্য দেখেছেন, এবং তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। কেননা, তাঁর জন্মকালে দেশে অতীতের সাত্ত্বিকতা তামসিকতায় অধঃপতিত হয়েছিল, তমোগুণকে ভাঙতে হলে রাজসিকতা দরকার। কার্লাইলের 'God in History'-র পন্থায় তিনি লেখেন, "সামাজিক এবং বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার সংস্কার সাধনব্রতেই

ভগবান তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন।"[৫] বিপিনচন্দ্র এই প্রবন্ধে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্রের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। কেননা তাঁর মতে "কেবল বাংলাদেশেই আধুনিক স্বাদেশিকতার বা Nationalism-এর সত্য ও পূর্ণ আদর্শ কতকটা ফুটিয়াছে।" রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথে তারই প্রকাশ। যে কার্য রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সাধন করেছেন ধর্ম ও সমাজক্ষেত্রে, অনুরূপ রাষ্ট্রিক কায সুরেন্দ্রনাথ করেছেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। বিপিনচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন হিন্দুধর্মের সংস্কার দ্বারা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু ('হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'র লেখক) 'বিদেশীয়দের সম্মুখে এই ধর্মেরই সনাতন তত্ত্ব ও চিরন্তন আদর্শের অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন' করেন। স্বধর্মের প্রতি গর্ব স্বদেশেরই প্রতি গর্বকে জাগ্রত করায়। তবে বিপিনচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন সুরেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার মূল ভিত্তি য়ুরোপীয় ইতিহাস, ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডির আদর্শ ও নব্য আয়ার্লণ্ডের কর্মপন্থায়। সেখানে স্বাদেশিকতার সঙ্গে ধর্মের কোন যোগ নেই। তবে 'ভারতসভা'র প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় কর্মজীবনের ব্যাপকতা ব্যাখ্যাকালে তিনি "বাংলার বৈশিষ্ট্য"-তত্ত্ব এনেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে 'বাঙালীর বিশিষ্টতা'র দৃষ্টিভঙ্গি প্রবল হতে থাকে।[৬] বিপিনচন্দ্র সেই 'বিশিষ্টতা' সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় কর্মজীবনের মধ্যে সন্ধান করেছেন:

> "বাঙালীর প্রকৃতির এবং বাংলার ইতিহাসের বিশেষত্ব হইতেই আমাদিগের স্বদেশপ্রীতির এই অপূর্ব উদারতার উৎপত্তি হইয়াছে।"

তিনি বাঙালীর বিশিষ্টতার লক্ষণ নির্ণয়ে লিখেছেন, মারাঠীর বুদ্ধি, 'practical' বাঙালীর বুদ্ধি 'idealistic'।

সুরেন্দ্রনাথের কর্মসাধনার প্রধান ত্রুটি বিপিনচন্দ্রের মতে, দেশের 'নিজস্ব' ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর মানসিক যোগের অভাব। তবে সুরেন্দ্রনাথের রাজসিকতাকে তিনি সমর্থন করেছেন এবং নিন্দা-প্রশংসার উর্ধ্বে উঠতে পারার মধ্যে আবিষ্কার করেছেন তাঁর 'যোগসিদ্ধি'।

অশ্বিনীকুমার দত্তকে বিপিনচন্দ্র 'লোকনায়ক' আখ্যা দিয়েছেন। যে রাজসিক ভাব সুরেন্দ্রনাথের জীবনে ও কর্মে তিনি দীপ্যমান দেখেছেন অশ্বিনীকুমারের মধ্যে তার প্রকাশ ছিল না। তাঁর মতে 'যে উপাদানে দ্রোহি-চরিত্র' রচিত হয় অশ্বিনীকুমারের মধ্যে তার স্থান কম। তিনি এই প্রসঙ্গে মনে করতেন

'য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাভিমানী অনধীনতা' ব্রাহ্মধর্মের মূলভিত্তি হলেও সে-পথে "ধর্মের ও সত্যের কোন সনাতন, সার্বভৌমিক প্রতিষ্ঠাও মিলে না।" সেজন্য অশ্বিনীকুমার 'সদ্‌গুরুর আশ্রয়' গ্রহণ করেছিলেন।'

যে 'সহজজ্ঞান' বা 'Intuition'-কে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র তাঁদের ব্রহ্মসাধনার ও ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় রূপে ধরেছেন, নব্য-বৈষ্ণব বিপিনচন্দ্র সেখানে তার প্রতিবাদে 'মোহান্ত' বা 'সদ্‌গুরু'-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী। কেননা সমাজের উন্নতির জন্য গতি ও স্থিতি দুটিই প্রয়োজন। অশ্বিনীকুমার একদিকে ব্রাহ্মসমাজের 'ব্যক্তিস্বাভিমানী যুক্তিবাদ' অর্থাৎ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী—এই হলো গতি। অন্যদিকে তিনি সদ্‌গুরুর আশ্রয়প্রাপ্ত—অর্থাৎ আনুগত্যে তৃপ্ত। এই হলো স্থিতি। কাজেই স্বাধীনতা ও আনুগত্যের, গতি ও স্থিতির, স্বাদেশিকতা ও সংকীর্তনের সমন্বয় অশ্বিনীকুমারের মধ্যে ঘটেছে। হার্বার্ট স্পেনসারের সামঞ্জস্যতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দরের মতো বিপিনচন্দ্রও গ্রহণ করেছেন। আবার হেগেলের দর্শনে যে 'synthesis of opposites' এবং 'union of Being and Non-Being'-এর কথা আছে, বিপিনচন্দ্র স্বাধীনতা ও আনুগত্যের সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে তাকেও স্মরণ করেছেন।

বিপিনচন্দ্র স্বভাবতঃই 'গুরু'বাদকে বড়ো বলে মেনেছেন। কেন না, বাঙালীর ধর্মাচারে, তান্ত্রিকতায়, বৈষ্ণবধর্মে—গুরুর স্থান মুখ্য। এর মধ্যেও 'বাঙালীর বিশিষ্টতা'। সেজন্য তাঁর মতে "ভগবানের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ যে সকল মহাপুরুষের মধ্যে হয়, তাঁহারাই জগতে সকল ধর্মের প্রত্যক্ষ আশ্রয় হইয়া রহেন।" কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ "গুরু"র প্রভুত্ব মানেন নি। আবার উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে অর্থাৎ প্রটেস্‌টাণ্টসুলভ স্বাধীনতা ছেড়ে যে রোমান ক্যাথলিক হলেন তার কারণ বিপিনচন্দ্রের মতে রোমান ক্যাথলিক সমাজে রয়েছে 'শাস্ত্র' ও 'গুরু'র প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আলোচনাতেও বিপিনচন্দ্র গুরু-তত্ত্ব নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, বৈষ্ণবগুরু দ্বিবিধ—চৈত্যগুরু ও মোহান্ত। এবং রবীন্দ্রনাথে 'চৈত্য আছে, মোহান্ত' নেই। স্বদেশের 'সনাতন প্রাণবস্তু' রক্ষায় বিপিনচন্দ্রের আগ্রহ এতদূর গিয়েছিল যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে এমন উপদেশ দিয়েছিলেন :

"য়ুরোপ পর্যটনে না যাইয়া রবীন্দ্রনাথ যদি ভারতের পুণ্যতীর্থ ভ্রমণে আজ বাহির হন, তবে হয়ত ভগবৎপ্রসাদে ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন সাধু-বৈষ্ণবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এ অভাব পূরণ করিতে পারিতেন।"

বিপিনচন্দ্র ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণীকে সমাজানুগত্যের কারণে গ্রহণ করার বিরোধী ছিলেন। কেননা ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ গ্রহণ করলে সমাজ বন্ধন বৈপ্লবিক স্রোতে ভেসে যাবে। 'গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধে তিনি বৈপ্লবিক পন্থার পরিবর্তে হিন্দুর সমাজানুগত্যের জয়গান করেছেন। হিন্দুর ধর্ম ও সমাজের সম্পর্কে বোঝাতে তিনি নারায়ণ, মহাবিষ্ণু, কায়ব্যূহ প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব আনয়ন করেছেন। একই পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পর্কিত আলোচনায় সেখানে সমাজ-বিজ্ঞানের সূত্রের সঙ্গে সাংখ্য দর্শনের একটি মিল দেখাবার ও ঘটাবার প্রয়াস দেখি। তাঁর মতে ব্রাহ্ম সমাজে য়ুরোপীয় রাজসিকতা গ্রহণ করার ফলেই দেশব্যাপী গাঢ় তামসিকতা অবসিত হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তথা আমাদের স্বাদেশিক আন্দোলনের অন্যতম নায়ক। তাঁর ভূমিকা বর্ণনা করতে গেলে ব্রাহ্মসমাজ এবং রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের আলোচনা অনিবার্য হয়ে পড়ে তাঁর মতে রামমোহন শাস্ত্রপ্রামাণ্য বা 'গুরু' কোনোটিই বর্জন করেন নি। অথচ দেবেন্দ্রনাথ দুটিই বর্জন করে আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতিকে প্রধান স্থান দেন। রামমোহনের বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্মের পরিবর্তে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের যে শ্লোকগুলিতে তাঁর উপলব্ধির মর্মগত মিল দেখেছেন সেগুলিকেই মাত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে মহর্ষি তাঁর ব্রাহ্মধর্মকে 'ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র মহর্ষির 'একতন্ত্র প্রভুত্বে'র বিরোধী, কিন্তু তিনিও 'অ-স্বাদেশিক' খ্রীষ্টপন্থী, তাঁর পরিণতি 'নববিধানে'। কেশবচন্দ্র যুক্তিবাদ বিরোধী, তিনি ফরাসী বিপ্লবের ঘোর শত্রু ছিলেন। আর শিবনাথ শাস্ত্রী পরিচালিত 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' এই দুয়েরই পক্ষপাতী। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় কেশবচন্দ্রের বিরোধিতা করে শিবনাথ শাস্ত্রী 'সমদর্শী' কাগজ বার করেন। তিনিই প্রথম ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় দেশপ্রেমিকতা সঞ্চার করেন।[৮] বিপিনচন্দ্র তাঁর কর্ম ও জীবনের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে য়ুরোপীয় প্রভাব অধিক দেখেছেন যেহেতু 'ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতা' শিবনাথের মজ্জাগত। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের অনুরাগী হওয়ায় সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সমাজানুগত্যের বিপরীত। তিনি নিউম্যান ও পার্কারের গ্রন্থের 'অনধীনতা-প্রবৃত্তি'টিকেই মাত্র গ্রহণ করেছিলেন এবং সেজন্য তাঁর ব্রহ্ম-স্বীকৃতি প্রকৃতপক্ষে 'Rational Religion'। বিপিনচন্দ্রের 'পরধর্মো ভয়াবহ' বিরোধিতা এমনই বেড়ে গিয়েছিল যে শিবনাথের স্বদেশকর্মীদল গঠনে য়ুরোপীয় প্রভাব দেখে আশংকিত হয়েছিলেন।

বিপিনচন্দ্র তাঁর 'চরিত-কথা'র প্রবন্ধগুলিতে সমাজতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দান করায় এগুলির তথ্যগত বিশ্লেষণ আশানুরূপ হতে পারে নি। তাঁর মূল দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি ব্যক্তিস্বাভিমানের চেয়ে সমাজানুগত্য বড়ো। তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সমাজের পার্থক্য নির্ণয়ে ধর্মকে বড়ো স্থান দিয়েছেন। হিন্দুধর্মে সামাজিক আচার, লৌকিকাচার বেশি এবং এগুলির প্রতি আনুগত্য 'স্বধর্মে'র প্রতি আনুগত্য বহন করে এবং স্বধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের প্রতি আনুগত্য স্বদেশানুগত্যে পর্যবসতি হয়। সুরেন্দ্রনাথ ও শিবনাথের স্বাদেশিকতায় তিনি 'স্বদেশীয়ত্ব' তেমন দেখতে পান নি, 'বিদেশীয়ত্ব' 'বিজাতীয়ত্ব' দেখেছেন অধিক মাত্রায়।

বিপিনচন্দ্রের এই রচনাগুলি deductive পদ্ধতিতে রচিত। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায় দেশপ্রেম-ভিত্তিক 'রিভাইভ্যালিজম্' বা 'পুনরুত্থান-বাদ' প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথও বিংশ শতকের সূচনায় লিখিত প্রবন্ধগুলিতে 'প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম', 'ভারতবাসী ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম করে একাকী', যন্ত্র সভ্যতার ফলে পাশ্চাত্য সমাজে 'অহরহ নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত' হচ্ছে, রজত শ্রেণীভেদ বেড়েছে, প্রভৃতি মন্তব্য করেছেন। তিনিও তৎকালে ফরাসী বিপ্লবের বিরোধিতা করেছেন ও তাঁর নিজের ব্যাখ্যাত ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার বিপিনচন্দ্রের ব্যবহৃত সূত্রের পদ্ধতির ত্রুটি ধরেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক স্তরের সঙ্গে হেগেলের ত্রি-সূত্রের পার্থক্য নির্দেশ করেন। প্রমথ চৌধুরী বলেন, "সাংখ্যের মতে এই ত্রিগুণের সমন্বয়ে জগতের লয় হয়, সৃষ্টি হয় না। সত্ত্ব, রজঃ, তমো-র মিলন নয়, বিচ্ছেদই হচ্ছে সৃষ্টির কারণ। অপর পক্ষে হেগেলের মতে thesis ও anti-thesis-এর মিলনের ফলে জগৎ সৃষ্টি হয়। তমঃ ও রজঃ এই দুইয়ের মিলনে যে বস্তু জন্মলাভ করে তা হেগেলের synthesis হতে পারে, কিন্তু তা সাংখ্যের তত্ত্ব নয়।"৯ তিনি বলেন, হেগেলের মত সাংখ্য মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার হেগেল তাঁর 'Philosophy of History' গ্রন্থে ডারউইনের ক্রম-অভিব্যক্তি তত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন। হেগেল 'event' অর্থাৎ 'nature' এবং 'act' অর্থাৎ 'human'-কে পৃথক করে দেখেছেন।

বিপিনচন্দ্র সামাজিক ক্রম-বিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী

এর বিরোধিতা করে লিখেছেন, মানবের ইচ্ছাশক্তিই মানবের উন্নতির মূল কারণ। হেগেলও এই মতাবলম্বী। কলিংউড লিখেছেন :

> "The force which is the mainspring of the historical process is reason. This is a very important and difficult doctrine. What Hegel means by it, is that everything which happens in history happens by the will of man, for the historical process consists of human actions, and the will of man is nothing but man's thought expressing itself outwardly in action."[১০]

প্রমথ চৌধুরী 'ব্যক্তিস্বাভিমানী অনধীনতা'কে মনে-প্রাণে মানেন। বিপিনচন্দ্র হিন্দুর ধর্ম ও সমাজানুগত্যকে বড়ো বলে জানেন। সাম্প্রতিক কালের দৃষ্টিতে বিপিনচন্দ্র রক্ষণশীল, আংশিক প্রতিক্রিয়াশীলও বটে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রচিত 'চরিত কথা'য় (১৯১৩) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, হর্মান হেলম্‌হোলৎজ, আচার্য মক্ষমূলর, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, রজনীকান্ত গুপ্ত, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রশস্তিমূলক কয়টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা। রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টিভঙ্গির একটি বৈশিষ্ট্য ডারুউইন ও হার্বার্ট স্পেনসারের মতবাদের সঙ্গে সমকালীন 'জাতীয়তাবাদী' মনোভাবের সমন্বয় সাধন। ডারুউইনের 'অভিব্যক্তিবাদ', 'যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন'-তত্ত্ব ও হার্বার্ট স্পেনসারের 'সামঞ্জস্য-তত্ত্ব' উভয়কেই রামেন্দ্রসুন্দর আলোচ্য রচনাগুলিতে প্রয়োগ করেছেন। বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত রচনাটিতে দেখি তাঁর কর্ম প্রচেষ্টা সম্পর্কে তিনি 'যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন' ও প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্ব এনেছেন। অভিব্যক্তিবাদ ও প্রাকৃতিক-নির্বাচন তত্ত্বের আলোচনা করলে দেখা যায় প্রাণী যেমন নিজের আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার জন্য উপযোগী বিশেষ-বিশেষ উপাদান ও ব্যবস্থাকে নির্বাচন করে নেয় এবং ক্রমবিবর্তনের পথে কালক্রমে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তেমনি "সমাজের অতীত ইতিহাসে বিশেষ প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। এখন সেই প্রয়োজনের অভাব হওয়ায় তাহারা

অনাবশ্যক ও জীবনের যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়িয়াছে।"—এবং ক্রমবিবর্তনের সূত্র অনুযায়ী ভবিষ্যতে তারা বিলীন হয়ে যাবেই। অতএব সমাজ বিদ্রোহ ব 'revolution' নয়, বিবর্তন বা 'evolution'-ই কাম্য, সমাজ বিবর্তনের ধারাই অনুসরণ করা কর্তব্য।

রামেন্দ্রসুন্দর যে 'অভিব্যক্তিবাদ' ও 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে'র প্রসঙ্গ তুলেছেন, অমিততেজা বিদ্যাসাগরের সংস্কার-প্রচেষ্টা বিচারে তাকে মেনে নেওয়া সর্বতোভাবে সম্ভব নয়। যে 'দেশাচার'কে বিদ্যাসাগর বারংবার ধিক্কার দিয়েছেন, রামেন্দ্রসুন্দর সেই 'দেশাচার'কে "সমাজের অতীত ইতিহাসে বিশেষ প্রয়োজন সাধনের" যোগ্য বলে মনে করেছেন। 'জাতীয়তাবাদে'র প্রভাবে সর্বদা 'আর্যামির আস্ফালন' না ঘটলেও খানিকটা 'পুনরুত্থানী' দৃষ্টি বা মনোভাব সেকালে এসেছিল। রামেন্দ্রসুন্দর স্বধর্মনিষ্ঠ, আপেক্ষিক ভাবে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ছিলেন। ১৩০৮ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর "বর্ণাশ্রম ধর্ম" সম্পর্কিত প্রবন্ধটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখিত হতে পারে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথও এই সময়ে তাঁর 'ব্রাহ্মণ' 'নববর্ষ' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রভৃতি রচনায় পাশ্চাত্যের ধর্ম, সমাজ, পরিবার প্রথার তুলনায় প্রাচ্যের আদর্শের এমনকি জাতি-কর্ম বিভাগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করায় প্রয়াসী হয়েছিলেন।

কিন্তু যে-বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ান, যিনি বিধবা বিবাহের জন্য সর্বস্বপণ কবেন, আইনের দ্বারা তাকে বিধিবদ্ধ করান, 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' পদ্ধতি স্বীকাব করলে বিদ্যাসাগরের রামেন্দ্রসুন্দর কথিত 'কঠোর কঙ্কাল বিশিষ্ট' মূর্তির যোগ্য পরিমাপ হয় না, সমাজে 'ব্যক্তির' বলিষ্ঠ ভূমিকা নির্ণীত বা স্বীকৃত হয় না।

'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধেও (১৯০৫) রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্কিমের অনুবর্তীরূপে হার্বার্ট স্পেনসারের মতকে অর্থাৎ "বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তর্প্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্য সাধন"কে সর্বাপেক্ষা শুভকর আদর্শ বলে দেখিয়েছেন। হার্বার্ট স্পেনসারের উক্ত সংজ্ঞা সম্পর্কে তিনি বলেন, "উহা অপেক্ষা ব্যাপকতর সংজ্ঞা আমি দেখি নাই।" আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা বা সমাজরক্ষা সম্পর্কে ডারউইন-স্পেনসারের ব্যাখ্যাত মতকে স্বভাবতঃই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের আলোচনায় গ্রহণ করেছেন।

আত্ম-ও সমাজ-রক্ষার জন্য প্রয়োজন 'ধর্মবুদ্ধি' ও 'সংযম'। 'বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তর্প্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্যসাধন'কে রামেন্দ্রসুন্দর শ্রেষ্ঠ পন্থা জেনেছেন।

তিনি দেখেছেন এদের দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে 'প্রবৃত্তি' ও 'ধর্মবুদ্ধির' দ্বন্দ্ব এবং 'এই দুই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া মনুষ্যকৃপার পাত্র। ধর্মবুদ্ধি ও সংযম এ দুটি বৃত্তির অভাব ঘটলে সমাজে মঙ্গলেব পরিবর্তে অমঙ্গলের প্রাধান্য ঘটে। রামেন্দ্রসুন্দর 'অহংবাদ' বা 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' অপেক্ষা 'সমাজকল্যাণ'বাদকে মঙ্গলকর মনে করতেন।

যদি ধর্মবুদ্ধি ও সংযম হ্রাস পায় তাহলে "ব্যক্তি"র মনে original sin বা আদিম পাপের প্রাধান্য দেখা দেবে। সেজন্য তিনি 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমের সমাধানকে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি উপন্যাসগুলির মধ্যে 'ধর্মের সহিত অধর্মেব মহাযুদ্ধ' চলতে দেখেছেন। তাই 'সৌন্দর্য সৃষ্টি কাব্যের প্রাণ' স্বীকার কবলেও তিনি নৈতিক মূল্যকেই কাব্যে বড়ো স্থান দিয়েছেন। ব্যষ্টি ও সমাজেব পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে তিনি ব্যক্তির সেই-'ব্যক্তিত্ব' বা 'ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির বলাধান'কেই স্বীকার ও সমর্থন করেছেন যা সমাজদেহকে বলিষ্ঠ ও শুভময় করে। এইভাবে হার্বার্ট স্পেনসারের মতকে রামেন্দ্রসুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন বলেই তিনি 'বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে দেখাতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগর 'অতিবিক্ত স্বাতন্ত্র্যের' পক্ষপাতী ছিলেন না।

রামেন্দ্রসুন্দর অন্যত্র লিখেছেন শৈশবেই তিনি 'জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী, বলিয়া জানিতে উপদিষ্ট' হয়েছিলেন। বিদেশী-শিক্ষা ও স্বদেশী-দীক্ষা যুগপৎ তাঁর চরিত্রকে গঠন করেছে। তিনি 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি যখন পাঠ করেন, তখন বাংলার 'স্বদেশী' আন্দোলনের যুগ। পাশ্চাত্যের চেয়ে প্রাচ্যকে বড়ো করে তুলে ধরার, ব্যাখ্যা করার যুগ। সেজন্য তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র বঙ্কিমের চেয়ে 'প্রচার' পত্রিকার বঙ্কিমের অধিক প্রশংসা করেছেন। 'বঙ্গদর্শন' ১৮৭২এ প্রথম বার হয়ে চার বছর চলেছিল। 'প্রচার' বার হয় ১২৯১ সালে (১৮৮৪)। রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্কিম-মানসের দুটি পৃথক রূপ প্রত্যক্ষ কবেছেন এই দুই পত্রিকায় এবং মন্তব্য করেছেন :

> "'বঙ্গদর্শনে'র বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহবন্ধন সম্পূর্ণ কাটাইয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না—কিন্তু 'প্রচারের' পশ্চাতে যে বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাকে রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত দীপ্তিমান দেখি। তিনি তখন গীতার উক্তির আশ্রয় লইয়া স্বদেশবাসীকে ভয়াবহ পরধর্ম হইতে স্বধর্মে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আহ্বান করিতেছিলেন।...এই হিসাবে যাহা বিদেশীর ধর্ম তাহা ভারতবাসীর ধর্ম হইতেই পারে না।

ইউরোপের প্রাচীন ইতিহাস ও ইউরোপের আধুনিক সমাজতন্ত্র যখন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও ভারতবর্ষের আধুনিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এক নহে, তখন ইউরোপীয় ধর্ম আমাদের কাছে পরধর্ম।"

এ মনোভাব সেদিন রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও প্রকাশিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর পাশ্চাত্য মত ও আদর্শের প্রভাবকে রামেন্দ্রসুন্দর 'রাহুগ্রাস' বলে আখ্যাত করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের ষোডশ অধ্যায়ে বলেছেন—

"যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কামকর্ম একত্রিত হইবে সেইদিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।"

আর 'ইউরোপীয় আধুনিক সমাজতন্ত্র'বাদ বেন্থাম, কঁৎ, মিলের রচনায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। বঙ্কিম তো এঁদেরই গুরু বলে মেনেছিলেন। 'ধর্মতত্ত্বের' দশম অধ্যায়ে বঙ্কিম লিখেছেন :

"ভক্তি ভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ওগুস্ত কোমত মানবদেবীর পূজা করিয়াছেন।"

কাজেই জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে রামেন্দ্রসুন্দর-কৃত বঙ্কিম-সাহিত্যের ব্যাখ্যা সর্বদা বিচারসহ হতে পারে নি। রামেন্দ্রসুন্দর ঠিকই লিখেছেন যে 'বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম শিক্ষিত বাঙালীর সম্মুখে স্বদেশের শাস্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন বলিলে ভুল হইবে, এবং সঙ্গতভাবে পূর্বগামী রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাকে স্মরণ করেছেন। 'দেবেন্দ্রনাথ' সম্পর্কিত রচনাটি মহর্ষির পরলোকগমনের পর (১৯০৫) রামেন্দ্রসুন্দর পাঠ করেন। তিনি মহর্ষির জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছেন 'স্বদেশীয়তা'। স্বভাবতঃই তিনি তাঁর অধ্যাত্মজীবন বা ধর্ম সাধনার আলোচনা করেন নি। তিনি তাঁকে বেদচর্চায় উৎসাহ দান, ও স্বদেশীয় শাস্ত্র উদ্ধারের জন্য 'মহাবরাহ' অবতারের সঙ্গে উপমিত করেছেন। এই বিশেষণে ভূষিত করার পিছনে তাঁর স্বধর্মনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী মন জাগ্রত ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর দেবেন্দ্রনাথের এই স্বদেশীয়তার অপর নিদর্শন দেখেছেন ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতাদানের ও পত্রলেখার বিরোধিতায়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর পিতৃদেবের চরিত্রের এই দিকগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র পর্যালোচনায় পুনরায় 'স্বাতন্ত্র্য ও সংযমের' সামঞ্জস্যের শুভময়তার দিকে রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। হার্বার্ট স্পেনসারের ব্যষ্টি-সমষ্টির

সামঞ্জস্যতত্ত্বকে তিনি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের চরিত-কথা বর্ণনায় প্রয়োগ করেছেন।

পূর্বেই বলা চলেছে এগুলি informative বা তথ্যভিত্তিক চরিত-প্রবন্ধ নয়, এগুলি বহুলাংশে আলোচ্য ব্যক্তিগণের কর্ম ও সাধনার 'interpretative' বা ভাষ্যমূলক পরিচয়।

অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮)

অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রণীত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৯১৬) প্রায় সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠায় সমাপ্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ চরিতগ্রন্থ। মহর্ষির দীর্ঘ জীবনকথা (১৮১৭-১৯০৫) লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে অজিতকুমার অসামান্য শ্রম স্বীকার করেছেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের আদি (১৮১৭-৫৮), মধ্য (১৮৫৯-৭৩) এবং অন্ত্য-পর্ব (১৮৭৪-১৯০৫) কালানুক্রমিক রীতিতে বর্ণনা করেছেন। তার ফলে দেবেন্দ্রনাথের জীবনের সমগ্র ও সর্বাঙ্গীণ ইতিহাসটি পাঠকের মানস-নেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছে।

অজিতকুমার এই জীবনী-গ্রন্থের প্রারম্ভে 'গ্রন্থকারের নিবেদন' ও 'জীবন-চিত্রের খসড়া' নামক রচনা দুটিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বা 'point of view' বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বস্‌ওয়েলের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের প্রয়াস করেছেন। তবুও ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন যে, রাজনারায়ণ বসু যিনি 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বস্‌ওয়েল' ছিলেন, তাঁর জীবনের পূর্বভাগের ডায়েরি পাওয়া যায়নি এবং তাঁকে মহর্ষি-লিখিত প্রায় 'ছয় শতের উপর চিঠি' প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় পড়তে নিয়ে মাত্র আটানব্বই খানি মুদ্রিত করেছেন, বাকিগুলির অস্তিত্ব লুপ্ত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অন্যান্য সংবাদপত্রের মন্তব্য, পুত্র-কন্যা ও অনুরাগীদের রচিত ডায়েরি ও স্মৃতিকথা মহর্ষির হিসাবের খাতা, জমিদারী সংক্রান্ত কাগজ, চিঠিপত্র, দেবেন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী সবই অজিতকুমার দেখেছেন এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিশেষ স্থলে ব্যবহার করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের 'হিসাবের খাতা' ব্যবহারের অনিবার্য কারণ ছিল। কোন্ কোন্ সদনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে দেবেন্দ্রনাথ অর্থসাহায্য করেছেন, সে-তথ্য অবগত হতে গেলে এই খাতার সহায়তা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন এবং তার থেকেই জানতে পারা তায় দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনের প্রবণতা। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সেবা-প্রতিষ্ঠান, শিল্পকেন্দ্র সকল

ক্ষেত্রেই তাঁর দান অব্যাহত ছিল। সীতানাথ দত্তকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কিনবার জন্য সাত হাজার টাকা অর্থসাহায্য, আয়ারলণ্ডে দুর্ভিক্ষ উপশমের জন্য শত পাউণ্ড প্রেরণ, মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভায় হাজার টাকা দান, টিলকের ডিফেনস্ ফণ্ডে অর্থসাহায্য প্রভৃতি তথ্য জানবার একমাত্র উপায় 'হিসাবের খাতা'। অবশ্য সেগুলিও সব পাওয়া যায় নি।

দ্বিতীয়তঃ তিনি কোনো ব্যক্তির জীবন-চরিত রচনায় সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সুবিধা-অসুবিধা দুটি দিকেরই বিচার করেছেন। সাক্ষাৎ-পরিচয় থাকলে বর্ণনীয় ব্যক্তির 'জীবন-চিত্রের রেখাগুলি আরও স্পষ্ট' হত কিন্তু 'খুব কাছে হইতে কোন জিনিসকে দেখিলে তাহার খুঁটিনাটিগুলাই অত্যন্ত বেশী নজরে পড়ে'— সেজন্য তিনি ঠিকই বলেছেন, কোনো জিনিসের 'সমগ্র রূপটি দেখিবার পক্ষে বোধ হয় একটুখানি দূরত্বের দরকার আছে'। একেই মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন 'participant-observer'.

তৃতীয়তঃ, তিনি সঙ্গতভাবেই মনে করেছেন যে-ব্যক্তির জীবনী রচনা করা হবে, তাঁর 'কাল'টি সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা, সেই কালের শক্তিকে উপেক্ষা করা চলে না। সেই কালের শক্তি তাঁকে কতটা প্রভাবিত করেছে এবং তিনিই বা তার চিন্তায় ও কর্মে তাঁর কালকে কতোটুকু নিয়ন্ত্রণ করেছেন, ভবিষ্যতে তার ফল কী হয়েছে তার পরিমাপের জন্য সেই 'কাল'কে আলোচনার বিষয়ীভূত করতে হবে।

চতুর্থতঃ, তিনি দেবেন্দ্রনাথকে শুধুমাত্র, ব্রহ্মসাধক বা 'মহর্ষি' রূপে দেখেন নি. তিনি তাঁর 'সাধক' রূপকে যেমন দেখাতে চেয়েছেন, তেমনি তাঁর 'মনীষী' রূপকে উপস্থাপিত করাও কর্তব্য বলে মনে করেছেন। 'মহর্ষি'র সঙ্গে 'মণীষী'কে মিলিয়ে দেখাবার এই প্রয়াস অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। তিনি লক্ষ করেছেন 'ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সেই চিত্তশক্তির, তাঁর মনীষার ক্রিয়া বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করা যায়' এবং অজিতকুমারের কাছে দেবেন্দ্রনাথ 'পূর্ব ও পশ্চিম সভ্যতার ধারার মোহানায়…যুগসমন্বয়-প্রতিষ্ঠাতা ও যুগসমস্যা-মীমাংসক' রূপে প্রতিভাত হয়েছেন। সেই বিশ্বমানব-বোধের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি খাঁটি দেশাত্ম-বোধের প্রতিষ্ঠাও দেখেছেন।

পঞ্চমতঃ, সাধক, মনীষী, বিশ্বমনা, স্বদেশপ্রেমিকের রূপ ছাড়াও কবি,

সৌন্দর্যরসিক, কলাশিল্পানুরাগী দেবেন্দ্রনাথের 'মানুষ' রূপটিকেও তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তার কারণ, দেবেন্দ্রনাথের একটি সামগ্রিক রূপ অঙ্কনের চেষ্টা তিনি করেছেন। অজিতকুমার 'চরিতামৃত'-জাতীয় জীবনী এবং 'অস্থিবিদ্যা জাতীয় নীরস ইতিহাস' কোনটিকেই কাম্য আদর্শ বলে মনে করেন নি। তিনি ঠিকই লিখেছেন 'অতিভক্তি ও ভক্তির অভাব'—এই দুই-ই চরিত-লেখকের সমান বিপদের কারণ এবং এই সংকট থেকে মুক্তির উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

> "কোন মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি হইতে স্ফূর্ত হইতেছে যে তাঁহার জীবনচরিতটি—যুগের ইতিহাসের অভিপ্রায়ের মধ্যে তাহাকে মেলিয়া ধরা।...জীবনের ভিতরকার শক্তি কোথায় তাহার খোঁজ করিতে গেলে মনস্তত্ত্বের রীতিমত বিশ্লেষণ চাই। বাহিরের বিশ্বশক্তির কি প্রভাব তাহার উপর পড়িতেছে তাহার খোঁজ করিতে গেলে কালের ইতিহাসের দৃশ্যপট তুলিয়া ধরা চাই।"[১১]

কাজেই একদিকে 'ভিতরের মনঃশক্তি' অপরদিকে 'বাহিরের বিশ্বশক্তি' এই দুইয়ের সংঘাতে গড়ে-ওঠা জীবনচিত্র অঙ্কনই চরিত-লেখকের লক্ষ্য বলে তাঁর মনে হয়েছে এবং তিনি সেই পথে যাত্রা করেছেন। 'কালের অভিপ্রায়' সম্পর্কে ঐ যুগ-বিচারে তিনি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

> "জাতীয় ভাবে সার্বজনীন বা সার্বজনীনভাবে জাতীয় হইতে হইবে। ধর্ম যেমন দেশকালের অতীত, তেমনি দেশকালের ভিতর দিয়া ইতিহাসের ভিতর দিয়াই তাহার প্রকাশ।"

বলা বাহুল্য, এ সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের চিন্তাপ্রভাবিত। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে 'যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি' শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত ব্যাখ্যা এই সূত্রে স্মরণীয়। মহর্ষির জন্মোৎসব উপলক্ষে পঠিত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ এই দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনের আদিপর্বের ইতিহাস তাঁর ব্রহ্মানুসন্ধান, বিলাস মগ্নতা থেকে আনন্দের পথযাত্রা স্বরচিত 'আত্মজীবনী' (১৮৯৮) গ্রন্থে সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ আছে। অজিতকুমার প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যসন্নিবেশ দ্বারা এই অংশকে সমৃদ্ধতর করেছেন। খ্রীষ্টান সাধু-সাধ্বীদের জীবন ও সাধনার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতা ও আনন্দ-লাভের তুলনামূলক বিচার করিে দেখিয়েছেন :

"তাঁহার আনন্দমার্গের সাধনায়, পাপবোধ যথেষ্ট ছিল কিন্তু আনন্দের সমগ্রতার মধ্যে তাহা ক্রমাগতই আপনাকে বিসর্জন দিয়াছে। কোথাও একান্ত হইয়া সমস্ত জীবনকে তাহার মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিতে পারে নাই

এবং

"তাঁহার সৌন্দর্যপ্রিয় চিত্ত প্রকৃতির সৌন্দর্যরসে নিমগ্ন হইয়া সেই রসের মধ্যেই পাপের সমস্ত দাহকে ও কালিমাকে নিমেষে নিমেষে ধুইয়া ফেলিত।"

এই ধরনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অজিতকুমারের গ্রন্থখানিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

দ্বিতীয় পর্বের (১৮৫৯-১৮৭৩) প্রধান ঘটনা কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান ও ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র কর্তৃক ব্রাহ্মবিবাহ বিল বিধিবদ্ধকরণ। অর্থাৎ 'ব্রাহ্মেরা হিন্দু নয়'—এই ঘোষণার ফলে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে যায়। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের এই সংঘাত অনিবার্য ছিল। এ শুধু প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত নয়, প্রকৃতপক্ষে দুটি বিরোধী মতবাদের সংঘাত। অজিতকুমার সর্বতোভাবে দেবেন্দ্রনাথকে সমর্থন ও কেশবচন্দ্রের বিরোধিতা করেছেন। মহর্ষির অষ্টাশীতিতম জন্মদিন উপলক্ষে (১৩১১) পঠিত একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

"সকলেই জানেন, বৈচিত্র্যই জগতের ঐক্যকে প্রমাণ করে, বৈচিত্র্য যতই সুনির্দিষ্ট হয় ঐক্য ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ধর্মও সেইরূপ নানা সমাজের ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া নানা বিভিন্ন কণ্ঠে নানা বিচিত্র আকারে এক নিত্যসত্যকে চারিদিক হইতে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষ বিশেষ সাধনায় বিশেষভাবে যাহা লাভ করিয়াছে তাহার ভারতবর্ষীয় আকার বিলুপ্ত করিয়া তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে উৎপাটিত করিয়া, তাহাকে অন্যদেশীয় আকৃতি-প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে জগতের ঐক্যমূলক বৈচিত্র্যের ধর্ম লঙ্ঘন করা হয়।...মনুষ্যত্ব হিন্দুর মধ্যে এবং খ্রীষ্টানের মধ্যে বস্তুত একই...তথাপি ভারতবর্ষীয়তা এবং য়ুরোপীয়তা উভয়ের স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে বলিয়া উভয়কে একাকার করিয়া দেওয়া চলে না।...তরুণ ব্রাহ্মসমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে

এই কথা ভুলিয়াছিল, যখন ধর্মের স্বদেশীয় রূপ রক্ষা করাকে সে সংকীর্ণতা বলিয়া জ্ঞান করিত—যখন সে মনে করিয়াছিল, বিদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবর্ষীয় শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেষ্টাতেই যথার্থভাবে ঔদার্য রক্ষা হয়,—তখন পিতৃদেব সার্বভৌমিক ধর্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিশ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্জন দিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে তাঁহার অনুবর্তী অসামান্য প্রতিভাশালী ধর্মোৎসাহী অনেক তেজস্বী যুবকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল।"

অজিতকুমার ১৮৫৯-৭৩ কাল-পর্বে দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র মিলন ও বিচ্ছেদ আলোচনায় পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চালিত হয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের উদার অংশ বলে মনে করতেন এবং কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' ও পরে 'নববিধান সমাজ'কে তিনি এড়িয়ে চলেছেন। অজিতকুমার এই পর্বের বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ ইতিহাস দিয়েছেন কিন্তু সে বিবরণ সর্বত্র পক্ষপাতশূন্য বলা চলে না।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনের তৃতীয় পর্বে (১৮৭৩-১৯০৫) দেখি মহর্ষি একদিকে ব্রহ্মসাধনায় মগ্ন অপরদিকে কন্‌গ্রেসের কার্যাবলীর শ্রোতা, অর্থদাতা, বৃহৎ সংসারের সর্বময় কর্তা। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেবকে 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ' আখ্যা দিয়েছেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে উমেশচন্দ্র দত্ত মহর্ষির সঙ্গে দেখা করতে যান। তখন তাঁর দৃষ্টি ও শ্রুতি উভয় শক্তিই বিলুপ্ত। তিনি বললেন 'বাহিরে সব অন্ধকার। কিন্তু ভিতরের জ্যোতিতে আনন্দে আছি, এই জ্যোতি লইয়া যাইব'। সেই জ্যোতি নিয়ে তিনি আনন্দলোকে চলে গেলেন।

অজিতকুমারের দৃষ্টি একদিকে যেমন তথ্যসন্ধানী অপরদিকে ভাববাদী তথা ভাষ্যবাদী। তিনি দেবেন্দ্রনাথের জীবন-চরিতকে বহুক্ষেত্রে দার্শনিক তত্ত্বমণ্ডিত বা 'philosophise' করেছেন। তার প্রয়োজনও ছিল। দেবেন্দ্রনাথ বিস্তর পাশ্চাত্য দর্শন পাঠ করেছিলেন। আবার উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভাগবত থেকে তিনি অধ্যাত্ম যাত্রার পাথেয় খুঁজেছেন। যুক্তিবাদী-দর্শন অপেক্ষা ফেনেলাঁ, কুঁজার রচনা তাঁকে অধিক আকৃষ্ট করেছিল। ঔপনিষদিক জ্ঞান ও সুফী ধর্মের প্রেম তত্ত্ব—মহর্ষির অধ্যাত্মজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনায় এগুলির দার্শনিক বিচার অবশ্যকর্তব্য। অজিতকুমার সে-কর্তব্য সগৌরবে পালন করেছেন।

অজিতকুমারের প্রণীত দেবেন্দ্রনাথের জীবনীতে মহর্ষির 'ব্যক্তি', 'মনীষী' ও 'সাধক', অর্থাৎ তাঁর সামগ্রিক রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। লেখক বিখ্যাত সাহিত্য-রসজ্ঞ ও সমালোচক। তাঁর রচনাগুণে বইখানি বাংলা-সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করে আছে।

মন্মথনাথ ঘোষ (১৮৮৪-১৯৫৮) জীবনী রচনার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজ করে গেছেন। তাঁর রচিত 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' (১৯১৫), রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৯১৭), হেমচন্দ্র [বন্দ্যোপাধ্যায়] প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড (১৯১৯-১৯২৩), নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় [দক্ষিণারঞ্জনের ভ্রাতা] (১৯২৩), সেকালের লোক [রমাপ্রসাদ রায়, লালবিহারী দে প্রমুখ ব্যক্তিগণ] (১৯২৩), মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র (১৯২৪), কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৯২৬), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৯২৭), রঙ্গলাল (১৯২৯), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৯৩৩) গ্রন্থগুলি তথ্যমূলক চরিতগ্রন্থ হিসাবে খুবই মূল্যবান। তিনি ইংরেজিতে তাঁর পিতামহ 'বেঙ্গলী' ও 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনী লেখেন (১৯১১)। তিনি কর্মযোগীর ন্যায় দীর্ঘকাল ধরে একাকী বহু শ্রমে ও একান্ত নিষ্ঠায় পূর্বোক্ত তথ্যভিত্তিক চরিত্রগ্রন্থগুলি রচনা করেছেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছিলেন "রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত এবং কাব্যগত জীবনের—বৃহৎ সম্মিলিত রূপ সংহৃত করিয়া দেখানোই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।...সত্য প্রকাশিত হয়, ইহাই আমাদের কাম্য, এখানে ব্যক্তিগত মান অভিমানের স্থান নাই।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের আট বছর আগে প্রকাশিত গ্রন্থে তথ্যগত ও বিশ্লেষণগত অসম্পূর্ণতা অনিবার্য ছিল। পরে তিনি চার খণ্ডে যে বৃহৎ পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও বিচার সমৃদ্ধ 'রবীন্দ্র-জীবনী' প্রণয়ন করেছেন ম্যাসনের স্মরণীয় কীর্তি সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ 'Life of J. Milton' (১৮৫৯-৯৪)-এর সঙ্গেই তার তুলনা করা চলে।

পাদটীকা

১. শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১) সম্পর্কে কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪০-১৯০৯) তাঁর 'আমার জীবন' নামক আত্মজীবনী গ্রন্থে লিখেছেন, "যশোহরে আসিয়া শুনিলাম শিশিরকুমার ঘোষ এক

মহাব্রাহ্ম। দিনকতক যখন এসেসর ছিলেন, তাঁহার পাল্কির বাঁশের সঙ্গে মুর্গি বাঁধিয়া লইয়া যাইতেন এবং শিশিরকুমারের কুক্কুটধ্বজ হিন্দুজগতে তারস্বরে তাঁহার ব্রাহ্মত্ব প্রচার করিত।" আমার জীবন, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২০৪। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং।

২. 'সাহিত্য', [পত্রিকা] ফাল্গুন, ১৩১০।

৩. 'সাহিত্য', অগ্রহায়ণ, ১৩০১।

৪. Russell, Bertrand, History of Western Philosophy, ch. xxi, p. 754

৫. 'A messenger he, sent from the Infinite Unknown with tidings to us'—The Hero as Prophet, Carlyle.

৬. এই দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে বাক্‌ল (Buckle) প্রণীত History of Civilisation in England (1857-61) গ্রন্থের প্রভাব আছে। বাক্‌ল (১৮২১-৬২) বিশেষ ভাবে কঁৎ (Comte), মঁতেস্‌কিয় (Montesquieu)র মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভৌগোলিক, নৈসর্গিক ও প্রাতিবেশিক শক্তির প্রভাব কী ভাবে জাতীয় জীবনে, ইতিহাসের রূপান্তরে কার্যকরী হয় পূর্বোক্ত গ্রন্থে তার ব্যাখ্যা করেছেন।

৭. শরৎকুমার রায় রচিত 'মহাত্মা অশ্বিনীকুমার' গ্রন্থে (দ্বি-সং ১৯২৮) পাই অশ্বিনীকুমার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। —'ব্রাহ্মধর্ম ও অশ্বিনীকুমার অধ্যায়'।

৮. শিবনাথ শাস্ত্রী বৃটিশ শাসনের তীব্র বিরোধী ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই 'স্বদেশী' বা 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামী 'নববিধান' সমাজের নেতারা 'স্বদেশী' আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। দ্রষ্টব্য, 'ভাই' গিরিশচন্দ্র সেনের 'আত্মজীবনী'।

৯. সবুজপত্র।

১০. Collingwood, Idea of History, p. 116.

১১. জীবনচিত্রের খসড়া, পৃঃ উ।

॥ চরিত সাহিত্যে নতুন সম্ভাবনা ॥

বাংলা চরিত-সাহিত্যে প্রমথনাথ বিশীর 'মাইকেল মধুসূদন' ও 'চিত্র-চরিত্র' বই দুখানির বিশিষ্ট স্থান আছে। স্ট্রেচি ও মরোআ-র রচনা-রীতির অনুবর্তী তিনি। মনে রাখতে হবে 'Standard Biography' অর্থাৎ তথ্যবহুল প্রামাণিক জীবনবৃত্তান্তগুলি পূর্বে রচিত না হলে 'work of art' বা সৃষ্টিধর্মী শিল্পময় জীবনী-সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না। শিল্পধর্মী চরিত-সাহিত্যের কুশলী স্রষ্টা লিটন স্ট্রেচি ঐ পর্যায়েব জীবন-বৃত্তান্তগুলি রচনায় তাঁব ব্যবহৃত তথ্যের জন্য পূর্বজদের কাছে ঋণ স্বীকাব করেছেন। মরোআ উক্ত মত সমর্থন করেছেন। তবে এখানে সুস্পষ্টভাবে বলা দরকার স্ট্রেচির রচনা-পদ্ধতির সঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর রচনার আংশিক মিল থাকলেও এবং স্ট্রেচি-সুলভ ঐতিহাসিক চেতনার ও নাটকীয়-প্রবণতার পরিচয় কিছু মিললেও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য আছে। স্ট্রেচি (১৮৮০-১৯৩২) ভিক্টোরিয়ান্ যুগের নরনারীকে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতে পারেন নি। তাঁর অন্যতম চিন্তাগুরু Principia Ethica-র লেখক জি. ই. মূরের বড়ো দিক হলো চিরপ্রচলিত 'সংস্কার' বা 'dogma'র বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন উত্থাপন। চিরাচরিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সম্পর্কে অধ্যাপক মূর বহুলাংশে ভিন্ন মত প্রচার করেছেন। স্ট্রেচি এই গুরুর শিষ্য। আবার 'ব্লুমস্‌বেরি' গ্রুপের তিনি সভ্য, অর্থনীতিবিদ্ কেইনস্, শিল্পতাত্ত্বিক ক্লাইভ বেল, রজার ফ্রাই, এবং ভার্জিনিয়া উল্‌ফ তাঁর বন্ধু। তিনি অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদ, বুদ্ধি ও সংশয়বাদের অনুরাগী এবং Hero worship-এর তীব্র বিরোধী। অবশ্য স্ট্রেচি যে-সব ছোট-খাটো তথ্যের উপর ভিত্তি করে উজ্জ্বল শায়ক নিক্ষেপ কবেছেন পরে দেখা গেছে তাদের কোনো-কোনোটি ভিত্তিহীন। যেমন ডক্টর আর্নলডের সমগ্র দেহের তুলনায় পা দুটি ছোট ছিল এই তথ্য নিয়ে স্ট্রেচি তাঁর ভাষ্যরচনা কবেছেন। অধ্যাপক ট্রেভর রোপার্ তাঁকে এজন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। এবং ম্যাক্স বীয়রবম্ মন্তব্য করেছেন, 'The portrait fails, I think, because it is composed throughout in a vein of sheer mockery'. জেনারেল গর্ডন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন গর্ডন তাঁর তাঁবুতে বাইবেল ও ব্রাণ্ডি

নিয়ে বিশ্রামরত ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গর্ডনের সঙ্গে শুধু তাঁর প্রার্থনা-গ্রন্থ ছিল। কার্ডিনাল মানিংয়ের প্রসঙ্গ পূর্বেই করা হয়েছে। কাজেই স্ট্রেচির অবলম্বিত পন্থা প্রামাণিক চরিত-রচনার পক্ষে সহায়ক নয়।

কিন্তু প্রমথনাথ মাইকেল মধুসূদনের যে জীবন-ভাষ্য রচনা করেছেন, তার মধ্যে শ্রদ্ধার কোনো অভাব নেই। তাঁর অবলম্বিত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> "আমি মাইকেলকে দেবতা করিয়া তুলি নাই; তাঁহার দোষ-ত্রুটি দেখাইয়া দিয়াছি—এমন কি তাঁহাকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপও করিয়াছি, ইহাতে তাঁহার অসম্মান হইয়াছে মনে করি না—বরঞ্চ ইহা দ্বারা তাঁহাকে মানুষ করিয়া সম্মান দেখানোই যেন হইয়াছে।"

বলা বাহুল্য, প্রমথনাথ মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্যের নতুন তথ্য খুঁজতে যান নি, যোগীন্দ্রনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ সোমের গ্রন্থ দুখানি ছাড়াও তিনি শশাঙ্কমোহন সেনের (১৮৭২-১৯২৮) 'মধুসূদন: অন্তর্জীবন ও প্রতিভা' (১৯২৮) গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে "মধুসূদন ব্যক্তিটি কেমন ছিলেন—তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যার জন্য যে পরিমাণে তাঁহার কাব্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন—তাহাও করিয়াছি।" মধুসূদনের জীবনকে যেভাবে যোগীন্দ্রনাথ বসু ব্যাখ্যা করেছেন, শশাঙ্কমোহন ও প্রমথনাথ তার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন। শশাঙ্কমোহন তথ্যমূলক 'জীবনী'র দিকে যান নি, তিনি মধুসূদনের অন্তর্জীবনের তথা কবি-জীবনের ব্যাখ্যাতা। শশাঙ্কমোহন জানিয়েছেন :

> "কবির এই 'ব্যক্তিত্ব' ধারণার প্রণালী কি? বলিতে হইবে কি, যে উহা অন্তদৃষ্টির প্রণালী? সাহিত্য মনুষ্যের 'মানসী সৃষ্টি' বলিয়া কবির দিক হইতে মানসিক তন্ময়তা ব্যতীত যেমন সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না, তেমন মনস্তত্ত্বে সমাহিত বুদ্ধি এবং সহানুভূতি ব্যতীত সাহিত্যের প্রকৃত উপলব্ধি এবং সমালোচনাও হয় না।"

শশাঙ্কমোহন কার্লাইলের হিরো'-তত্ত্বকে স্বীকার করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "খ্রীষ্ট মহম্মদ চৈতন্য কিম্বা সীজার নেপোলিয়ন রিসেলিও—জগতের অধিকাংশ বীরধর্মী পুরুষের মধ্যে…এমন একটি দুর্বার গতিলক্ষণা এবং আপাততঃ কার্যকারণ সূত্রের সম্বন্ধবিরহিতা, অঘটন-ঘটন-মহীয়সী শক্তির দেবকীলীলাই প্রত্যক্ষ করিবে। মহাপুরুষ মাত্রেই দেবকীপুত্র।" সেজন্য

মধুসূদন তাঁর কাছে 'ভাব-বীর', মধুসূদনের মধ্যে তিনি উপলব্ধি করেন প্রতিভার টাইটানিক প্রচণ্ডতা' 'ডাকিনী' শক্তি, প্রমিথিয়ুসের মৃত্যুঞ্জয় শক্তি। তিনি ফরাসী বিপ্লবের বহ্নি, বায়রনের চিত্তে তথা মধুসূদনের হৃদয়ে প্রজ্জলিত হতে দেখে আনন্দিত, যোগীন্দ্রনাথের ন্যায় আতঙ্কিত নন। তিনি মধুসূদনের জীবনে দেখেন গ্রীক নিয়তির নিষ্ঠুর খেলা, দেখেন সরস্বতী-লক্ষ্মীর দ্বন্দ্বে ভাগ্যহত মধু-জীবনেব ট্রাজিডি। মধুসূদনের অন্তর্জীবন ও কাব্যের প্রথম সার্থক Interpretation শশাঙ্কমোহনের 'মধুসূদন'। প্রমথনাথ শশাঙ্কমোহন-কৃত ভাষ্যকে অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন। তবে তিনি রচনা করেছেন জীবন-ভাষ্য, সেজন্য জীবন-চরিতমূলক দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আদিকাণ্ড, বনবাস, মধুচক্র, স্বর্ণমৃগ, সীতাহরণ—এই অঙ্ক-পঞ্চকে তিনি মাইকেল মধুসূদনের জীবন-নাট্যের ট্রাজিডি রচনা করেছেন। যিনি 'রামায়ণ'কে ভেঙে 'মেঘনাদবধ কাব্য' বচনা কবেন তাঁরই জীবনকে রামায়ণী-কথার ছাঁচে ফেলে চরিত-সাহিত্য রচনা করা উন্নত শিল্পী-প্রতিভাব স্বাক্ষর। তিনি মধুসূদনেব কবিসত্তাব ইতিহাস পর্যালোচনা শেষে যথার্থ মন্তব্য করেছেন "তিনি বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব সম্ভাবনার মহাকবি।"

স্ট্রেচির 'Eminent Victorians' গ্রন্থে সংকলিত চরিত-চিত্রগুলিতে অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসরণ করলে দেখা যায় স্ট্রেচি তাঁর রচনায় মাঝে মাঝে অথবা কোনো প্রসঙ্গের শেষে একটি জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন রেখেছেন, কখনো বা একটি 'আয়রনি' বা সুতীক্ষ্ম মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন। প্রমথনাথ স্ট্রেচির এই রীতির অনুকরণ করেছেন।

মরোআ-র চরিত রচনাগুলিকে 'romanticized biography' আখ্যা দিতে পারি। তাঁর রচিত কবি শেলির এবং বায়রণ ও ডিকেন্সের জীবন-কথা চরিত সাহিত্য ও কথাসাহিত্যের সঙ্গমস্থল। ম্যাথু আরণল্ডের ভাষায় সেই 'divine angel' শেলির জীবনোপন্যাস রচনায় মরোআ কেন আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে তিনি তরুণ বয়সে যে সকল 'ধারণার' (ideas) বশবর্তী হয়েছিলেন, চারপাশের জগতের সঙ্গে তাকে মেলাতে পারেন নি, ফলে সংঘাত দেখা দিয়েছিল। শেলীর জীবনী পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল 'Shelley had experienced such checks as seemed to me to be some what of the same nature as my own ;'[২]—এই সাধারণীকরণ থেকে তাঁর 'এরিয়েল' গ্রন্থের জন্ম। প্রমথনাথের

সঙ্গে মধুসূদনের এই ধরণের সাযজ্য হয়নি, কিন্তু বর্ণিত চরিত্রের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা ও বেদনাবোধ তাঁর অন্তরে গভীরভাবে বিদ্যমান। মরোআ তাঁর 'Byron' গ্রন্থের 'preface' অংশে লিখেছেন,

> 'I have made the reader share those feelings of admiration, affection and fits which I think Byron's character is bound to arouse'.[৩]

প্রমথনাথ মধুসূদন রচনায় এই কথাই বলতে চেয়েছেন। তিনি নিজে কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার হওয়ায় মধুসূদনের জীবন-ভাষ্য প্রণয়নে নাটক ও উপন্যাসের ধর্ম তাঁর রচনায় এমন সুষ্ঠু সমন্বয় লাভ করতে পেরেছে। লুড্উইগ লিখেছেন 'To understand and interpret a poet one must have the creative gift'। তিনি এবং মরোআ তার প্রমাণ দিয়েছেন, প্রমথনাথ তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

প্রমথনাথের 'চিত্র-চরিত্র' (১৯৪৮) বইয়ের নামকরণ কি স্ট্রেচির 'Portraits in Miniature' (১৯৩১) বইয়ের অনুসরণে? অথবা লুড্উইগের 'Genius and Character' (১৯২৭) এর ছায়া? যাই হোক, এই গ্রন্থে সংকলিত 'চিত্র'গুলির দিকে তাকালে 'portrait gallery'র কথা মনে হবে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ আমাদের দেশের নবজাগরণ-যুগের আদ্যন্ত ইতিহাস তিনি তাঁর সামনে রেখেছেন। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য—বাংলা দেশের ইতিহাসের সর্বক্ষেত্রে যারা আপন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা এই 'চিত্র-চরিত্র' গ্রন্থে দাঁড়িয়ে আছেন। লেখক প্রথমে স্ট্রেচির মতোই অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু পরে বর্ণিত ব্যক্তিদের 'ব্যক্তিত্বের' সংস্পর্শে এসে মত পরিবর্তনে বাধ্য হন। 'ভূমিকা'-য় তিনি লিখেছেন :

> "যাঁহাদের লইয়া লঘুভাবে পরিহাস করিব ভাবিয়াছিলাম—তাঁহারা আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। কলমের লঘুরেখা আপনি কখন গভীর দাগ টানিতে শুরু করিল, উনবিংশ শতকের মাহাত্ম্য একটা মানসিক হিমালয়ের অপরিমেয় আকারে লেখকের মনের উপর বিরাট ছায়া ফেলিল"...

সেজন্য তিনি এই বইখানিকে 'একটি যুগের জীবন-চরিত' বলতে চেয়েছেন। কেন না "মানুষের মতো প্রত্যেক যুগেরও একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব থাকে—সেই ব্যক্তিত্ব সেই যুগের মনীষিগণের কর্মে ও জীবনে বিশিষ্ট স্বরূপে

প্রকাশ পায়। ...'চিত্র-চরিত্র' যুগজীবনী রচনার সেই চেষ্টা।" গ্রন্থখানি তথ্যপ্রধান নয়, ব্যাখ্যাপ্রধান। এই চিত্রগুলির একটি বৈশিষ্ট্য, এদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র-গিরিজাশঙ্কর-পাঁচকড়ি-চিত্তরঞ্জন বা মোহিতলাল ঘোষিত 'বাঙালীর বিশিষ্টতা' বা 'বড়োত্ব' অর্থাৎ chauvinism নেই।[৪] তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙালীর চিন্তা আত্মোপলব্ধি থেকে ভারতোপলব্ধিতে পৌঁচেছে। প্রমথনাথের 'মাইকেল মধুসূদন' ও 'চিত্র-চরিত্র' বই দুখানি বাংলা চরিত সাহিত্যকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে শিল্পের দিক থেকে।

'চিত্র-চরিত্র' গ্রন্থের উপাদান যেমন বাঙালীর 'ইতিহাস' থেকে সংগৃহীত, প্রমথনাথের অপর বলিষ্ঠ রচনা 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী'-র চরিত্রগুলি বাংলা সাহিত্য থেকে আহৃত। প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য থেকে বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা, ঠকচাচা, শচীশ, মায় পরশুরামের শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কল্পনার 'চরিত্র'কে তিনি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে 'বাস্তব' করে তুলেছেন। বাঙালী সমাজের ঐতিহাসিক যুগচক্রে রূপান্তরিত চরিত্রগুলি বাঙালী জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাসকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। সাহিত্য কখনই জীবনবিচ্যুত নয়। বাংলার সাহিত্য ও বাঙালী জীবন শস্য ও ভূমির তুল্য। 'চিত্র চরিত্র' গ্রন্থখানির সঙ্গে 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' মিলিয়ে পড়লে প্রমথনাথের মনোজগতের পরিচয় মিলবে।

চরিত-নাট্য রচনায় দুঃসাহসী অথচ সার্থক প্রয়াস করেছিলেন 'বনফুল' (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) তাঁর 'শ্রীমধুসূদন' ও 'বিদ্যাসাগর' নাটক দুটিতে। মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর বাংলা দেশের নবজাগরণের যুগপর্বে উল্কা ও জ্যোতিষ্ক স্বরূপ। তাঁদের জীবন নাটকীয় ঘটনায় ও দ্বন্দ্বে আলোড়িত। 'বনফুল' তাঁর চরিত-নাট্য দুখানি রচনা করে নব-সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করেছেন।

পাদটিকা

১. Beerbohm, Max., Lytton Strachey, 1943.

২. Maurois, André, Aspects of Biography 'Biography as a means of expression' p. 106, 1929.

৩. Maurois, André, Byron, p, 12-13, 1930.

৪. লুড্‌উইগও লিখেছেন, "beyond chauvinism and other prejudices., we face our heroes with impartiality."

অন্যান্য প্রচেষ্টা

১ ॥ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় রামপ্রসাদ সেন ও কবি-আখড়াইওয়ালাদের জীবনী ও গীতসংগ্রহ প্রকাশ করেন। এ-সম্পর্কে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল, "বঙ্গভাষায় দেশীয় লোকদিগের জীবন-চরিত ধারাবাহিক রূপে লেখার এই প্রথম উদ্যম" (শ্রাবণ, ১২৮১)। পরে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'কবি চরিত' ১ম খণ্ড, ১৮৬৮ সালে বার করেন। ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্যের 'কবি বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিবৃন্দের জীবনী'র (১৮৯৫) নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি জানিয়েছেন "বৈষ্ণব কবিদিগের জীবনী স্বতন্ত্রভাবে কোন পুস্তকে এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই।" রজনীকান্ত গুপ্ত লিখেছিলেন 'জয়দেব চরিত' (১৮৭৩)। এই পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০৪) নামক বৃহৎ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি থেকে রঘুনন্দন গোস্বামী, রামরাম বসু, রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পযন্ত স্বর্গত কবি গায়ক সাহিত্যিকদের জীবনবৃত্তান্ত তিনি সংকলন করেছেন। অপর দিকে তখন যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁরা নিজেদের জীবন-কথা লিখে পাঠিয়েছিলেন। গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনাটি নিয়ে সেকালে প্রবল মত-সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল। এই ধারাকেই ঐতিহাসিক তথ্য ও বিচার দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রভৃতি—'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য়।

২ ॥ পাশ্চাত্য সাহিত্যের 'Biographical Dictionary'র অনুকরণে বাংলায় 'চরিতাভিধান' 'শতজীবনী' 'জীবনী কোষ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টা হয়েছিল। 'চরিতাভিধান' (১৯০৮) গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলেন : 'জীবনচরিত পাঠে দয়া, মমতা, ভ্রাতৃস্নেহ, গুরুভক্তি, স্বজাতিপ্রেম প্রভৃতি গুণে মানবহৃদয় স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হয়, এজন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়া আমি জনসাধারণের হিতকল্পে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিলাম।' দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯১১) পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক এই দুই পর্যায়ে বিষয়গুলি বিন্যস্ত হয় এবং 'চাঁদসদাগর, খুল্লনা প্রভৃতি কাল্পনিক চরিত্র' বর্জিত হয়। এই পর্যায়ে পরে শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার 'জীবনীকোষ' (প্রথম খণ্ড, ১৩৪৩), ও শিবরতন মিত্র 'বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক' প্রকাশ করেন।

।। কথা শেষ ।।

বাংলা চরিত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করা হলো। অক্সফোর্ড ইংরেজী অভিধানে 'Biography'র সংজ্ঞায় লেখা হয়েছে 'The history of the lives of individual men as a branch of literature'. দেখা যাচ্ছে 'history'. 'individual' এবং 'literature' এই তিনটি শব্দের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ 'ব্যক্তি' মানুষের 'ইতিবৃত্ত' রচিত হবে, এবং তাকে 'সাহিত্যগুণান্বিত' হতে হবে। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে সকল মানুষেরই জীবন চরিত কি প্রণয়ন বা সঙ্কলন যোগ্য ? তার উত্তরে বলা যায় যাকে প্রচলিত অর্থে 'সাধারণ' মানুষ বলি তার মধ্যে 'অ-সাধারণত্ব' আবিষ্কার আধুনিক যুগের বিশেষ ধর্ম। কাজেই যে মানুষের জীবন কোনো কারণে আকর্ষণীয়, তাৎপর্যপূর্ণ বা বিচিত্র ঘটনাবহুল—তার জীবন চরিত প্রণীত হতে বাধা নেই। যদিচ পূর্বে তার সম্ভাবনা কম ছিল। আর 'history' বা ইতিবৃত্ত রচনায় প্রধান কর্তব্য হবে পক্ষপাতশূন্য হয়ে তথ্যগত, বিষয়গত প্রামাণিকতা সযত্নে রক্ষা করা। বস্ওয়েল একটি নগণ্য তথ্যের সত্যতা নিরূপণের জন্য কী দুর্ভোগ অম্লান বদনে সহ্য করেছেন সে খবর সর্বজ্ঞাত। বর্ণিত ব্যক্তির সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ সর্বাগ্রে প্রয়োজন, কিন্তু তার 'প্রামাণিকতা' পরীক্ষিত না হলে, সমান্তরাল তথ্যের দ্বারা সমর্থিত না হলে, নির্বিচারে তার প্রয়োগ অহিতকর তাই অবাঞ্ছনীয়। এই সূত্রে জনসনের একটি বাক্য স্মরণযোগ্য : "The value of every story depends on its being true."

ছোটখাটো গল্প বা 'anecdote'-এর মূল্য আছে ঠিকই, অনেক সময় একটি চকিত ঘটনা একটি মানুষের 'ব্যক্তিত্ব'কে ভাস্বর করে তুলতে পারে। যেমন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর বাল্যশ্রুত "বিদ্যাসাগর অমৃত মিত্তিরের পাত থেকে মাছের মুড়ো তুলে নিয়েছে" উক্তিটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এই উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় বিদ্যাসাগর কী ভাবে প্রচলিত 'সংস্কার'কে বর্জন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু নির্বিচারে 'anecdote' ব্যবহার করা ঠিক নয়। 'anecdote' শব্দটির মূলে 'gossip' বা 'গালগল্প' রয়েছে। লোকের মুখে-মুখে ছড়ানো গল্পকে খুব বেশি গুরুত্ব দান করা অসঙ্গত। অবশ্য দায়িত্বশীল ব্যক্তির স্মৃতিকথা নির্ভরযোগ্য বলা চলে।

তেমনি যে ব্যক্তির জীবনচরিত লিখিত হবে তাঁর ডায়েরি, চিঠিপত্র, উইল, মুখোক্তি, স্মৃতিকথার ব্যবহার বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। কেননা, ডায়েরি ও

চিঠিপত্রে 'ভিতরের মানুষটিকে', তার 'অন্তরঙ্গ' রূপটিকে অনেক বেশী চিনতে পারা যায়। এই সূত্রে প্রশ্ন ওঠে, বহু ক্ষেত্রে এই সব ডায়েরি ও 'একান্ত' ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, বর্ণিত ব্যক্তির জীবনের গোপনীয় একটি কোণের, যাকে তিনি রুদ্ধ করেই হয়ত রাখতে চেয়েছিলেন, তার দরজা খুলে দেয়। জীবনচরিতকারের পক্ষে এক্ষেত্রে কোন পথ গ্রহণ করা সংগত হবে? মনে হয়, দুদিকেই একটি মাত্রাসাম্য রক্ষা করে চলা উচিত। গোপনীয় তথ্যকে বাইরে প্রকাশ করা চলবে না—একে যদি গোঁড়ামি বলি, তাহলে 'একান্ত' ব্যক্তিগত দিকগুলিকে নির্বিচারে উদ্‌ঘাটিত করতেই হবে—এও এক ধরনের বাড়াবাড়ি। বস্‌ওয়েল জনসনের গ্যারিকের প্রতি উক্তি "I will come no more behind the scenes, David, for the silk stockings and white bosoms of your actresses excite my amorous propensities—বর্জন করেন নি। মলি অ্যাস্‌টন, অলিভিয়া লয়েড, মিসেস্ থ্রেল, মিসেস ক্লাইভ প্রভৃতি মহিলাদের সঙ্গে জনসনের সম্পর্ক তিনি বিবৃত করেছেন। অষ্টাদশ শতকে এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসনীয় ছিল। কিন্তু কার্‌লাইলের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য-সহচর ফ্রুড যখন কার্‌লাইলের জীবনী প্রকাশ করেন (১৮৮২-৮৪) এবং তাঁর ব্যক্তি-জীবনের প্রামাণিক তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন, অর্থাৎ উত্তরকালে অভিজাত মহিলাদের সংস্পর্শে এসে মিসেস্ কার্‌লাইকে কী ভাবে যৌবনে সম্মান-বঞ্চিত তাঁর স্বামী অবজ্ঞা করেছেন,—তখন ইংরেজ পাঠক-সমাজের বৃহদংশ ফ্রুডের বিরুদ্ধে রাগে ফেটে পড়েছিল। ভিক্‌টোরিয়ান যুগের অতিরিক্ত শুচিবাই এর জন্য দায়ী। এ মনোভাব বর্জনীয়।

মধুসূদন দত্ত হেনরিয়েটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ করেছিলেন এমন কোনো প্রমাণ নেই। রেবেকার সঙ্গে বিবাহিত জীবনযাপন কালীন মধুসূদন হেনরিয়েটার প্রতি অনুরক্ত হন এবং মাদ্রাজ থেকে প্রকৃতপক্ষে ছদ্ম নামে তাঁকে নিয়ে পালিয়ে কলিকাতায় চলে আসেন। মধুসূদন-দম্পতি পরস্পরের প্রতি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরিপূর্ণ ভালোবাসা বহন করেছেন। মধুসূদন যে হেনরিয়েটাকে বিবাহ করেননি—এ তথ্য গোপন রাখার কোন প্রয়োজন নেই। দ্বারকানাথ ঠাকুরের চরিত্রগত অসংযমের জন্য তাঁর পত্নী শেষে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতেন, এ তথ্য বর্জনের কারণ নেই। এমন কি রামমোহন ও রাজারাম সম্পর্কে যে রহস্যময় ধারনা অনেকের আছে, সে প্রসঙ্গে মৌন অবলম্বনকে শ্রেয় বলা চলে না। কিন্তু প্রামাণিক ও প্রাসঙ্গিক তথ্যের বিন্যাস ছাড়া

স্বকপোল-কল্পনার স্থান চরিত-সাহিত্যে হতে পারে না। ইতিবৃত্ত-সুলভ দূরাবস্থান ও পক্ষপাত-শূন্যতা চরিতসাহিত্যে অবলম্বিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

ইংরেজি ও বাংলা উভয় সাহিত্যেই দেখা যায় আত্মীয় ও ভক্তশিষ্য ছাড়া, অপরের দ্বারা জীবনীগ্রন্থ কমই রচিত হয়েছে। বস্ওয়েল জনসনের ভক্ত-বন্ধু, লক্‌হার্ট স্যর ওয়ালটার স্কটের জামাতা, হালাম টেনিসনের পুত্র, ফ্রুড কার্লাইলের শিষ্য। তার ফলে জীবনচিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রে 'অন্তরঙ্গ' উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছে বটে কিন্তু অ্যাস্‌কুইথ এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাকে উপেক্ষা করা চলে না: "The bias of kinship, the blindness of discipleship are undeniable hindrances to just and even-handed judgement।" তবে জীবনী লেখকের 'বিচারপতি'র ভূমিকা গ্রহণ আদৌ সমর্থনীয় নয়। তিনি পাঠকের সামনে বর্ণনীয় 'ব্যক্তি' চরিত্রটিকে 'জীবন্ত' করে তুলবেন, যাতে আমরা তাকে ভালোভাবে চিনতে পারব, ভালোবাসতে, শ্রদ্ধা করতে, সহবেদনা জ্ঞাপন করতে পারব, তাঁর জীবনের যাত্রাপথটিকে দেখতে পাবো। তাঁর ক্রমবর্ধমান 'ব্যক্তিত্ব'কে উপলব্ধি করতে পারব। আধুনিক কালে চরিত রচনায় শেষের কথাটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। বহির্জীবনের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়ত কঠিন নয়, সেগুলি বিন্যাস করা শ্রমসাধ্য হলেও অপেক্ষাকৃত সহজ কর্ম। কিন্তু 'ব্যক্তিত্বে'র উপলব্ধি এবং তার বিশ্লেষণ ও যোগ্য উপস্থাপনা প্রতিভাশালী অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চরিত লেখকের অপেক্ষা রাখে। সেজন্য চরিত সাহিত্যের সঙ্গে একদা যেমন ইতিহাসের যোগ ঘটেছিল আধুনিক কালে 'ব্যক্তিত্ব'-উন্মোচনের জন্য সেইরূপ মনস্তত্ত্বের সহায়তা গ্রহণ প্রয়োজনীয় হয়েছে। লুড্‌উইগের মতে 'he must have more than the knowledge of a period, he must be versed in the study of man, must be a *psychologist* and an analyst.'

শেষে প্রশ্ন আসে চরিতসাহিত্যে নীতিগত (moral) শিক্ষার দিক সম্পর্কে। মনে হয় এ বিষয়ে মরোআ-র মন্তব্য স্বীকার্য:

> "There was a time when 'Lives' were written with a moral purpose, to exemplify the rewards of virtue and the failures of wickedness. Modern biographers think that the ***true story of a man's life always contains a moral lesson,*** but that the reader should be left to discover it for himself."

পরিশিষ্ট

[মরোআ তাঁর Aspects of Biography গ্রন্থে চরিতসাহিত্য সম্পর্কে লিখিত কয়েকখানি বই এবং ইএল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলবার ক্রশের 'From Plutarch to Strachey' নামক প্রবন্ধের উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি প্রবন্ধটি কোথায়, কখন প্রকাশিত হয়েছিল তার নির্দেশ দেন নি। অনেক খোঁজার পর জানতে পারি Yale Review পত্রিকার ১৯২১ সালের অক্টোবর সংখ্যায় প্রবন্ধটি বার হয়। INSDOC-এর (Indian National Scientific Documentation Centre) কর্মী শ্রীযুক্ত সুব্রত দত্তের সহায়তায় প্রবন্ধটির মাইক্রো-ফিল্ম আনানো সহজ হয়। প্রবন্ধটিতে চরিত ও আত্মচরিত উভয় প্রসঙ্গেরই আলোচনা আছে। নিচে 'চরিত' বিভাগ থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রয়োজনবোধে উৎকলন করে দেওয়া হলো।]

(প্লুটার্ক-বাসারি ওয়াল্টন)

১. "The scope of biography has even expanded to meet the requirements of new civilization. Plutarch's heroes were the conquerors and rulers of the ancient world—statesmen, politicians, orators and demagogues, whose conduct the biographer subjected, without being too severe with them, to the test of Greek ethics and philosophies as embodied in the teachings of Socrates, Plato and Aristotle. For him the centre of the world vibrated between Athens and Rome. When Vasari came upon the stage, the old states and empires had long since gone, and for the Italian mind questions concerning art had become of supreme importance. Accordingly he described the painters, sculptors, architects of that great brotherhood to which he himself belonged.

In turn Izaak Walton lived in an age when men were immensely anxious about the salvation of their souls. So his

heroes were mainly Churchmen distinguished for their piety. Charming is the word to characterize his portraits of Hooker, Herbert and Donne. The old angler, though honest enough to allude to the worldliness, follies and vices of his Churchmen in youth, passed them by lightly that he might have room enough to display all the Christian virtues they practised in their prime."

(জনসন্-বস্ওয়েল)

২. "Historically at least Dr. Johnson did a fine piece of work when he composed from such materials as were at hand the lives of the British poets of his own and the previous age. And then Boswell in his life of Dr. Johnson first depicted with fullness the career of a man of letters. His success showed that the life of an essayist and lexicographer may be of the highest interest. Since his time we have had biographies of all sorts of persons, but the man of letters in the most certain of the honour or dishonour of having his entire career laid open to the public gaze."

(স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর অথবা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর চরিত রচনা)

৩. "Nowhere in English is there, I think, a good biography of a man by his wife. On the whole, husbands have rather done better with their wives. At once comes to mind Carlyle on Jane Welsh ; but even here attention finally rests not upon the wife but upon the husband in gloom after her death."

(জীবন চরিত লেখকের অবলম্বনীয় পথ)

৪. "Between the 'pseudo-biographer' and the 'true' biographer there exists a difference similar to that between the

novelist who would depict men and women of his own time and the novelist who aims to restore the life and manners of a past age. The one derives his knowledge directly and perhaps easily from what he sees and hears. The other must depend upon his reading, he thus works in the manner and spirit of an historian. He must know the period in which his man lived in all its aspects—social, religious and political, and this knowledge, if it is to be intimate, must be gained at first hand from the general literature of the period—from letters, diaries and newspapers as well as from books. He must consider the traditions that have grown up about his personality....

However 'scientifically' facts and documents may be interpreted, the living man will elude the biographer unless he has extraordinary insight and a constructive imagination of the first order."

(লিটন ষ্ট্রেচি)

৫. "Strachey's method is more of a novelist than of a biographer. Indeed his book is dedicated to a novelist. Nothing is admitted that might appear dull, nothing is excluded that can give piquancy to the narrative···In temper Mr. Strachey's art is not so much English as French. It has none of the genial humour that Thackeray let play over the Queen's ancestors among the Georges. It has rather the wit and irony almost of Voltaire."

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Nicolson, Harold, The Development of English Biography.
2. Maurois, Andre, Aspects of Biography.
3. Cross, W. L., 'From Plutarch to Strachey', Yale Review, n. s. xi oct. 1921.
4. Dunn, Waldo H., English Biography, 1916.
5. Garraty, John A., The nature of Biography, Cape, 1957.
6. Clifford, L. J., Biography as an Art, Selected Criticism 1560-1960, Oxford University Press, 1962.
7. Stauffer, Donald A., Art of Biography in Eighteenth Century England, Princeton University Press, 1941.
8. Britt, Albert, The Great Biographers, Mcgrow Hill, 1946.
9. Shelston, Alan. Biography, Methuen & Co Ltd. 1977.

বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট